সাহিত্যের নানাকথা

হরপ্রসাদ মিত্র

ইষ্ট এণ্ড কোম্পানী
৫২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া, ১৩৬৩

প্রকাশক

শ্রীঅম্বিকাপদ বিশ্বাস

৫৪, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

*   *   *   *   *

মুদ্রাকর

শ্রীজ্যোতিভূষণ বিশ্বাস

জ্যোতি প্রেস

চাতরা চক্রবর্ত্তী লেন, শ্রীরামপুর।

মূল্য ছয় টাকা মাত্র

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

পূজনীয়েষু

'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি'তে আমি তত্ত্বচিন্তার চেয়ে গ্রন্থচিন্তাতেই বোধ হয় বেশি মনোনিবেশ করেছি। গ্রন্থের সঙ্গে তত্ত্বের যোগ অবশ্য অবিচ্ছেদ্য। তবুও, 'সাহিত্যের নানাকথা'-য় বিশেষ-বিশেষ বই বা লেখকের ওপর আলোচনায় সেরকম ঝোঁক পড়েনি। বাংলা সংস্কৃত, ইংরেজি, এই তিন সাহিত্যরাজ্যে স্বেচ্ছাধীন বিচরণের ফলে সাহিত্যের প্রাণ এবং সাহিত্যের শরীর সম্বন্ধে মনে কিছু-কিছু চিন্তা সঞ্চিত হয়েছিল। এখানে সেইসব ভাবনাই প্রকাশ করা গেল। 'বাংলা উপন্যাসের কথা' প্রবন্ধটি মূলে লেখা হয়েছিল 'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারির' জন্য। নানা কারণে সেটির প্রকাশ স্থগিত ছিল। তারপর 'জয়শ্রী'-র সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের অনুরোধে সেই হ্রস্বায়তন লেখাটি বর্ধিতায়ন হয়ে ধারাবাহিকভাবে 'জয়শ্রী'তে প্রকাশিত হচ্ছে। এ-বইয়ে সে প্রবন্ধের পরিমার্জিত অংশ মাত্র প্রকাশিত হলো।

স্নেহাস্পদ শ্রীমান জ্যোতিভূষণ বিশ্বাস এবং অম্বিকাপদ বিশ্বাস ভ্রাতৃযুগল বইখানি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমার অল্প অবসরের বিঘ্নের মধ্যেও ছাপার কাজ যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেরেছেন। জ্যোতি-প্রেসের কর্মী বন্ধুদের প্রীতি ব্যতিরেকে এ বই প্রকাশিত হতে আরো বিলম্ব ঘটতো। তাঁদের কাছে লেখকের কৃতজ্ঞতা রইলো।

এই সূত্রে কয়েকটি ছাপার ভুলের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি :— ৬১-র পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদের সাতের লাইনে 'অনুবাদও করেছেন'-এর জায়গায় 'অনুবাদও প্রকাশ করেছেন' হবে; ১৪৯-এর পৃষ্ঠায় শেষ অনুচ্ছেদের ছয়ের লাইনে 'অন্নদাশঙ্কর' নামটি কতকগুলি বইয়ে হয়তো বাদ পড়েছে,—ও-নামটি ওখানে যোগ করে নিতে হবে; ১৭১-এর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের 'কর্মফল' কবিতার উদ্ধৃতিতে প্রথম শব্দটি 'পরদুঃখ' নয়, 'পরজন্ম' হবে; ১৮৫-র পৃষ্ঠায় lyric শব্দটির আগে—Epic,—অংশটুকু বসিয়ে নিতে হবে। তা ছাড়া আর যে-সব ভুল আছে নিষ্প্রয়োজন বোধেই সেগুলির তালিকা দেওয়া গেল না। ত্রুটির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করি।

মহালয়া, ১৩৬৩
কলিকাতা

হরপ্রসাদ মিত্র

সাহিত্যের সংজ্ঞা

[ক] বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ [খ] অনুভূতি, প্রেরণা, কল্পনা, ঐতিহ্যবোধ
[গ] চিত্রধর্ম ও সংগীতধর্ম।

সাহিত্য-কথার প্রথম কথাই হলো তার সংজ্ঞা আর স্বরূপের কৌতূহল। জগতের নানা সাহিত্যের নানা পণ্ডিত আমাদের এ কৌতূহল মেটাবার চেষ্টা করেছেন। সে সব মতামতের অরণ্য বড়ো জটিল। বিচিত্র তার প্রকৃতি, বিপুল তার আয়তন। অতীতে আমাদের দেশে 'কাব্য' কথাটি সাহিত্যের গদ্য-পদ্য সকল শ্রেণীরই বাচক হিসেবে ব্যবহার করা হতো। 'উত্তর চরিত'-এর আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র 'কাব্যের' এই ব্যাপক অর্থ মনে রেখেই বলেছিলেন যে, কবিদের হাতে কাব্যের সৃষ্টি হয়। নিমিতি নয়,— 'সৃষ্টি'ই সাহিত্যিকের সাধনা। নিজের অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে কবি তাঁর প্রজ্ঞার গুণে নতুন জগৎ গড়ে তোলেন। সেই প্রজ্ঞার কথা বলতে গিয়ে পণ্ডিতরা অঘটন-ঘটন-পটিয়সী মায়াশক্তির কথা তুলেছেন। আলঙ্কারিক অভিনব গুপ্ত বলেছেন কবির প্রতিভা হলো 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। আমাদের প্রতিদিনের এবং যুগ-যুগান্তরের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে জগৎকে আমরা পেয়েছি, পাচ্ছি এবং পেতে থাকবো, সাহিত্যিক সেই সর্বজনীন অভিজ্ঞতাকে দেন নতুন গরিমা; কাছের দৃষ্টি, অভ্যাসের মালিন্য, অথবা সাধারণত্বের ঔদাস্য থেকে জগৎকে উদ্ধার করে আনন্দলোকে তার জায়গা করে দেওয়াই হলো কবি বা সাহিত্যিকের বিশেষত্ব। চিত্রকর যেমন পট-তুলি-রঙের সাহায্যে নতুন জগৎ গড়েন, সাহিত্যিক তেমনি ভাষার সাহায্যে,—পদ-বাক্য, ছন্দ-অলংকার ইত্যাদির সমবায়ে মনের জড়ত্ব দূর করেন।

১৩৩৩ সালের চৈত্র মাসের একটি কবিতায়, শান্তিনিকেতনের বাগানে একটি প্রিয় ফুল ফুটতে দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

> 'অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
> ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।
> মন জড়তায় ঠেকে নিখিলেরে জীর্ণ দেখে,
> হেনকালে হে নবীন, তুমি এসে কী বলিলে কানে—
> বিশ্বপানে চাহিলাম, কহিলাম 'কেন এ কে জানে।'

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমাদের চেনা জগৎ এমনি অভিনব রূপে-রসে-বিস্ময়ে-নবীন হয়ে ওঠে। সেই কথাটি বোঝাতে গিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

'কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। যে কবি সৃষ্টিক্ষম নহেন, তাঁহার রচনায় অনেক গুণ থাকিলেও বিশেষ প্রশংসা নাই।'

'উত্তরচরিতে'র আলোচনায় যেমন, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধেও তেমনি, কাব্যের [অর্থাৎ সাহিত্যের] মূল কথা সম্পর্কে তিনি আমাদের সুস্পষ্ট এক ধারণা দিয়ে গেছেন। এই শেষের প্রবন্ধটিতে প্রসঙ্গতঃ লেখা হয়েছিল—

'বিদ্যাপতি যে শ্রেণীর কবি, তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্য প্রকৃতির সম্বন্ধ নাই, এমত নহে—বাহ্যপ্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের নিত্য সম্বন্ধ, কিন্তু তাঁহাদিগের কাব্যে বাহ্যপ্রকৃতির অপেক্ষাকৃত অস্পষ্টতা লক্ষিত হয়, তৎ পরিবর্তে মনুষ্যহৃদয়ের গূঢ়তলচারী ভাবসকল প্রধান স্থান গ্রহণ করে।'

এই প্রবন্ধটিরই শেষ অনুচ্ছেদে দেখা যায়—

'কাব্যের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়, অর্থাৎ বহিঃ-প্রকৃতির গুণে হৃদয়ে ভাবান্তর ঘটে এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্যদৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপরদিকে আধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে।'

এই লেখাটিতে বিশেষভাবে জয়দেব-বিদ্যাপতির সাহিত্য বিষয়েই চিন্তা করা হয়েছে বলে ইন্দ্রিয়পরতা আর আধ্যাত্মিকতার কথা উঠেছে। এই দুটি নির্দিষ্ট দোষের কথা না ধরে ওপরের মন্তব্যটির মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখলে বেশ বোঝা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বহির্জগৎ আর অন্তর্জগৎ,—স্রষ্টার বোধের এই দুই সত্যের কথা চিন্তা করেছেন। বাইরের বিচিত্র

ইন্দ্রিয়জগৎ, এবং ভেতরের বোধ-বিশ্বাস-স্বভাব,—উভয়ের মিলনেই সাহিত্যের জন্ম। সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে আছে এই দ্বৈততা।

আদি কবি বাল্মীকি যখন ক্রৌঞ্চবধের দৃশ্য দেখে ব্যাধকে অভিশাপ দিয়েছিলেন তখনো ছিল এই দুই সত্যের দ্বৈততা। একদিকে, বাইরের হত্যাকাণ্ড,—অন্যদিকে, বাল্মীকির মন। চোখ-কান দিয়ে তিনি যা পেয়েছিলেন, তাতে মনের মনন এসে যোগ দিয়েছিল। তাঁর সেই শ্লোকটি সেই মননের ফল। সে শ্লোকে পূর্বোক্ত 'দুই' আর 'দুই' থাকেনি, উভয়ে মিলে 'এক' হয়ে গেছে। বাইরের জগৎকে দেখা গেল বটে, কিন্তু বাল্মীকি-কবির বিশিষ্ট সত্তার মধ্য দিয়ে তা' দেখতে হলো। তিনি যা দেখেছিলেন, সে-বিষয়ে তাঁর আপন ব্যক্তিত্বের রীতিময়, আনন্দময় মন্তব্য শোনা গেল ঐ শ্লোকে।

পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মানুষ তার প্রতিদিনের জগৎ সম্বন্ধে কতো মন্তব্যই না করছে! 'এবার বর্ষাকালেও বিষ্টি হলো না তেমন';—'চালের দাম চড়ছে;—'বাংলা দেশে উদ্বাস্তু-সমস্যার জটিলতা দেখে স্তম্ভিত হতে হয়';—'রবীন্দ্রনাথের মতন স্রষ্টা আর দ্বিতীয় দেখি না';—এগুলিও মন্তব্য বটে। কিন্তু খবরের সীমানা পার হয়ে গভীর কোনো অনুভূতির ব্যঞ্জনা জাগাতে পারছে না এসব কথা। তাই এরা আছে ব্যবহারিকতার এলাকায় আবদ্ধ। এসব কথা আর যাই হোক্, সাহিত্য নয়।

সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টায় রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ্,—কালিদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবির কাব্য ইত্যাদি পুরোনো প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত তোলা হয়ে থাকে। তার ফলে কারও-কারও মনে এমন ধারণা জাগা অসম্ভব নয় যে, পুরোনো হলেই বুঝি-বা সাহিত্য শোভন হয়, আর টাট্‌কা লেখা বুঝি-বা সন্দেহজনক ব্যাপার! কালিদাসের 'মালবিকাগ্নি-মিত্রম্'-কাব্যের শুরুতে পারিপার্শ্বিক-কে সূত্রধার যা বলেছিলেন তাতে এ সংশয়ের চূড়ান্ত জবাব আছে।

> পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বং, ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
> সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে, মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ॥

অর্থাৎ, প্রাচীন হলেই যে কাব্য সাধু হয় আর নতুন হলেই যে তার অন্যথা হয়, একথা ঠিক নয়। যাঁরা ধীমান্ তাঁরা পরীক্ষার সাহায্যে, দোষ-

গুণ বিচার করে যা উৎকৃষ্ট মনে করেন, তারই আদর করেন। যারা মূঢ়, তারাই শুধু পরের প্রত্যয়ের ওপর নির্ভর করে।

সুতরাং, সাহিত্যের মূল্যবোধ যে কতকটা পরীক্ষার আয়ত্তগম্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরীক্ষা মানে রসবোধহীন বিশ্লেষণ নয়। সাহিত্য 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী।' আমাদের দেশে ব্যাকরণ এবং অলংকার শাস্ত্রের শাস্ত্রকারেরা পদ ও বাক্যের,—শব্দার্থ ও অন্বয়ের রীতি-নীতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চালিয়ে এসেছেন। ব্যাকরণের বিচার-বিশ্লেষণ চলেছে প্রধানতঃ পদের প্রকৃতি ও অর্থ সম্পর্কে; অলংকার-শাস্ত্রের ভাবনা প্রধানতঃ পদ ও বাক্যের অর্থ, ব্যঞ্জনা, মাধুর্যগুণ নিয়ে। কিন্তু সাহিত্য শুধু পদ বা বাক্যের অর্থমাত্র নয়। কেবল পদ বা বাক্যের কৌশলমাত্র সম্বল করে সাহিত্যিক হওয়া যায় না। অর্থাৎ, শুধু বুদ্ধিগত বাহাদুরি ফলিয়ে অনুভূতিহীন মানুষ পদকে-বাক্যকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করতে পারেন না। সাহিত্য সৃষ্টির কাজ শুরু হয় অনুভূতি থেকে, একথা সর্ববাদিসম্মত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ আপন সুস্পষ্ট উপলব্ধির ক্ষেত্রকে সাহিত্যে প্রতিদিন বিস্তীর্ণ করছে।' [শ্রীঅমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা—৮ই আশ্বিন, ১৩৪৩।]

মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের সূচনাতে আছে—

'বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় [পদ্মাসনে যেন]
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি।'

এই শ্বেতভুজা সরস্বতী যে পরমা অনুভূতির দেবী, সে কথা সর্বস্বীকার্য সত্য। সেই সরস্বতীকেই তিনি বলেছিলেন—

'তোমার পরশে
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে।'

মধুসূদন দ্বিতীয়া যে দেবীর কৃপা ভিক্ষা করেছিলেন, তাঁর নাম 'কল্পনা'।

'—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।'

তাঁর আর একটি কবিতায় ঠিক এইভাবেই কল্পনার মাহাত্ম্য স্বীকার করা হয়েছে। সে কবিতাটির নাম 'কল্পনা'। আরো একটি কবিতা আছে, তার নাম 'কবি'। সেখানে তিনি বলেছেন—

'সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মন-কমলেতে পাতেন আসন।'

মধুসূদন যেমন প্রাচীন কবিদের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন, আর, তাঁর লেখাতে যেমন বাগ্দেবীর কাছে কৃপা ভিক্ষা করা হয়েছে, আমাদের পুরোনো আমলের বিভিন্ন কবির নানান কাব্যেও তেমনি পূর্বগামী কবিদের উল্লেখ আছে, এবং কোনো বিশেষ দেব-দেবীর আদেশ পেয়েই যে এক-একজন কবি এক-একখানি কাব্য রচনার কাজে নেমেছেন, তার স্বীকৃতি আছে। প্রথমতঃ, প্রেরণার জোর, দ্বিতীয়তঃ, কাব্যরীতির পূর্বকালাগত ধারার সঙ্গে পরিচয়, কাব্যের স্রষ্টার পক্ষে এই দুটি ব্যাপারই অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী। অতীতে এই প্রেরণার কথা জানানো হতো 'স্বপ্ন'-প্রথার মধ্য দিয়ে। বাংলা মঙ্গলকাব্যের লেখকরা কতো যে স্বপ্নাদেশ পেয়ে কলম ধরেছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটেছে। হোমারের Odyssey-র মধ্যে ডেমোডোকাস নামে এক গায়কের বিষয়ে 'divine,'—'stirred by the god' প্রভৃতি কথা বলা হয়েছে। হৃদয়ের প্রেরণা ছাড়া সাহিত্য যে অসম্ভব, একথা শুধু প্রাচীন গ্রীসে নয়, নানা ভাবে নানা দেশে শোনা গেছে।

এইসব বিচিত্র কথা মনে রেখে সাহিত্যের সংজ্ঞার কথা ভাবতে বসলে রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের তাৎপর্য'-প্রবন্ধটি তাই বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। এ-প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

'হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ।

সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিষ দেখিতে হয়। প্রথম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি—দ্বিতীয় তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা।'

কবির কল্পনার প্রসার এবং রচনাশক্তির নৈপুণ্য,—সাহিত্যের বিচারককে এই দুটি জিনিষের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হয়। এই দুই শক্তির গুণে সাহিত্যের স্রষ্টা সর্বসাধারণের পরিচিত জগৎ থেকে উপাদান নিয়েও অলৌকিক রস সৃষ্টির মহিমা লাভ করেন। তিনি নিজে যা পেয়েছেন, অন্যের হৃদয়ে তা' সঞ্চারিত করবার জন্য তাঁকে কিছু কৌশলের আশ্রয় নিতে হয়। সজ্ঞানেই যে সবটা ঘটে, তা নয়। ব্যাধকে অভিশাপ দিয়ে বাল্মীকি নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া?' তাঁর এই আত্মজিজ্ঞাসার মধ্যেই তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত রচনাশক্তির সংবাদ পাওয়া গেছে। তবে, স্বতঃস্ফূর্ত রচনাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়াসলব্ধ রচনানৈপুণ্যের কথাও অগ্রাহ্য করা চলেনা। সে যাই হোক্, সাহিত্যে অনির্বচনীয় হৃদয়ভাবই যে ফুটে ওঠে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। মানবহৃদয় এবং মানবচরিত্রই সাহিত্যের বিষয়। ছন্দে, শব্দে, বাক্যবিন্যাসের গুণে সাহিত্য যথার্থ সাহিত্য হয়ে ওঠে। কথা দিয়ে ছবি আঁকেন লেখকরা,—তাঁদের মনের কথা গান হয়ে বাজে, রূপ হয়ে ফোটে,—তাঁদের বচন থেকে জেগে ওঠে অনির্বচনীয় অনুভূতি। চিত্র এবং সংগীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র [উপমা প্রভৃতি] ভাবকে আকার দেয় এবং সংগীত [ছন্দ] ভাবকে গতি দেয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বস্তুতঃ বহিঃপ্রকৃতি এবং মানবচরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সংগীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষারচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।'

সাহিত্যের উপকরণ

[ক] জ্ঞানের সত্য ও ভাবের সত্য।
[খ] স্থায়িভাব; বিভাব; সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব; অনুভাব।

'নীরব কবি' বলে কোনো সত্য নেই। 'কবিত্ব' কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রকাশের আবশ্যিকতা। যিনি কবি বা সাহিত্যিক, তিনি তাঁর রচনার জন্যেই সমাদর পান। মানুষ মাত্রেই আত্মপ্রকাশের অভিপ্রায় অনুভব করেন। শিল্পীরা আত্মপ্রকাশের বিশেষ বিশেষ সিদ্ধিতে সমৃদ্ধ। তাঁদের সিদ্ধি বা নৈপুণ্যের রহস্য চিন্তা করতে গেলে তাঁদের বিষয়ে এই স্মরণীয় সত্যটি উপেক্ষা করা যায় না যে, নিজেদের মনোভাব তাঁরা সহৃদয় পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের মনে সঞ্চারিত করবার সাধনাতেই নিবিষ্টচিত্ত। সাহিত্য যে 'সহিতত্ব',— অর্থাৎ, লেখকের 'সহিত' পাঠকের যোগ সাধন সেই কথাটি জানা চাই।

বাইরের জগতে যা কিছু আছে, যা কিছু ঘটছে, সবই হয়তো মনের গোচর হতে পারে। কিন্তু একটি নির্দিষ্ট বস্তু বা ঘটনাকে ভিন্ন-ভিন্ন মন কি অভিন্ন ভাবে পায়?

গাছ, মাটি, নদী, পাহাড়,—হাসপাতাল, বিয়েবাড়ী, রেলস্টেশন, ডাকঘর, ইস্কুল, কলেজ, এসব যদি প্রত্যেক চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির কাছে অন্তত মোটামুটি অভিন্ন ভাবে দৃষ্টিগোচর না হতো, তাহলে আমাদের সংসার অচল হয়ে পড়তো। সুতরাং, সেকথা নয়। রসের রাজ্যে দেখা, শোনা, পাওয়ার কাজ তো শুধু চক্ষু কর্ণ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কাজ নয়। ইন্দ্রিয়ের কাজের সঙ্গে কল্পনার যোগ ঘটে যায় মনের মধ্যে। জগতে জ্ঞানের সত্য এক মনে যেমন, অন্য মনেও তেমনি সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত ভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু ভাবের সত্য মনের প্রকৃতি, অভিজ্ঞতার লগ্ন ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। 'কড়ি ও কোমলে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।'

'শেষলেখা'য়, সেই রবীন্দ্রনাথের কাছেই শোনা গেল অন্য কথা—

'হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলে লয়!'

১২৯৬ সালের বর্ষাকালে তিনি যে মর্জিতে লিখেছিলেন—

'ব্যাকুল বেগে আজি বহে যায়,
বিজুলি থেকে থেকে চমকায়।
যে-কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে
সে-কথা আজি যেন বলা যায়,'

—১৩৩৫ সালের শ্রাবণ মাসে তাঁর সে মর্জির পুনরাবৃত্তি নেই।
'দু'জনে'র মিলনের মধুর প্রসঙ্গে লেগেছে উদ্দীপনার সুর—

'দুজনের চোখে দেখেছি জগৎ, দোঁহারে দেখেছি দোঁহে,
মরুপথ-তাপ দুজনে নিয়েছি সহে।'

এ কবিতাও বর্ষাকালে লেখা বটে, কিন্তু এখানে আর আগেকার সুর নেই, ছায়া নেই।

প্রতিদিনের ব্যবহারিক জগতে, সংসারের নানা সম্পর্কে আমরা বস্তুজ্ঞান, তথ্যজ্ঞান, দায়িত্বজ্ঞান ইত্যাদি জ্ঞানের কথা বলে থাকি। এসব জ্ঞানের সর্বজনীন নির্দিষ্ট রূপ আছে। কিন্তু ভাবের সত্য, অর্থাৎ, অনুভূতির সত্য সেরকম নয়। 'সাহিত্যের সামগ্রী' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'ইংরাজিতে যাহাকে ট্রুথ্ বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা সত্য নাম দিয়াছি অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়—তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ববর্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, শুভ্র নিরঞ্জন। মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে। তাহার উপরে বিচিত্র হৃদয়ের নূতন নূতন রংয়ের ছায়া পড়িবার যো নাই।'

অপর পক্ষে, 'ভাবকে নিজের করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা।' রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সর্বাংশে সত্য। এই মূল সত্যটি মেনে নিয়েই তিনি লিখেছিলেন—

'যে-সকল জিনিষ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে—যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারেনা, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে—তাহা মানুষের একান্ত আপনার—তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর, অবস্থান্তর করা চলে না—তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে।' [সাহিত্যের সামগ্রী'—সাহিত্য —রবীন্দ্রনাথ]।

ভালোবাসার ভাব, হাসির ভাব, দুঃখের ভাব, রাগের ভাব, উৎসাহের ভাব, ভয়ের ভাব,—ঘৃণা, বিস্ময়, শান্ত ভাব, এরা আছে সব মানুষেরই মনে মনে। পণ্ডিতরা বলেছেন যে, এই নটি ভাবই হলো মানুষের সনাতন স্থায়ী ভাব। যথাক্রমে, এদের পারিভাষিক নাম হলো—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় এবং শম। ইংরেজিতে স্থায়িভাবের প্রতিশব্দ হলো 'primary emotion'। ডক্টর সুশীলকুমার দে, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিদ্বজ্জন এ প্রতিশব্দ মেনে নিয়েছেন। নাট্যতত্ত্ব আলোচনার প্রয়োজনে শম-ভাবটির কথা কেউ কেউ ধর্তব্য বলে স্বীকার করতে চান না। তার কারণ, শমভাবে মন থাকে নিস্তরঙ্গ। নিস্তরঙ্গ মন সাহিত্য প্রকাশের পক্ষে অনুকূল নয়, উৎসাহী নয়। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যালোক'-এর 'রস ও ভাব'-অধ্যায়ে শমভাবের প্রসঙ্গে লিখেছেন—

'যেখানে চিত্তবৃত্তি সাধারণ বিচারে প্রীতিমূলক বা অপ্রীতিমূলক কিছুই নয়, কেবল পরমজ্ঞানাত্মক এবং বিশুদ্ধ সুখাত্মক, সেখানে ভাবটি সকল সাংসারিক ভাবের ঊর্দ্ধে অবস্থিত, তাহার নাম হইতেছে নির্বেদ বা শম। ইহারই নাম রুদ্রট রাখিয়াছেন 'সম্যগ্‌জ্ঞান, এবং আনন্দবর্দ্ধন 'তৃষ্ণাক্ষয়সুখ'। এই ভাব হইতে জাতরসের নাম শান্তরস। বৈষ্ণবগণের শান্তরস আমাদের মতে কোনও রসই নয়। আমাদের কথিত শান্তরসে

রজস্তমোগুণের অতীত বিশুদ্ধ সত্ত্বের পূর্ণ প্রকাশ রহিয়াছে; এই সত্ত্বকে অতিক্রম করিয়াও বিশুদ্ধ আত্মানন্দ বা সংবিদানন্দের প্রকাশ রহিয়াছে। ইহা যুগপৎ জ্ঞানাত্মক ও আনন্দ স্বাদাত্মক।'

স্থায়িভাবের ইংরেজি প্রতিশব্দ থেকে ও-কথার পণ্ডিতজন-নির্দেশিত যে অর্থ পাওয়া গেল, সেইসঙ্গে আরো একটি পণ্ডিত-বচন মনে রাখলে ভালো হয়। জগন্নাথ বলেছেন, চিত্তে বাসনারূপে যা স্থির হয়ে আছে, সেই ভাবের নাম স্থায়িভাব।

অতঃপর বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাবের কথা উঠবে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্য-বিচার'-এর রস ও 'কাব্য'-অধ্যায়ে যথাক্রমে এই তিনটি সূত্র দিয়েছেন—

[১] 'যে বস্তুকে অবলম্বন করিয়া রস উৎপন্ন হয় এবং পারিপার্শ্বিক যে সমস্ত অবস্থা রসোদ্গারের প্রতি অনুকূল হয়, তাহাকে যথাক্রমে আলম্বন ও উদ্দীপন বিভাব কহে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে আমরা বলিব যে ইহারা রসের objective conditions।'

[২] 'শারীরিক অঙ্গবিক্ষেপাদির দ্বারাই শৃঙ্গারাদি বিবিধ মনোভাব স্ফুট হইতে পারে। ইংরাজীতে বলিতে গেলে এইগুলিকে emotion-এর expression বলা যাইতে পারে। expression ছাড়া কোনও emotion-ই স্ফূর্তি লাভ করিতে পারে না। এই expression কেই অনুভাব কহে।

[৩] শৃঙ্গারাদি কোন একটি প্রধান ভাব-উপভোগের সময় তাহার উপাদান স্বরূপ যে সমস্ত চঞ্চল ভাব চিত্তকে অনুরঞ্জিত করিয়া যায়, তাহাদিগকে ব্যভিচারী ভাব কহে।

এই সূত্রগুলির সঙ্গে এবার একে একে কয়েকটি দৃষ্টান্ত মিলিয়ে নেওয়া যাক্।

'বাসন্তী রঙ্ বসনখানি নেশার মতো চক্ষে ধরে'

—এখানে বাসন্তী রঙ বসনখানি হলো উদ্দীপনার বস্তু-কারণ, অতএব, 'উদ্দীপন-বিভাব'।

এবং—

'তোমার আমার এই যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি।'

—এখানে 'তুমি' ও 'আমি' এই দুটি সর্বনামের আড়ালে যে প্রণয়ি-যুগলের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে তাঁরা পরস্পর পরস্পরের প্রণয়বোধের ব্যক্তি-কারণ,—অতএব, 'আলম্বন-বিভাব'।

তারপর—

'বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি'
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোণে
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।'

—এখানে বিরহিণীর বিরহজনিত ব্যাকুলতার প্রকাশ ঘটেছে গৃহকোণে বসে নীপ-অঞ্জলি রচনার মধ্য দিয়ে। এরই নাম অনুভাব।

ব্যভিচারী ভাবের অন্য একটি নাম, সঞ্চারী ভাব। সাহিত্যে নরনারীর প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে রতিভাবের সঙ্গে লজ্জা, শঙ্কা প্রভৃতি যেসব দ্রুতচরমান অন্যান্য ভাবের মিশ্রণ অনুভব করা যায় সেইগুলিই হলো সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবের দৃষ্টান্ত। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ব্যাখ্যা করে লিখেছেন—

'যদিও ব্যভিচারিভাবগুলি স্থায়িভাবের সহিত সর্বদা যুক্ত থাকে না তথাপি সুপক্ব ব্যঞ্জনাদিতে যেমন একই মূল আস্বাদ থাকে ও অন্যান্য নানা প্রকারের আস্বাদ তাহার সহিত জড়িত হইয়া থাকে, তেমনি স্থায়িরূপে যে মূল রসই থাকুক তাহার সহিত ব্যভিচারিভাব যুক্ত হইয়া তাহাকে নানা আস্বাদে শবলিত করিয়া তোলে।'

'এই ভয় উঠে মনে এই ভয় উঠে।
না জানি কানুর প্রেম তিলে যেন টুটে॥
গড়ন ভাঙ্গিতে সই আছে কত খল।
ভাঙ্গিয়া গড়িতে পারে সে বড় বিরল॥

যথা তথা যাই আমি যতদূর পাই।
চাঁদ মুখের মধুর হাসে তিলেক জুড়াই॥
সে হেন বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়।
হাম নারী অবলার বধ লাগে তায়॥'

চণ্ডীদাসের এই পদে রাধিকার আত্মনিবেদনের ব্যাকুলতা ফুটেছে। কোন্ মুহূর্তে কৃষ্ণপ্রেমে বঞ্চিত হবেন, এই তাঁর আশঙ্কা! রতিভাবের সঙ্গে এখানে মিশে আছে আশঙ্কার সঞ্চারী ভাব।

১২৯১ সালে জয়গোপাল গোস্বামীর 'কাব্যদর্পণ' ছাপা হয়েছিল। বাংলায় লেখা অলংকার-শাস্ত্রের বইগুলির মধ্যে সে বইখানি বিশেষ উল্লেখের দাবী করতে পারে। তাতে ব্যভিচারিভাবের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে যে, 'রসাভিমুখে যাহা বিশিষ্টরূপে বিচরণ করে তাহার নাম ব্যভিচারী'। বাংলায় 'ব্যভিচারী'-শব্দটি ভ্রষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এজন্য 'ব্যভিচারী ভাব'-এর কথা শুনে কারো কারো মনে হয়তো মূল ভাবের বিরোধী বা প্রতিকূল কোনো ভাব-এর ধারণা জাগতে পারে। 'ব্যভিচারী ভাব'-এর ব্যাখ্যাসূত্রে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সপ্তম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, 'বি'ও 'অভি' এই দুটি উপসর্গ গত্যর্থক 'চর্'ধাতুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে [মূল] রসের অভিমুখে বিবিধভাবে চরমান [অন্যান্য] ভাবের কথা সূচনা করে।

স্থায়ী ভাবকে সমুদ্র কল্পনা করে ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাবমালাকে তার তরঙ্গ কল্পনা করলে বিষয়টি সুবোধ্য মনে হবে। বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে' ব্যভিচারী র পরিচয়সূত্রে লেখা হয়েছে যে তারা 'স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাঃ', অর্থাৎ, তারা স্থায়ী ভাবে একবার ডুবছে, আবার উঠছে। শারদাতনয়-এর 'ভাবপ্রকাশন'-গ্রন্থেও এই সমুদ্রকল্লোলের উপমান স্বীকৃত হয়েছে। সকল রসেই এরা সঞ্চরণ করতে পারে বলে এদের অন্য নাম, সঞ্চারী।

সর্বসমেত ব্যভিচারী ভাবের সংখ্যা হলো তেত্রিশ, যথা,—নির্বেদ, আবেগ, দৈন্য, শ্রম, মদ, জড়তা, উগ্রতা, মোহ, বিরোধ বা জাগরণ, সুপ্তি বা স্বপ্ন, গর্ব, হর্ষ, আলস্য, অমর্ষ, নিদ্রা, অবহিত্থা বা ভাবগুপ্তি, অপস্মার বা মূর্ছা, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ বা মৃত্যুসদৃশ অবস্থা, গ্লানি, শঙ্কা, চিন্তা, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, ঔৎসুক্য, অসূয়া, ত্রাস, বিতর্ক, মতি এবং বিষাদ।

সমস্ত ব্যভিচারী ভাবই স্থায়ী ভাবের সঙ্গে জড়িত। স্থায়ী ভাবের সম্পর্কহীন ব্যভিচারী-র কল্পনা অসম্ভব।

ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব,—এই চারটি সামগ্রীর অর্থবোধের পরে রস-কথাটির সঙ্গে এইসব কথার সম্পর্ক বোঝা দরকার। স্থায়ী ভাব যখন সঞ্চারী ভাবের সঙ্গে জড়িত হয়ে বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে 'সাহিত্যে নিবেশিত হয়' [এই ঊর্ধ্বকমা চিহ্নিত কথাটি শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা'য় প্রয়োগ করেছেন], তখন রতি প্রভৃতি ভাব, শৃঙ্গার প্রভৃতি রসে পরিণত হয়। যথাক্রমে রতি থেকে শৃঙ্গার রস, হাসভাব থেকে হাস্যরস, শোকভাব থেকে করুণ রস, ক্রোধভাব থেকে রৌদ্ররস, উৎসাহ থেকে বীররস, ভয় থেকে ভয়ানক, জুগুপ্সা থেকে বীভৎস, বিস্ময় থেকে অদ্ভুত এবং শমভাব থেকে শান্তরসের উদ্ভবের কথা বলা হয়েছে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর ব্যাখ্যার মধ্যে বলেছেন—'রস শব্দ বিশেষভাবে কাব্যনাট্যাদির দ্বারা প্রয়োজিত অনুভবস্থলেই ব্যবহৃত হয়।' তাঁর ব্যাখ্যান থেকে এখানে আরো কিছু অংশ স্মরণ করা আবশ্যক—

> 'লৌকিক অনুভবস্থলে স্মৃতি বা অনুমানের দ্বারা অন্যের চিত্তের ভাব যখন আমরা জানি বলিয়া মনে করি, তখন অন্যের চিত্তের সেই ভাব আমাদের চিত্তে অনুভূত হয় না। একটি লোককে পলাইতে দেখিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি যে, সে ভয় পাইয়াছে কিন্তু তাহার চিত্তে ভয়ের অনুভূতি আমাদের মনে অনুভূত হয় না।'

তিনি আরো বলেছেন—

> 'কাব্যে ও নাট্যে যে রস পাঠক ও দর্শক অনুভব করে তাহার সহিত বাহ্যঘটনার কোন সম্পর্ক নাই। প্রত্যেকের মধ্যেই কতকগুলি স্থায়িভাব বা instinctive dominant emotion প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। কাব্য বা নাট্যের দ্বারা যে বিশেষ একটি চেতনোদ্ভব বা aesthetic attitude ঘটে,

তাহারই অনুপ্রেরণায় আমাদের অন্তরস্থ কোন স্থায়িভাব যখন উদ্রিক্ত হয় তখন আমরা যে রসসম্ভোগ করি তাহা বাহ্যবস্তুর সহিত জড়িত নহে এবং পরাপেক্ষী নহে।'

কাব্য বা নাট্য-সাহিত্যের সূত্রে আমরা যে সুখ-দুঃখের বোধ অনুভব করি, তার সঙ্গে 'বাহ্যঘটনার' সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই বটে, তবে, তা' থেকে কবি বা নাট্যকারদের মনে যে ভাব বা অনুভূতি, মনন, চিন্তা, কল্পনা ইত্যাদি জেগে ওঠে, সেই উৎসেই ঘটে রসের অভ্যুদয়। সাহিত্যে আমরা জগৎকে পাই সাহিত্যিকের সত্তার আবরণীর মধ্য দিয়ে। সেই সত্তার রহস্য যে কী, তা কে বলবে? দেশ-কাল-বাসনা-সংস্কার, লেখার ক্ষমতা, শব্দ ও বাক্যের বিশিষ্টতা ইত্যাদি নানা ব্যাপার আছে সেই সত্তার সঙ্গে জড়িত।

এখন স্থায়িভাব, ব্যভিচারী ভাব, অনুভাব এবং বিভাব সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্র সাজিয়ে রাখা যাক্।

[১] স্থায়িভাব:

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ
আস্বাদাঙ্কুর-কন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥

—সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আস্বাদ ব্যাপারটিকে যদি গাছের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে তার কন্দ বা মূলের নাম স্থায়িভাব। বিরুদ্ধই হোক, অবিরুদ্ধই হোক্ কোনো ভাবই তাকে তিরোহিত করতে পারেনা।

[২] ব্যভিচারী বা সঞ্চারী ভাব:

উন্মজ্জন্তো নিমজ্জন্তঃ কল্লোলাশ্চ যথার্ণবে।
তস্যোৎকর্ষং বিতন্বন্তি যান্তি তদ্রূপতামপি॥
স্থায়িন্যুন্মগ্ননির্মগ্নাস্তথৈব ব্যভিচারিণঃ
পুষ্ণন্তি স্থায়িনং স্বাংশ্চ তত্র যান্তি রসাত্মতাম্॥

—ভাবপ্রকাশন, প্রথম অধিকার।

বারবার সমুদ্র থেকে উঠে, সমুদ্রেই বিলীন হয়ে ঢেউগুলি যেমন সমুদ্রের শোভা বা উৎকর্ষ বাড়িয়ে সাগরেরই রূপে রূপময় হয়ে ওঠে, ব্যভিচারী

ভাবগুলিও সেইরকম স্থায়ী ভাবের সমুদ্রে জন্ম লাভ করে, তাতেই বার বার বিলীন হয়ে স্থায়ী ভাবের পোষণ করে এবং রসাত্মক হয়ে ওঠে।

[৩] বিভাব :

রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে বিভাবাঃ কাব্য-নাট্যয়োঃ।

—সাহিত্যদর্পণ, তৃতীয়।

সাধারণ লৌকিক জীবনে রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্বোধক বলে যেসব লক্ষণ পরিচিত, কাব্যে এবং নাটকে তাদেরই নাম বিভাব।

[৪] অনুভাব :

অনু পশ্চাদ্ ভাবঃ উৎপত্তির্যেষাম্।

—রসগঙ্গাধর, প্রথম।

কারণ থেকে যেমন কার্য, বিভাব থেকে তেমনি অনুভাব-এর উৎপত্তি। কারণের পিছু পিছু যাদের 'ভাব' বা উৎপত্তি ঘটে, কাব্যে বা নাটকে তাদেরই নাম অনুভাব।

এখন বিশেষ ভাবে মনে রাখা দরকার যে, এই সব প্রসঙ্গের যে সংজ্ঞাগুলি ওপরে সাজিয়ে দেওয়া হলো, পণ্ডিতরা সেসব নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক করেছেন। এখানে তার বিশদ আলোচনা করা হয় নি। তবে, এ অঞ্চলে প্রবেশ করার প্রাথমিক সম্বল হিসেবে স্থায়ী ও সঞ্চারী ভাব এবং বিভাব ও অনুভাব সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা এ থেকেই পাওয়া যাবে।

বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ

—ভরতের নাট্যশাস্ত্রের এই সূত্রটি ধরেই এই অধ্যায়ে পর পর চারটি সামগ্রীর অর্থবোধের চেষ্টা করা গেল। ভাব, বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী ভাবের সংযোগে রসনিষ্পত্তি ঘটে থাকে। বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণের' অন্যতম ব্যাখ্যাতা P. V. Kane তাঁর বইয়ের ভূমিকায় রসবাদীদের এ মতবাদ সম্বন্ধে জানিয়েছেন—

'The theory of rasa has a semi-physiological, semi-psychological basis and tries to explain how human feelings and emotions are worked upon by poetry.'

তিনি স্থায়িভাবকে বলেছেন, permanent or dominant moods,—সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাবকে বলেছেন, fleeting or secondary moods,—আলম্বন-বিভাবকে determining elements,—উদ্দীপন-বিভাবকে exciting elements,—এবং অনুভাব-কে external manifestations।

সাহিত্যের বিশ্লেষণ

বাংলা 'রীতি'—ইংরেজি 'ষ্টাইল'—বিস্তা—কালচার—অলঙ্কার—সংস্কৃত 'রীতি'—ধ্বনি—'রস'—'দীপ্তি ও 'রুতি' কাব্য।

বিচারের জন্যই বিশ্লেষণ দরকার। সাহিত্য পড়ে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সে জিনিস মাথা খাটিয়ে, বিশ্লেষণ করে পাবার বাধ্যতা নেই। তাই প্রথমেই মেনে নেওয়া দরকার যে, রসবোধহীন ব্যক্তির পক্ষে বিশ্লেষণের কাজ অকাজ মাত্র।

সাহিত্যের সমালোচকরা বিশ্লেষণের নানাপথ দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। 'বস্তু' ও 'রীতি',—'অলঙ্কার' ও 'রস',—'বুদ্ধি' ও 'বোধি',—'লক্ষ্য' ও 'উপায়' ইত্যাদি নানাকথা যুগে যুগে নানা সমলোচকের লেখায় পুঞ্জিত হয়ে সাহিত্য-বিশ্লেষণের বিচিত্র সম্ভাবনার পথ দেখিয়েছে। এই প্রাক্-কথাটি মনে রেখে প্রথমেই 'বস্তু' ও 'রীতি'র কথায় আসা যাক্।

বাংলা 'রীতি' কথাটি অনেক সময় ইংরেজি style-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

একারম্যানের সঙ্গে সংলাপসূত্রে গোটে [Conversations with Eckermann] বলেছিলেন, 'মোটকথা, লেখকের 'ষ্টাইল' হলো তাঁর আপন মনের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি; অতএব স্বচ্ছ রীতির লেখা যদি কেউ লিখতে চান, তাহলে আগে তিনি হোন স্পষ্ট ভাবনার ভাবুক,—মহৎ ষ্টাইলের জন্যেই চাই মহান্ আত্মার সম্পদ।

ভাষার যে-গুণ 'ষ্টাইল' নামে পরিচিত, সে তো ভাবনারই ফল—মূলে ওটি হলো মনেরই ভঙ্গি!

'শেষের কবিতা'র অমিত, শিলঙ্ পাহাড়ের নানা রঙের ছ্যাৎলা-পড়া এক পাথরের গা-বেয়ে চলা ঝর্নার ধারে বসে নির্জন, উজ্জ্বল এক সকালে লাবণ্যকে বলেছিল, "দেখুন আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু, আর একটা চল্‌তি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা, এই রকম জায়গার জন্যে। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো,—সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরন উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরয়।" অর্থাৎ লোকের নিত্য

প্রয়োজনের ভাষা আর সাধু বিদ্বৎ-সমাজের ভাষা,—ভাষার পরিচিত এই দুটো রীতি ছাড়া অতি ঘনিষ্ঠ, নিভৃত, অন্তরঙ্গ অনুভূতির আস্বাদনবাহী তৃতীয় কেনো এক রীতি থাকা দরকার। কিন্তু এক-দুই-তিনের সীমাতেই কি মানুষের প্রয়োজন ফুরোয়? মনের যতো রঙ্, যতো ঋতু, যতো লগ্ন,—রীতিরও ততো ভেদ, ততো বৈচিত্র্য!

অর্থাৎ, অনুভূতি থেকেই রীতির প্রেরণা। সেই প্রেরণাকে সার্থক করে তোলবার জন্য শিল্পীর জীবনে যথার্থ লক্ষ্যবোধ-শাসিত অধ্যবসায় দরকার। এই কথাটি অতি সহজ করে বুঝিয়ে বেন্ জন্‌সন্ বলেছেন, "ভালো লিখতে হলে চাই তিনটি কৃত্যের প্রতি মনোযোগ—সব-সেরা লেখকদের লেখা পড়তে হবে, সব-সেরা বক্তাদের কথা শুনতে হবে—এবং, নিজের ষ্টাইলের চাই বিশেষ অনুশীলন। ষ্টাইলের বিষয়ে,—অর্থাৎ কোন্ কথা কী ভাবে লেখা উচিত সে সম্পর্কে, সব-প্রথমে দরকার বিষয়বস্তুর ভাবনা, তারপর আছে শব্দ বাছায়ের কাজ, তারপর দু'তরফের ওজন দেখতে হবে। অতঃপর রচনার সৌষ্ঠবের দিকে নজর রেখে বস্তু, বাক্য ও শব্দের যথোচিত বিন্যাস ঘটানো চাই। আন্তরিক পরিশ্রমের সঙ্গে ঘনঘন এ বিষয়ে অভ্যাস করা দরকার।"

পোপের 'An Essay on Criticism'-এ ছন্দোবন্ধে প্রায় একই কথার ইশারা দেওয়া হয়েছে। পোপ বলেছিলেন—

> সাবলীল রীতি সাধনার দান—ভাগ্যের নয়,
> যেমন নাচের অনায়াস ছাঁদ শিক্ষা-তে হয়।
> শুধু কর্কশ-পরিহারই নয় কাম্যের শেষ,
> ধ্বনি হওয়া চাই মনোভাবনার শব্দিত রেশ।

[True ease in writing comes from art, not chance,
As those move easiest who have learn'd to dance.
'Tis not enough no harshness gives offence,
The sound must seem an echo to the sense.

—An Essay on Criticism : Alexander Pope.]

কিন্তু 'ষ্টাইল' আর 'বিদ্যা' এক কথা নয়। 'শেষের কবিতা'র অমিতের অভিমত—'কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যা, আর ওর, থেকে যে-আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার'।

লেখকের 'কালচার'ই তাঁর লেখার 'ষ্টাইল' বা রীতি হয়ে ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঐ প্রসিদ্ধ নায়কের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছিলেন—"অমিতর নেশাই হল ষ্টাইলে। কেবল সাহিত্য বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে,—পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হোল একেবারে পঞ্চম। অন্তকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে।"

গল্প-উপন্যাস-কবিতার আধারে 'ষ্টাইল' শব্দটির প্রতি লেখকদের এই ধরণের ইশারা থেকে 'ষ্টাইলের' বিস্তৃততর ব্যাখ্যার দিকে এগিয়ে যেতে হলে উনিশের শতকের লেখক Walter Pater [১৮৩৯-১৮৯৪]-এর 'Style'-প্রবন্ধটির কথা মনে পড়া স্বাভাবিক।

ইংরেজিতে 'matter' এবং 'style' দুটি শব্দ অনেক ক্ষেত্রে পাশা-পাশি প্রয়োগ করে 'matter' বা বস্তুর সঙ্গে 'style' অর্থাৎ রীতির সম্বন্ধ দেখানো হয়ে থাকে। ভাস্কর যেমন পাথর কেটে মূর্তি গড়ে থাকেন, কবি তেমনি শব্দ সাজিয়ে কবিতা লেখেন। এ হিসেবে ভাস্করের 'বস্তু' যেমন পাথর, তেমনি কবির 'বস্তু' হলো শব্দ। কিন্তু সাহিত্য-বিচার শাস্ত্রে এ অর্থে 'বস্তু' কথাটার চল নেই। সাহিত্যের 'বস্তু' বললে রচনাবিশেষের চিন্তা বা ভাব-উপাদানই বোঝায়। রচনার 'বস্তু' মানে তার এই ভেতরের উপাদান, রচনার 'ষ্টাইল' সেই উপাদানের পরিবেষণ-কৌশল। ইংরেজিতে অনেক সময়ে 'ষ্টাইল' কথাটি তাই কেবল composition বা শব্দ, বাক্য, অনুচ্ছেদ ইত্যাদি বিন্যাসের কায়দা বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু সে কায়দা তো লেখকের মনেরই ভঙ্গি। যান্ত্রিক ভাবে কতকগুলি বিধিমাত্র অনুসরণ করে যে লেখক তাঁর শব্দ-বাক্য-অনুচ্ছেদ সাজিয়ে সন্তুষ্ট হন, তিনি ষ্টাইলহীন composition-এর গণ্ডীতেই বন্দী, কিন্তু যে মুহূর্তে তাঁর স্বাধীন মনোভঙ্গির ছোঁয়াচ লাগে, সেই মুহূর্তেই লেখা হয়ে ওঠে 'ষ্টাইলে' বিশিষ্ট।

অতএব শিশুচিত্তহারী ইকড়ি-মিকড়ি পদ্যেই হোক, আর উপনিষদের মতো গভীর ভাবময় কাব্যেই হোক, সাহিত্যে যেখানে অনুভূতির প্রসাদ, সেইখানেই 'ষ্টাইলে'র চিহ্ন বিদ্যমান।

পেটার বলেছেন, জ্ঞানে হোক্, অজ্ঞানে হোক্, লেখকের লক্ষ্য যে পরিমাণে জগতের বস্তুসত্যের চেয়ে বস্তুর বোধসত্যের প্রকাশে ব্রতী হয়, লেখক সেই পরিমাণেই যথার্থ শিল্পীর সম্মানের অধিকারী।

Just in proportion as the writer's aim, consciously or unconsciously, comes to be the transcribing, not of the world, not of mere fact, but of the sense of it, he becomes an artist,... —Walter Pater.

তাহলে রচনাবিশেষের 'ষ্টাইল' হলো লেখকের বোধ-সত্যের রঙ।

সংস্কৃত 'রীতি' শব্দটি 'ষ্টাইলের' অর্থে বাংলায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সংস্কৃত 'রীতি' বলতে ঠিক এই বোধের বিষয় বোঝায় না। সংস্কৃত 'রীতি' হলো ভাষারই বিশেষ ভঙ্গি। অপর পক্ষে, 'ষ্টাইল' কোনো মতেই নিছক ভাষার ভঙ্গি নয়।

ইংরেজিতে 'ষ্টাইল' শব্দটি কিন্তু কখনো 'ব্যক্তিবিশেষের বিচিত্র বাক্‌ভঙ্গি' বোঝাবার জন্য, কখনো বা 'রচনানৈপুণ্য' অর্থে, কখনো আবার ব্যক্তি বা রচনার কোনো মনোভঙ্গির বিশেষত্ব বা প্রাঞ্জলতা না বুঝিয়ে শিল্পীর গূঢ়তর কল্পনার সামর্থ্য বুঝিয়ে থাকে। এই তিন অর্থের পারস্পরিক পার্থক্য যাই হোক না কেন, ইংরেজিতে 'ষ্টাইল'-যে শিল্পীর আন্তর প্রকৃতিরই সূচক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃতের 'রীতি' ইংরেজি 'ষ্টাইলের' প্রতিশব্দ নয়।

সাহিত্যের বিচার-বিশ্লেষণে বিশেষ অর্থে 'অলঙ্কার' - শব্দের ব্যবহার যে কতোদিনের, সেকথার সুনিশ্চিত জবাব দেওয়া সহজ নয়। 'অগ্নিপুরাণ', ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' ইত্যাদি প্রাচীন বইয়ে 'অলঙ্কারের' কথা আছে। খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতকে সংস্কৃত গদ্য এবং পদ্য দুইই 'অলঙ্কৃত' করবার রীতি সজ্ঞানে স্বীকার করা হয়েছিল। বামন, ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, রুদ্রট, প্রতিহারেন্দুরাজ প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি অলঙ্কারের প্রাধান্যের ওপর জোর দিয়েছেন।

অনেকে 'অগ্নিপুরাণ'-কেই এতৎসম্পর্কিত প্রাচীনতম গ্রন্থ বলে স্বীকার করেন। কিন্তু, প্রাচীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন বিষয় বা উক্তি অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার কাহিনী বিরল নয়। খ্রীষ্টাব্দের নবম শতকের রচনা আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোক'-এর কোনো কোনো উক্তি 'অগ্নিপুরাণে'র অলঙ্কার সম্পর্কিত অধ্যায়ে প্রবেশ করেছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে বলেন, এ বিষয়ে আনন্দবর্ধন 'অগ্নিপুরাণে'র কাছে ঋণী। প্রতিপক্ষ বলেন 'অগ্নিপুরাণে'র ঋণই নাকি স্পষ্টতর। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের' রচনাকাল নিয়ে এই ধরনের বিভিন্ন ধারণার চলন আছে। পাণিনির ব্যাকরণে নটসূত্রের কথা আছে;

কিন্তু, সেখানে অলঙ্কারসূত্রের কথা নেই দেখে মনে হয় যে, অলঙ্কার-শাস্ত্রের পর্যালোচনার আগেই নাট্যশাস্ত্রের পর্যালোচনা পণ্ডিতসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' লেখা হয় পাণিনির বহুকাল পরে। খ্রীষ্টজন্মের সাত-আট শ' বছর আগে পাণিনি জীবিত ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী। 'নাট্যশাস্ত্রে' অলঙ্কারের আলোচনা একটি গৌণ ব্যাপার। সেখানে উপমা, রূপক, দীপক, যমক—এই চারটি মাত্র অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের পার্থক্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনা নেই সে-পুথিতে।

অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাচীনতম এবং বিস্তৃততর ব্যাখ্যাকার হলেন ভামহ। ভট্টি [পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক ?] এবং দণ্ডী [সপ্তম শতক ?] তাঁর পূর্বগামী। 'নাট্যশাস্ত্র' খ্রীষ্টজন্মের প্রায় শ'তিনেক বছর পরে লেখা হয়েছিল ধরে নিলে মারাত্মক ভুল হয়না। তেমনি, ভামহকে খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতকের বা তার কিছু আগেকার লোক বলে পণ্ডিতরা মেনে নিয়েছেন। উদ্ভট এবং বামন উভয়েই তাঁর পরের যুগের লোক। বামন সম্ভবতঃ আনন্দবর্ধনের অগ্রগামী। কিন্তু বামনের সঙ্গে আনন্দবর্ধনের কালগত ব্যবধান খুব বেশি নয়। রুদ্রট এবং রাজশেখর তেমনি নবম-দশম শতকে, কাছাকাছি বা একই সময়ে জীবিত ছিলেন বলে মনে হয়। রাজশেখর এবং ধনঞ্জয় উভয়েই ছিলেন দশম শতকের লোক। রাজশেখরের 'কাব্যমীমাংসা' এবং ধনঞ্জয়ের 'দশরূপক'-এর নাম প্রসিদ্ধ। একাদশ শতকের প্রসিদ্ধ আলোচকদের মধ্যে কুন্তকের নাম স্মরণীয়। 'বক্রোক্তিজীবিতম্' তাঁর বিখ্যাত বই। কুন্তকের সমসাময়িক ছিলেন ক্ষেমেন্দ্র। 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ'-প্রণেতা ভোজরাজও একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন। দ্বাদশ শতকে মম্মট ভট্ট ও অলট লেখেন 'কাব্যপ্রকাশ'। 'অলঙ্কারসর্বস্বের' লেখক রাজানক রুয্যক এই বইখানির টীকা লিখেছিলেন। সারদাতনয়ের 'ভাবপ্রকাশ' সম্ভবতঃ এই শতকেই লেখা হয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বিশ্বনাথ তাঁর বহুশ্রুত অলঙ্কারগ্রন্থ 'সাহিত্যদর্পণ' লেখেন। ষোড়শ শতকে রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' এবং জীবগোস্বামীর লোচন-রোচনী' টীকা লেখা হয়। 'কুবলয়ানন্দ' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক অপ্পয়দীক্ষিত ছিলেন এই সময়ের লোক। সপ্তদশ শতকের অলঙ্কার-গ্রন্থকারদের মধ্যে 'রসগঙ্গাধর'-প্রণেতা জগন্নাথের নাম সুবিদিত। অষ্টাদশ শতকের অচ্যুত

রায়ের 'সাহিত্যসার' বইখানিও স্মরণীয়। সংস্কৃতের দীর্ঘ ইতিহাসে আরো কতো আলোচকের নাম রয়েছে! এখানে ক'জনের মাত্র উল্লেখ করা হলো।

সংস্কৃত সাহিত্যের বিপুল, বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে অলঙ্কারশাস্ত্রের পরিমাণ যেন অমেয়। লেখকদের,—বিশেষতঃ প্রাচীন লেখকদের সময় নির্ধারণ করা দুঃসাধ্য। অনুমান, কল্পনা,—পরোক্ষ সম্ভাবনার নির্দেশ ইত্যাদি ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে তাঁদের আয়ুষ্কালের খসড়া তৈরি হয়েছে। দশম শতকের আগেকার বইগুলির মধ্যে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রের' পরে একেবারে আনন্দবর্ধনের 'ধ্বন্যালোকে' পৌঁছে 'রস' কথাটির বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। অবশ্য, তৎপূর্বে উদ্ভট বলেছেন, রস প্রভৃতিই হলো কাব্যের আত্মা। এই 'প্রভৃতিই' ['রসাদি'] কথাটি তুচ্ছ নয়। রসের সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারের কথাও এতে যেন স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যাই হোক্, 'অলঙ্কার'-এর কথাই সেকালে সহস্রকণ্ঠে বার-বার বলা হয়েছে। অগ্নিপুরাণ বলেছেন, যে কাব্যে অর্থালঙ্কার নেই, সে কাব্য যেন বিধবা! দণ্ডী বলেছেন, অলঙ্কার হলো কাব্যের শোভাকর ধর্ম। বামন বলেছেন, অলঙ্কারের জন্যই কাব্য গ্রাহ্য হয়। দণ্ডী, ভামহ, বামন—এঁরা প্রত্যেকেই শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের ভেদ স্বীকার করেছেন। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের মতো আরো দুটি পৃথক শব্দের পাশাপাশি প্রয়োগ দেখা যায় প্রাচীন কালের অলঙ্কারের আলোচনায়। 'দোষরাহিত্য' এবং 'গুণসাহিত্যের' কথা স্মরণীয়। তার মানে, সুপ্রযুক্ত অলঙ্কার হবে দোষহীন এবং গুণসম্পন্ন। বামন অলঙ্কারের বিষয়ে এই কথা বলেছেন বটে,—অলঙ্কারের মাহাত্ম্যও তিনি স্বীকার করেছেন,—তবে এসব বলেও 'রীতি'-কেই তিনি কাব্যের আত্মা বলে মেনেছেন। ইংরেজি Style-এর অর্থে 'রীতি'-শব্দের প্রচলনের কথা বলা হয়েছে। এখন সংস্কৃতের এই 'রীতি' কি?—এ প্রশ্নের উত্তর হলো, 'পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি'। 'রীতি'র আলোচনাসূত্রে শ্লেষ, প্রসাদ, সমতা, মাধুর্য, সুকুমারতা ইত্যাদি গুণের কথা বলা হয়েছে। দণ্ডী এইভাবে বৈদর্ভী রীতির দশটি পৃথক গুণ দেখিয়েছেন। বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী—বামন এই তিন রীতির উল্লেখ করেছেন। বিশ্বনাথ এ-ছাড়া লাটী-রীতির কথা বলেছেন। ভোজরাজের গ্রন্থে আবন্তিকা ও মাগধীর উল্লেখ আছে। কিন্তু ভামহ ছিলেন এরকম রীতিবাদের বিরোধী। সেকালে, অলঙ্কারের কথা থেকে এইভাবে ক্রমশঃ

রীতির কথা উঠেছিল। তবে, 'রীতি'কে কাব্যের আত্মা বলে স্বীকার করা পরবর্তী আলঙ্কারিকদের সকলের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের পর্যালোচনায় [ধ্বন্যালোক ও লোচনটীকা] 'ব্যঙ্গ্য' এবং 'ধ্বনি'-র কথাই মুখ্য। 'প্রতীয়মান' বা 'বঙ্গ্য'-ই হলো কাব্যার্থের গভীর দিক। 'বাচ্যার্থ' আর 'ব্যঞ্জনা' অভিন্ন নয়। শব্দের যেমন আভিধানিক অর্থ আর প্রসঙ্গলব্ধ অর্থ এক না হতেও পারে,—'অভিধা' এবং 'লক্ষণা'র মধ্যে অর্থভেদ যেমন সুবিদিত,—কাব্যে তেমনি 'বাচ্যার্থ' আর 'ব্যঞ্জনা' হলো পৃথক ব্যাপার। উপমা প্রভৃতি বিভিন্ন উপায়ে বাচ্যার্থ প্রকাশিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে, কাব্যের শব্দ, সাধারণ অর্থ ইত্যাদি সর্বপ্রকার স্পষ্ট ও দৃশ্য ব্যাপারের সম্পর্ক ছাড়া, অথচ, তাদেরই মধ্যস্থতায় অভিব্যক্ত গূঢ়তর অর্থের নাম ব্যঞ্জনা। তারই নামান্তর হলো ধ্বনি। এই ধ্বনিগম্য অর্থের আবার তিন জাতি। বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি এবং রসধ্বনি। আনন্দবর্ধন, মম্মট প্রভৃতি ধ্বনিবাদীরা ধ্বনির এই ত্রিজাতিভেদ মেনে নিয়েছেন। ধ্বন্যালোকের টীকাকার অভিনবগুপ্ত কিন্তু আরো এগিয়ে গেছেন। তাঁর মতে, বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কারধ্বনিও শেষ পর্যন্ত রসধ্বনিতেই বিলীন হয়!

'অলঙ্কার' থেকে 'রীতি',—'রীতি' থেকে 'ধ্বনির' প্রসঙ্গে পৌছোনো গেল। বাচ্য ও বাচককে অতিক্রম করে ধ্বনি যেন তদতিশায়ী অন্য এক সত্যকে প্রকাশ করে! শব্দ ও অর্থ যেখানে নিজেদের গৌণ করে,—নিজেদের উপসর্জন করে অন্য অর্থবিশেষকে অভিব্যক্ত করে, সেই সেই ক্ষেত্রে সেরকম অভিব্যক্তিরই নাম ধ্বনি। রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা'র কবিতায় 'অকথিত বাণী, অগীত গান'-এর গূঢ়তার স্বীকৃতি আছে। ধ্বনি সেই গূঢ় চমৎকারিত্ব। ধ্বনির ধ্বনন মানে, অনুভূতিময় মনের স্পন্দন। শব্দ, ছন্দ, ভাব, অর্থ সকলের সম্মিলিত আবেদনেই ধ্বনির সার্থকতা। ধ্বনির এই ধ্বনন বা স্পন্দন থেকেই দেখা দেয় অন্তরের বাসনা-বিলাস। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন—

> 'যাহার বাসনালোক পুষ্ট নহে এবং অনুভূতিশক্তি দুর্বল, তাহার পক্ষে আমাদের ব্যাখ্যাত ধ্বনন ব্যাপারময় কাব্যার্থের উপলব্ধি করা সুসম্ভব নহে। ধ্বননব্যাপারের অনুকূল চিত্তশক্তির নাম অনুমান বা Inference নয়, তাহা হইতেছে কল্পনা বা

> Imagination। এই জন্যই বাসনালোক ও কল্পনাশক্তির তারতম্য অনুযায়ী একই কবিতা বিভিন্ন হৃদয়ে বিভিন্ন আবেদন উপস্থিত করিতে পারে।'

প্রাচীন ধ্বনিকার বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনির যে ভেদ স্বীকার করেছেন, অধুনিক আলোচক সেই জাতিভেদ মেনে নিয়েও 'ভাবধ্বনি' এবং 'অর্থধ্বনি' নামে পৃথক দুই শ্রেণীবিভাগের প্রস্তাব করেছেন। সেই প্রস্তাব অনুসারে বস্তু ও অলঙ্কারের ধ্বনি হবে অর্থধ্বনি-র অন্তর্ভুক্ত। দীপ্তিপ্রধান সকল বিষয়ই অর্থের অন্তর্গত হবে। সুতরাং 'দীপ্তি' ব্যাপারটি আগে বোঝা দরকার। 'কাব্যালোক'-এর প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে এ-প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেখানে 'ভাব-বশে চিত্ত দ্রবীভূত বা বিগলিত হয়' সেখানে দেখা দেয় মনের 'দ্রুতিগুণ'; আর, যেখানে 'অর্থের আলোড়নে চিত্ত দীপ্ত' হয়, সেখানে দেখা দেয় 'দীপ্তিগুণ'। দ্রুতিদীপ্তিবাদী দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন—

> 'চিত্তের দ্রুতিগুণ মুখ্যতঃ হৃদয়ের ধর্ম, তাহা দ্বারা ভাব জাগে এবং ভাবের ও রসের আস্বাদন হয়। চিত্তের দীপ্তিগুণ মুখ্যতঃ বুদ্ধির ধর্ম, তাহাদ্বারা অর্থের স্ফুরণ ও রম্যবোধের প্রকাশ হয়।'

ভাবকে তিনি বলেছেন, emotion অথবা feeling; অর্থের প্রতি-শব্দ দিয়েছেন, thought, meaning, character। নন্দনবোধ বা 'aesthetic quality' কাব্যের 'ভাবে'ও যেমন, পূর্ববর্ণিত 'অর্থে'ও তেমনি বিদ্যমান থাকতে পারে।

হৃদয় ও বুদ্ধির সমবায়ে গঠিত রসিকের চিত্তে ভাব ও অর্থের তারতম্যময় কাব্য-বস্তুর উপলব্ধি ঘটতে পারে দু'ভাবে। যে কাব্যে দ্রুতিশক্তির স্ফুরণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়, তা পাঠ করলে চিত্তে ভাব-তন্ময়তার অবস্থা সৃষ্ট হয়। আস্বাদনকারী তাঁর নিজের পরিমিত, লৌকিক ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদ বা সীমা বিস্মৃত হয়ে রস অর্থাৎ আনন্দ উপভোগ করেন। অপর পক্ষে, যে কাব্যপাঠে চিত্তে বুদ্ধিবৃত্তির প্রাবল্যে দীপ্তিশক্তির স্ফুরণ বেশি হয়, তা আমাদের মনে রম্যার্থ-তন্ময়তার সৃষ্টি করে। রম্যার্থদীপ্ত চিত্তেও আত্ম-পর ভেদবুদ্ধি দূরী-ভূত হয়ে দেখা দেয় সেই একই সংবিদানন্দ। অর্থাৎ বস্তুর ভাব থেকে

যেমন রসের আস্বাদন,—অর্থাৎ আনন্দ,—বস্তুর রম্যার্থ থেকেও তেমনি রম্যার্থবোধজনিত আনন্দ। দুয়েরই সিদ্ধি আনন্দে। তাহ'লে, 'দ্রুতিকাব্য' এবং 'দীপ্তিকাব্যে'র ভেদ হলো যথাক্রমে অনুভূতিপ্রধান এবং অর্থজ্ঞান-প্রধান কাব্যের ভেদ।

এখন একথা সহজেই বোঝা যায় যে, ধ্বনিকার যাকে বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কারধ্বনি নামে অভিহিত করেছেন সে দুই পদার্থ-ই হলো অর্থজ্ঞানের প্রাধান্যে চিহ্নিত। ডক্টর দাশগুপ্ত সেই কারণেই ঐ দুই জাতিকেই দীপ্তি-শক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অলঙ্কারের আবেদন বুঝতে হয় মাথা খাটিয়ে। মাথা খাটিয়ে যে আনন্দ ভোগ করতে হয়, তাতে বুদ্ধিমানের বুদ্ধির সামর্থ্য ধরা পড়ে। যতক্ষণ বুদ্ধির প্রাধান্য, ততক্ষণ চিৎ-শক্তির জয়! তাতে ভোক্তার সঙ্গে ভোগ্য বস্তুর মিলন হলেও, যিনি ভোগ করছেন তাঁর অহং যেন নিজের স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করতে চায় না। তাতে রম্যতার বোধ ঘটলেও বোদ্ধা এবং বোধ্য থাকে পৃথক সীমাতে,—পৃথক এলাকায়। অবশ্য কেবল মস্তিষ্কের কাজই যদি পাঠকের সমস্ত চৈতন্যকে ব্যাপৃত করে রাখে তাহলে কাব্যবোধের সম্ভাবনা হবে সুদূরপরাহত। অঙ্ক কষবার সুখ আর বুদ্ধিদীপ্ত কবিতা পাঠের সুখ নিশ্চয় এক-জাতের অনুভূতি নয়। যে-কাব্যে মনের দীপ্তিশক্তির স্ফুরণ বেশি হয়, তাতেও আনন্দের পথ খোলা থাকে। সে আনন্দ কবিতারই আনন্দ,—গণিত বা বিজ্ঞানের তত্ত্ববোধের আনন্দ নয়। বুদ্ধির পথ পেরিয়ে মন এক লহমায় সুখের ঘাটে পৌঁছে যায়। উৎপলের শত পত্র ভেদ করতে শাণিত তরবারির আর কতটুকু সময় লাগে? বুদ্ধিতে উদ্দীপ্ত রসিকের মন যেন সেই শাণিত তরবারি!

যাই হোক্, 'রম্যতাবোধ' আর 'ভাবতন্ময়তা' এক অবস্থা নয়। রম্যতা-বোধের মধ্যে অহং-এর প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী। আর, 'ভাবতন্ময়তা'-তে অহং অপেক্ষাকৃত তন্ময়ত্ব লাভ করে। অবশ্য পূর্ণ তন্ময়ত্ব বা তৎ-ভাবে বা তৎ-বস্তুতে সমর্পণ সাহিত্য-ভোগের সাধ্যও নয়, কাম্যও নয়। কাব্যপাঠের ফলে কী হয়? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়,—আনন্দ লাভ হয়। সেই আনন্দই বড়ো আনন্দ, যাতে ভেদ বা পার্থক্যের ছোট-ছোট বেড়াগুলো মুছে যায়, সরে যায়। বুদ্ধি মানুষকে শ্রেণী কল্পনার উৎসাহ দেয়। তাতে বস্তুতে-বস্তুতে কেবলই ভেদ! শ্রেণীতে-শ্রেণীতে নিরন্তর পার্থক্য! অপর পক্ষে,

'জগতে কেহ নাই, সবাই প্রাণে মোর।'

—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি হলো প্রত্যক্ষ অনুভূতির আলোকে আলোকিত। এতে অনুভূতিসমর্থ মন বাগ্‌বাহুল্য ব্যতিরেকে সুখে দ্রবীভূত হয়। এরই নাম দ্রুতিগুণ। কাব্য পাঠ-রত ব্যক্তির নিজের পৃথক চিত্তাবরণ এইভাবে অপসারিত না হওয়া পর্যন্ত প্রকৃত কাব্যানন্দের অনুভূতি অসম্ভব। যা'তে দীপ্তি-গুণের আধিক্য, সেরকম কাব্য পড়ে পাঠককে প্রথমে তার অলঙ্কার ও অন্যান্য বুদ্ধিগম্য ব্যাপারের উপলব্ধিজনিত সুখের ঘাটে পৌঁছোতে হয়। তারপর সেই ঘাট থেকে উপযুক্ত অর্থরম্যতার গুণে আমরা ঊর্ধ্বতর আনন্দলোকে পৌঁছোতে পারি। সুতরাং 'দীপ্তি' আর 'দ্রুতি' একই কবিতায় সম্মিলিতভাবে থাকাও বিচিত্র নয়।

গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া
মুরতি নিত্য নব।

—এই কাব্যাংশে মানুষের প্রিয় মনোবাঞ্ছাগুলিকে বহুমূল্য সোনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এক দুর্জ্ঞেয় স্রষ্টার সৃজনরহস্যের মাধুর্যকে তাঁর খেলা-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। চিরপরিবর্তনশীল এই সংসারে মানুষের নব নব বিচিত্রতার অনুসন্ধানকে বলা হয়েছে—'তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্য নব।' এটি বুঝতে হয় প্রথমে। বোঝা শেষ হলে, —কিংবা বোঝা-র সঙ্গে-সঙ্গে মনে পরমাশ্চর্য এক ধ্বনির ধ্বনন জাগে। দীপ্তিধ্বনি থেকে,—কিংবা দীপ্তিধ্বনির সঙ্গে-সঙ্গেই রসিকের মনে জাগে দ্রুতিধ্বনি।

দীপ্তিকাব্যে অর্থ থেকে রম্যবোধে, এবং, দ্রুতিকাব্যে ভাব থেকে রসে—এই মনোগতিই হলো যথাক্রমে দীপ্তি ও দ্রুতির ভেদ। ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত এই ভেদটি সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করে উভয়ের গভীরতর ঐক্যের কথা ব্যক্ত করেছেন—

"উভয়বিধ কাব্যই পাঠকের আত্মানন্দের প্রাপক এবং কবির আত্মানন্দ হইতে সমুদ্ভূত।......দ্রুতিময়

কাব্য দেয় চিত্তে আস্বাদন, অবলম্বন তার হৃদয়-গত ভাব ; দীপ্তিময় কাব্য দেয় চিত্তে রম্যবোধ, অবলম্বন তার বুদ্ধি-গত রম্যার্থ।"

অতঃপর 'দ্রুতি' ও 'দীপ্তি', কাব্যের এই দুই প্রধান জাতির প্রকার-ভেদের কথা উঠেছে। দ্রুতিকাব্যের তিনটি এবং দীপ্তিকাব্যের দুটি, মোট পাঁচটি উপশাখার কথা বলা হয়েছে। দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্যালোক' থেকে সংজ্ঞাদি উদ্ধার করে এখানে যথাক্রমে এই পাঁচটি শ্রেণীর স্বরূপ নির্দেশিত হলো—

দ্রুতিকাব্য

[১] রসকাব্য বা রসোক্তি

"শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব যদি রসে পরিণত হয়, তবে কাব্য হয় রসকাব্য বা রসোক্তি।"

'রস'-কথাটি যেমন সহজ, তেমনি গোলমেলে। যা আস্বাদিত হয় তারই নাম রস। চমৎকারিত্বই রসের সার। সাহিত্যে মনের আনন্দ হলো রস। কিন্তু 'আনন্দ'-কথাটির মাধ্যমেই কি রসের প্রকৃতি বা স্বরূপ বোঝানো যায় ? বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণে' বলা হয়েছে যে, রস হলো বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্য, ব্রহ্মাস্বাদসহোদর, স্বপ্রকাশ, অখণ্ড, চিন্ময় আনন্দ এবং লোকোত্তর চমৎকার প্রাণ। 'বেদ্যান্তর সম্পর্কশূন্য' কথাটির মানে এই যে, তার সঙ্গে বাহ্যবিষয়ের সম্বন্ধ নেই; 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'-পদের অর্থ, —ব্রহ্মানুভূতিতে যেমন অন্য কোন বিষয়ের জ্ঞান থাকে না, রসেও তদ্রূপ; 'স্বপ্রকাশ' মানে, রস উৎপত্তির যা' কারণ, তারই মাধ্যমে তার প্রকাশ,—অর্থাৎ রসই রসের প্রকাশ—বিষয়ান্তর দিয়ে তার ব্যাখ্যা অসম্ভব ; 'অখণ্ড' কথাটির তাৎপর্য হলো—বিভাবাদি ব্যাপার আর তজ্জনিত রস পৃথক সামগ্রী নয়,—রসের মধ্যে রসের যাবতীয় কারণ একাত্মতা লাভ করে ; 'চিন্ময় আনন্দ' মানে 'রস' চিৎস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ ; 'লোকোত্তরচমৎকার প্রাণ'—এই উক্তির মধ্য দিয়ে অলৌকিক চমৎকারিত্ব বোধই যে রসের সার, তাই দ্যোতিত হয়েছে।

এই বহুশব্দময় বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই বা রসের কতোটুকু ব্যাখ্যা সম্ভব ? 'চাঁদ দেখছি'—এই কথাটির মধ্যে 'চাঁদ' হলো কর্ম, 'দেখছি' তৎসম্পর্কিত

ক্রিয়া। ক্রিয়া ও কর্মের ভেদ সুপরিচিত। কিন্তু রস ও রসের আস্বাদন অভিন্ন ব্যাপার। এতে ক্রিয়া-কর্মের ভেদ নেই।

বিভাব থেকে উৎপন্ন, অনুভাবের দ্বারা জ্ঞানগম্য, ব্যভিচারী ভাবের দ্বারা পরিপুষ্ট যে স্থায়িভাব,—সেই পদার্থই অভিনেতাতে আরোপিত হয়ে অপূর্ব এক উল্লাসরূপে দর্শকদের অনুভূতিতে ধরা পড়ে। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে এইভাবে নাট্যাভিনয়সম্পর্কিত রসের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্বনাথ বলেছেন, ছবিতে ঘোড়া দেখে বালকের মনে যেমন আসল ঘোড়ার ধারণা হয়,—অর্থাৎ ছবির ঘোড়া যে নকল ঘোড়া, মনে-মনে সে সংশয় দূর হয়ে তুরগবস্তুর পরিচ্ছেদশূন্য জ্ঞান জন্মায়,—দর্শকের মনে তেমনি রামের অভিনেতাই আসল রাম রূপে প্রতিভাত হন। সুতরাং অভিনেতার দায়িত্ব তুচ্ছ নয়। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাবের যথার্থ পরিস্ফুটন না করতে পারলে তাঁর কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই। নিজে রসজ্ঞ না হলে অন্যকে রসের আস্বাদন দেওয়া অসম্ভব।

প্রথমে 'রস' সম্বন্ধে এইসব শাস্ত্রবাক্য অনুধাবন করে তবেই 'রসকাব্য বা রসোক্তির' স্বরূপ বুঝতে হবে। দাশগুপ্ত মহাশয়ের দেওয়া যে-সংজ্ঞাটি ওপরে ছাপা হয়েছে তাতে ভাবের রসপরিণতির কথা স্পষ্ট। ভাব এবং রসের সম্পর্কটি এখন ভেবে দেখা দরকার।

প্রথমতঃ 'ভাব' হলো নির্বিকার চিত্তের প্রথম বিকার। 'সাহিত্য দর্পণ' সে কথা বলেছেন—'নির্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া'। [৩।১০০]

দ্বিতীয়তঃ, অবিরুদ্ধ বা বিরুদ্ধ যাই হোক্ না কেন, রস আস্বাদনের ব্যাপারে যে ভাবটি থাকে মূলে সুপ্রতিষ্ঠিত, যাকে অপসারিত করা সম্ভব নয়, তারই নাম স্থায়ী ভাব। আগেই একথা বলা হয়েছে। এখানে বিশ্বনাথের উক্তিটি আবার তুলে দেওয়া হলো—

অবিরুদ্ধা বিরুদ্ধা বা যং তিরোধাতুমক্ষমাঃ।
আস্বাদাঙ্কুরকন্দোঽসৌ ভাবঃ স্থায়ীতি সম্মতঃ॥

—সাহিত্যদর্পণ ৩।১৭৮

স্থায়ী ভাবের এই স্থায়িত্বের কথা আর একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে সম্ভবতঃ আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। মণিহারের বিভিন্ন মণিকে যেমন ভেতরের

বন্ধনসূত্রটি বেঁধে রাখে, স্থায়ী ভাব তেমনি অন্যান্য সকল ভাবের অন্তর্নিহিত সূত্র। যেখানে একাধিক ভাবের আবেশই প্রধান, কোনো বিশেষ ভাব যেখানে মণিহারনিহিত সূত্রের মতো পুষ্ট বা স্পৃষ্ট নয়,—সে রকম ক্ষেত্রে রসোক্তির পরিবর্তে ভাবোক্তি ঘটেছে, বলতে হবে। যতোই সূক্ষ্ম হোক্, ভাব ও রসের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে। ভাব যখন রসের আগে আগে চলে, তখন ভাবেরই গৌরব। জগন্নাথ বলেছেন, মন্ত্রী বা অন্য কোনো রাজকর্মচারীর বিবাহের মিছিলে বর যেমন আগে আগে চলেন, আর, স্বয়ং রাজা থাকেন অন্যান্য বরযাত্রীর মধ্যে, মিছিলের সহগামী,—তেমনি রসাবস্থা-প্রাপ্তির পূর্বে ভাবেরই পুরোগামিতা স্বীকার্য।

অন্তর মাঝে শুধু তুমি একা একাকী
তুমি অন্তর-ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে,
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্তগগনে,
চারিদিকে চিরযামিনী।
অকূল শান্তি, সেথায় বিপুল বিরতি,
একটি ভক্ত করিছে নিত্য আরতি,
নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি,
তুমি অচপল দামিনী।

—রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় জগতের বিচিত্র বস্তুর বিভাব থেকে উদ্ভূত রতি-বিস্ময়ের স্থায়ী ভাব দেশ-কালের পরিচ্ছেদহীন শুদ্ধ আনন্দের দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। এখানে অখণ্ড উপলব্ধির আনন্দ। এরই নাম রসোক্তি।

সংস্কৃত রসতত্ত্বের নিরিখে যাঁরা আধুনিক সাহিত্যের কাব্য-কবিতাদির বিচার করতে যান, তাঁরা হাল আমলের কবিতায় প্রধানতঃ ভাবোক্তি, স্বভাবোক্তি, গৌরবোক্তি, বক্রোক্তি ইত্যাদির অস্তিত্বই স্বীকার করেন, কিন্তু রসোক্তি কদাচ চোখে পড়ে! পরিণত শুদ্ধ রস,—দেশকালের অতি-শায়ী অখণ্ড আনন্দদ্যুতি আধুনিক নবীন কবিদের রচনায় অতি বিরল! সেজন্য আধুনিক বাংলা কবিতা থেকে রসোক্তির দৃষ্টান্ত তোলা কঠিন কাজ। শাস্ত্রকাররা দেশ-কাল-পাত্রের অধিকার অস্বীকার করেন নি। এ-যুগের

বিশেষ বিভাবের বিশেষ সামর্থ্য অনুভব করা যুগসচেতন সহৃদয় ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। জগতের বিচিত্র সৌন্দর্যের আবেদন-অনুভূতি থেকে রবীন্দ্রনাথ যেমন অন্তরের অখণ্ড আনন্দ-উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন, আধুনিকতম বাঙালী কবিদের মধ্যে কেউ কেউ কখনো কখনো এ-যুগের বোধ-বিশ্বাস অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে আধুনিক বিভাব থেকে তেমনি অখণ্ড রসদ্যুতি পরিবেষণ করতে যে না পারবেন, এমন নয়। কিন্তু একালের কবিরা,—অন্ততঃ বাঙালী কবিরা,—যতো চিন্তাশীল, ততো রসের অভিপ্রায়ী নন, একথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। রস একরকম পরম অভিনিবেশ,—আনন্দ-মগ্নতা! 'অচপল দমিনী,' 'অনিমেষ মূরতি' ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে যে ইশারা ফুটেছে, তা' রসিক ব্যক্তি নিজগুণে বুঝতে পারেন। তার ব্যাখ্যা অসম্ভব এবং নিষ্প্রয়োজন।

শব্দের চাতুর্য, অলঙ্কারের ঐশ্বর্য, অর্থের বক্রতা ইত্যাদি কাব্যের যাবতীয় ব্যাপারকে গৌণ করে রসই যেখানে মুখ্য সামগ্রী হয়ে ওঠে, সেখানেই রসোক্তির প্রকাশ। শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে প্রকৃতি অবাধে আমাদের চোখের মধ্য দিয়ে চৈতন্যে ধরা দেয়। 'রসোক্তি'-তে শব্দার্থ তেমনি শব্দকে অবলম্বন করে সরাসরি রূপান্তরিত হয় রসে বা আনন্দে।

[২] ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি

দ্বিতীয়তঃ, ভাবোক্তির বিভাগ। সুধীরকুমার লিখেছেন,—

> "যেখানে শব্দার্থের অবলম্বনে ভাব উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রধান হইয়াছে, কিন্তু রসোত্তীর্ণ হয় নাই, সেখানে ভাব-প্রধান বলিয়া কাব্যের নাম দেওয়া হইল ভাবকাব্য বা ভাবোক্তি। প্রাচীনগণ 'উদ্বুদ্ধমাত্র স্থায়ী', 'অঞ্জিত ব্যভিচারী' বা 'সঞ্চারিণঃ প্রধানানি' বলিয়া যে ভাবের কথা বলিয়াছেন, তাহা এই ভাব-কাব্যের অন্তর্গত।"

রসতত্ত্ব সম্বন্ধে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁরা ভাব এবং রসের পার্থক্য দেখিয়েছেন নিপুণভাবে। বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়ে স্থায়ী ভাব যখন সাহিত্যে নিবেশিত হয় তখন তা থেকে রসের

আস্বাদন ঘটে। রতি, এই স্থায়ী ভাবটির সঙ্গে লজ্জার সঞ্চারী ভাব জড়িত থাকতে পারে। এখন, কোনো কবিতায় প্রণয়ের স্থায়ী ভাবের পরিবর্তে, অর্থাৎ পুষ্ট রতি-ভাবের পরিবর্তে যদি কেবল তার আনুষঙ্গিক লজ্জার লক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়, তাহলে সঞ্চারী বা ব্যভিচারীই সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে বলতে হবে। এরকম রচনাও মনকে দ্রবীভূত করে বটে,—কিন্তু সে হলো ভাবোক্তি-জনিত কৃতি।

অন্তর তার কী বলিতে চায় চঞ্চল চরণে।
কণ্ঠের হার নয়ন ডুবায় চম্পক বরণে!

রবীন্দ্রনাথের একটি প্রবন্ধে ব্যবহৃত এই কাব্যাংশে এক জনের মনে অপরের অনুচ্চারিত উক্তির প্রতীক্ষা এবং সেই গৌরাঙ্গীর গলায় অলঙ্কারের অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণের আনন্দ সূচিত হয়েছে। শাস্ত্রের পরিভাষা ব্যবহার করে বলা যায় যে, এখানে ঔৎসুক্য ও হর্ষ, রতিভাবের এই দুই সঞ্চারী-ই প্রধান। স্থায়ী রতিভাবের স্পষ্টতার পরিবর্তে সঞ্চারীর আবেশ সৃষ্টিতেই এখানে কবির দক্ষতা প্রকাশিত। অতএব, একে বলা যাবে, ভাবোক্তি।

[৩] স্বভাবকাব্য বা স্বভাবোক্তি

'ভাবোক্তি' আর 'স্বভাবোক্তি'—দুটি কথা শুনতে প্রায় এক রকমের বটে, কিন্তু এ দুই পদার্থ এক নয়। ডক্টর দাশগুপ্ত লিখেছেন—

> "যেখানে বস্তু নিজ স্বভাবধর্মে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সেখানেও পাঠকের প্রীতি-প্রসন্ন চিত্ত কিছু বিগলিত হয় এবং বস্তু তাহার ভাবধর্মেই সেখানে প্রকাশিত হয়; এই জন্য এই জাতীয় রচনার নাম স্বভাবকাব্য বা স্বভাবোক্তি।"

অবনতমুখী পৌষলক্ষ্মী, আর অবারিত প্রাণপ্রাচুর্য:
ঝি-টা ক্রমাগত বক্ বক্ করে বক্‌ছে—
কে একজন মানপাতার উপরে
ছোট ছোট বড়ি দিচ্ছেন রৌদ্রে পিঠ দিয়ে,
খেজুর রসের জন্য ছেলেরা বায়না ধরেছে
মাঝে মাঝে উদাস উত্তরবায়ু বয়ে চলেছে
অশ্বত্থের জীর্ণ পাতা কাঁপিয়ে।

হেমচন্দ্র বাগচীর 'নবজন্ম'-কবিতায় এই অংশটিতে শীতরৌদ্রস্নাত একটি সুন্দর দিনের ছবি ফুটেছে। স্বভাবের এই চিত্রে কবির মনের কোনো বিশেষ ভাবরঞ্জিত উচ্চারিত মন্তব্য নেই,—প্রীতি বা অপ্রীতি প্রকাশের অলঙ্কৃতি নেই। এখানে 'পৌষলক্ষ্মী'-কথাটির মধ্যেই যা' অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে,—পরের অংশে পৌষের যে যে সূক্ষ্ম ধর্ম কবিমাত্রেরই সুবিদিত, কেবল সেই-সেই ধর্ম যথাসাধ্য যথাযথ ভাবে বলা হয়েছে। স্বভাবোক্তিই হলো অলঙ্কারের আদি-অলঙ্কার। প্রকৃতির যথাযথ অথচ বিশিষ্ট চিত্রণই হলো স্বভাবকাব্যের বৈশিষ্ট্য।

দীপ্তিকাব্য

[১] গৌরবকাব্য বা গৌরবোক্তি

দ্রুতিকাব্যের তিনটি শ্রেণীর কথা বলা হলো। 'রসোক্তি', 'ভাবোক্তি' এবং 'স্বভাবোক্তি'—এই তিনটি বিভাগের কথা শেষ করে এইবার দীপ্তিকাব্যের কথায় আসা যাক্। এর দুটি শাখা। প্রথমে গৌরবোক্তির সংজ্ঞা: যে কাব্যে অর্থগৌরব প্রধান, সে কাব্যের নাম 'গৌরবকাব্য' বা 'গৌরবোক্তি'।

কোনো দার্শনিক তত্ত্ববোধ,—দেশপ্রীতি, অথবা সৃষ্টি ও স্রষ্টার মহিমা চিন্তা ইত্যাদি ব্যাপার যেখানে প্রধান আবেদনের বিষয়, সে রকম দৃষ্টান্তেই দেখা যায় অর্থগৌরব। এরকম অর্থগৌরবের ফলে কাব্যপাঠকের মনে জাগে রম্যবোধ। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-য় এই গৌরবোক্তির বহু দৃষ্টান্ত আছে। আবার,—

আমরা জীবন গড়ি,
মরণে মধুর করি,
নিরাশায় দেই আশা;
শিশুরে হৃদয়ে টানি,
রমণীরে দেবী মানি,
যুবজনে ভালবাসা।
পীড়িতের লাগি বুঝি
পতিতের ব্যথা বুঝি,
সচেতন রাখি দেশ;

আমরা দেশের প্রাণ,
প্রীতি, স্মৃতি, ধ্যান, জ্ঞান ;
আমরা আদি ও শেষ।

অক্ষয়কুমার বড়ালের 'কবি'-কবিতার এই কটি ছত্রে কবিধর্মের মহিমা প্রকাশিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এখানে অর্থের গৌরবই আমাদের প্রীতির কারণ। বুদ্ধদেব বসুর কবিতা থেকে নিচে যে উদ্ধৃতিটি ছাপা হলো সেখানেও দেখা যাচ্ছে কাব্যার্থের অনুরূপ গৌরব—

মোরা কবি, কাব্য সরস্বতী
আমাদের চির-প্রিয়তমা। এই বিংশ শতাব্দীরে
বহু দুঃখ দিয়েছে মহিমা, বহু কবি করেছেন
বহু স্বপ্নে ঐশ্বর্যশালিনী ; মোরা তাহারি সন্তান।
উন্মুক্ত আকাশতলে লভিয়াছি উদার জীবন,
সহ-জন্মা কবিতারে। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতিদিন
টানে শ্বাস, লভে মৃত্যু—তরঙ্গের ক্ষণিক বুদ্বুদ!
আমরা তাদের নহি, বিধাতার নির্বাচিত মোরা।

দ্রুতিকাব্যের উপশাখাগুলির মধ্যে রসোক্তি বা রসকাব্য যেমন অল্পকথায় ব্যাখ্যা করা শক্ত, দীপ্তিকাব্যের মধ্যে তেমনি 'বক্রোক্তি' বা 'বক্রকাব্য'।

[২] বক্রকাব্য বা বক্রোক্তি

অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন—

"যেখানে রচনার বক্রতা অর্থাৎ বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গিই প্রধান, সেখানে কাব্য হইবে বক্রকাব্য বা বক্রোক্তি।"

"বক্রোক্তিকে আবার অর্থবক্রোক্তি ও অলঙ্কারবক্রোক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত করা চলে। বক্রতা প্রধানতঃ অর্থ-কে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ পাইলে অর্থাৎ অর্থের স্বকীয় গৌরব নহে, কেবল কল্পনাময় বিন্যাস-ভঙ্গীর চমৎকারিত্ব থাকিলে রচনা হইবে অর্থবক্রোক্তি। আর যেখানে অর্থ মুখ্য নয়, কেবল অলঙ্কারই মুখ্য, বক্রতা কেবল অলঙ্কারের ঝঙ্কারে, সেখানে রচনা অলঙ্কার-বক্রোক্তি।"

'বক্রোক্তিজীবিত'-গ্রন্থের লেখক কুন্তক বলেছিলেন—বৈদগ্ধ্যপূর্ণ ভঙ্গী-সহকারে যে ভণিতি বা উক্তি ব্যবহৃত হয়, তারই নাম বক্রোক্তি। নিপুণ কবিকর্মের দ্বারা সৃষ্ট চমৎকারিত্বময় প্রকাশ-ই এতে সূচিত হয়। কুন্তক ছিলেন বক্রোক্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কুন্তকের কথা স্মরণ করে সুধীরকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন—

> "তিনি বলিয়াছেন, বক্রতার সহিত অন্বিত না হইলে অলঙ্কার হয় না এবং রসও রস হয় না। ধ্বনিও কুন্তকের মতে বক্রতারই এক প্রকার ভেদ; ধ্বনির একটি রূপ তাঁহার 'উপচারবক্রতা'। এই সকল বিষয়েই আমরা তাঁহার সহিত একমত না হইলেও বক্রোক্তি যে একজাতীয় কাব্যের প্রাণ, তাহা স্বীকার করি। আমাদের মতে যে সকল কাব্য রসপ্রধান নহে, স্বভাবোক্তিও নহে, গৌরবোক্তিও নহে, কিন্তু শব্দ ও অর্থের বিন্যাস ও প্রকাশভঙ্গীগুণে দীপ্তিপ্রধান তাহাদিগকে বক্রোক্তিকাব্য বলা চলে। বক্রোক্তিতে তাই অলঙ্কার, রীতি গুণ ঝলমল করে।"

তিনি স্পষ্টভাবে আরো জানিয়ে দিয়েছেন—"রসপ্রধান কাব্যকে কোন প্রকারেই বক্রোক্তিকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করা উচিত নহে।"

> "কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা
> পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥"

ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দরে' বিদ্যার রূপবর্ণনার এই অংশে অলঙ্কার-বক্রোক্তির দৃষ্টান্ত পাওয়া যাচ্ছে।

রাধা-কৃষ্ণের পরস্পরের আকর্ষণের কথা বলতে গিয়ে চণ্ডীদাস গান বেঁধেছিলেন—

> "ভানু কমল বলি সেহ হেন নহে
> হিমে কমল মরে ভানু সুখে রহে॥
> চাতক জলদ কহি সে নহে তুলনা।
> সময় নহিলে সে না দেয় এককণা॥
> কুসুম মধুপ কহি সেহ নহে তুল।
> না আইলে ভ্রমর আপনি না যায় ফুল॥"

একটিমাত্র উপমেয় [রাধাকৃষ্ণের প্রেম] বহু উপমানের [ভানুকমল, চাতক-জলদ ইত্যাদি] সঙ্গে জড়িত হয়ে এখানে মালা-ব্যতিরেক অলঙ্কার ঘটিয়েছে। এ-উক্তিতেও অলঙ্কারঘটিত বক্রোক্তির নিদর্শন দেখা যাচ্ছে।

পক্ষান্তরে, বক্রোক্তি যেখানে অর্থপ্রধান, সেখানেই 'অর্থবক্রোক্তি'-র দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। ডক্টর দাশগুপ্তের দেওয়া এমনি একটি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে দেওয়া হলো—

"এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি—বলবো এবারে যারে তারে, ॥
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ হৃদে ধরে কোন্ বিচারে ?"

এখানে অলঙ্কারের ঐশ্বর্য নেই,—অর্থপ্রকাশের গৌরবই প্রধান। তাই এর নাম অর্থবক্রোক্তি।

'কাব্যালোক'-এ 'রুতি' ও 'দীপ্তি' কাব্যের এই মোট পাঁচটি বিভাগের কথা বলা হয়েছে। এই পঞ্চশাখার আলোচনা করে উপসংহারে লেখক জানিয়েছেন—

"আমাদের আলোচনায় ভামহ-কথিত বক্রোক্তি, দণ্ডীর কথিত স্বভাবোক্তি, উদ্ভটের কথিত ভাবোক্তি এবং উদ্ভট, ধ্বনিকার বা আনন্দবর্দ্ধন ও ভোজ প্রভৃতির কথিত রসোক্তি রহিয়াছে। আরও রহিয়াছে আমাদের কথিত গৌরবোক্তি। পূর্বাচার্যগণের অভিমতগুলি যুগোপযোগী সমুচিত ব্যাখ্যান দ্বারা যথাসম্ভব সমন্বয় করিয়া এবং নূতন মত যোজনা দ্বারা সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করা হইল।"

বলা বাহুল্য, তিনি পুরোনো সত্যই নতুন ভাবে পরিবেশন করেছেন।

৩

সাধারণীকরণ

খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতকে চীনদেশের জনপ্রিয় কবি ছিলেন পো-চুই। প্রবাদ আছে, তিনি নাকি এক বৃদ্ধা কৃষকরমণীকে তাঁর কবিতা শোনাতেন। আর, সেই স্ত্রীলোকটি যেসব শব্দের মানে বুঝতে পারতো না, পো-চুই তাঁর লেখা থেকে সেসব শব্দ বাদ দিয়ে নতুন শব্দ বসাতেন। সেকালে তু-ফু প্রভৃতি অন্যান্য চৈনিক কবিরা ছিলেন বিদ্যাবত্তার ভক্ত। তাঁদের রচনার মধ্যে তাঁদের লেখাপড়ার ছোপ থেকে যেতো। কিন্তু পো-চুই ছিলেন কবিতায় পাণ্ডিত্যের বিরোধী। তাঁর আপন-কথা অন্যের অন্তর স্পর্শ করুক, এই অভিপ্রায় তিনি কখনো ভোলেন নি। তু-ফুর মৃত্যুর দু'এক বছর পরেই তাঁর জন্ম হয়। পূর্ব যুগের পাণ্ডিত্যবিলসনের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সেযুগে সহজ কথা সহজ করে লেখবার নতুন রীতি দেখা দিয়েছিল। ষাট বছর বয়সের মনোভাব সম্বন্ধে একটি কবিতায় পো-চুই লিখেছিলেন—

তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে পঞ্চ রিপুর তাড়না।
সত্তর থেকে আশির মধ্যে একশ' ব্যাধির উপদ্রব!
কিন্তু পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যেই
সত্যিকার নিশ্চিন্ত অবসর,—হৃদয়ের শান্ত, স্থির বিশ্রাম!

আমি পেরিয়ে এসেছি ভালোবাসার আসক্তি, আর, লোভ,
আমার ভাবনা গেছে যশের এবং লাভের।
অসুখ ধরেনি এখনো, ক্ষয় শুরু হয়নি,—জরা এখনো দূরে।
নদী-গিরি সন্ধানের সামর্থ্য ফুরোয়নি আজও।
বাঁশির সুর আর বীণার ঝঙ্কারের জন্যে ক্ষুধা আছে অন্তরে।
ফুরসৎ পেলে পেয়ালার পরে পেয়ালা ভরে নিয়ে
পান করি নতুন মদিরা।
সুরায় সঞ্জীবিত আমার স্মৃতিতে জেগে ওঠে
পুরোনো কবিতার রেশ।
প্রাণ গান গায়—
অসংখ্য গান!

পো-চুই পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে যে নিরাসক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকে 'কবি'র মুখ দিয়ে ঠিক সেই কথাই যেন প্রকাশিত হয়েছে। বৈরাগ্যদুর্ভাবনাগ্রস্ত রাজাকে 'ফাল্গুনী'র 'কবি' বলেছিলেন,—"হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছে। তারা আর ফল চায়না, ফলতে চায়।"

এই কথার পরে 'ফাল্গুনী' নাটকের মহারাজ নাটক শুনতে রাজী হয়ে 'কবি'কে ডেকে বলেছিলেন—"কবি তাহোলে প্রস্তুত হ'গে।"

তখন 'কবি' জবাব দিয়েছিলেন—"না মহারাজ, আমি অপ্রস্তুত হয়েই কাজ করতে চাই। বেশি বানাতে গেলেই সত্য ছাই-চাপা পড়ে।"

শিল্পসৃষ্টির বিষয়ে এরকম কথা পৃথিবীর নানা দেশে নানা স্রষ্টা বহুবার বিভিন্নভাবে বলেছেন বলেই বিশ্বাস হয়। কারণ, সাহিত্যের সৃষ্টিরহস্যের সংশয়াতীত ইশারা আছে এরই মধ্যে নিহিত। পো-চুই খাঁটি কথাই বলেছিলেন! যে বয়সে কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর প্রভাব বেশি,—শারীরিক অসুস্থতায় এবং মানসিক জড়তায় জীবনের যেসব প্রহর থাকে আচ্ছন্ন, সেসব পর্বে আর যাই হোক্, কবিতার জন্ম অসম্ভব। সংসারে বিত্তের আকাঙ্ক্ষা, কামের তাড়না এবং যশের লোভ—তিনটিই প্রতাপে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। মানুষকে মাতিয়ে তুলতে এদের আর জুড়ি নেই। ব্যাধি যেমন দেহকে পঙ্গু করে রাখে, আসক্তির আকারে এরা তেমনি মানুষের মন জুড়ে বসে। কোনো বিশেষ স্বার্থে আবিষ্টমনা মানুষ বড়োই সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ। তার দৃষ্টি দূরে পৌঁছোয় না। তার আগ্রহ নিজের ক্ষুধার ভাবনাতেই সম্পূর্ণ নিবদ্ধ। আত্মসর্বস্ব মানুষ যে বন্ধুহীন, একথা কে না জানেন? শিল্পীকে তাঁর নিজের একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা-বেদনার সংকীর্ণ গণ্ডী ছেড়ে সর্বসাধারণের অনুভূতির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বয়সে তরুণ হলেও মননে প্রবীণ হতে হয়।

শিল্পী যিনি, তিনি যে সত্যিকার সামাজিক জীব, একথা প্রমথ চৌধুরি তাঁর 'সাহিত্যে খেলা' নামে ছোটো একটি প্রবন্ধে আমাদের স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন। নিজেকে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করে সকলের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার প্রবণতা হলো সামাজিকতার প্রথম ও প্রধান দাবী। সর্বসাধারণের সুখ-দুঃখ নিজের জীবনে নিজের সাধ্যানুসারে অনুভব করে সর্বসাধারণ-কে তা

পুনরায় ফিরিয়ে দেবার সাধনাই হলো শিল্পীর সাধনা। সেজন্য অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য চাই, কিন্তু আসক্তি নয়। আসক্তি-ই শিল্পীর সাধনার বিঘ্ন।

রসতত্ত্বের আলোচনায় 'সাধারণীকরণ' বা 'সাধারণীকৃতি' শব্দের মধ্যে শিল্পরহস্যের যে সত্য নিহিত আছে, তা বোঝবার পথে এগিয়ে যেতে হলে আগে এ সব কথা শান্ত হয়ে ভেবে দেখা দরকার। বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণের' তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ।
তৎপ্রভাবেণ যস্যাসন্ পাথোধিপ্লবনাদয়ঃ॥
প্রমাতা তদভেদেন স্বাত্মানং প্রতিপদ্যতে।
উৎসাহাদিসমুদ্বোধঃ সাধারণ্যাভিমানতঃ॥

অর্থাৎ, বিভাবাদি পদার্থের সাধারণীকৃতি নামে এক ব্যাপার আছে। তারই প্রভাবে সমুদ্রতরণের মতো অসাধারণ সামর্থ্যে সমৃদ্ধ রামচন্দ্রের সঙ্গে [রামায়ণকাব্যের গুণগ্রাহী পাঠকের] আত্মার অভেদত্ব উপলব্ধি করা যায়।

'সাহিত্যদর্পণ'কার পুনরপি ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন—

পরস্য ন পরস্যেতি মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥

অর্থাৎ, সাধারণীভবনের ফলে এ জিনিস পরের,—এ জিনিস পরের নয়, —এ আমার—না, এ আমার নয়, বিভাবাদি পদার্থের এরকম ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়।

বাংলা ভাষায় ব্যাপারটি আরো সহজ করে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। তাঁর 'কাব্য-বিচার' থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো—

> "নানাবিধ বেশভূষা পরিধান করে বলিয়া নটকে কোন বিশেষ ব্যক্তি বলিয়া মনে হয় অথচ রাম বলিয়া মনে হয় না। তাহা রোমাঞ্চাদি দ্বারা লৌকিক দেশকালাদির সহিত সম্বন্ধবিহীন ভাবে নটগত রত্যাদিভাব প্রকটিত করে। সেই রত্যাদি ভাবের মধ্যে স্বকীয় বাসনার উদ্বোধ প্রযুক্ত দর্শক অনুপ্রবিষ্ট হন। এইজন্য দর্শকের মনে যে রত্যাদিভাব উপস্থিত হয়, তাহা তাহার

ব্যক্তিগত নহে। বিভাবাদির বর্ণনা দ্বারা পাঠক বা দর্শকের চিত্তে একটি সৌন্দর্যঘটিত চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়। এই চিত্তবৃত্তিকে বিভাবাদির সাধারণীভাব কহে।"

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আরো বলেছেন—

"সাধারণীকরণ দুই প্রকারের; এক দিকে কাব্য বা নাট্য-বর্ণিত বস্তু তাহার দেশকালাদিবিশেষ স্বভাব বর্জিত হইয়া একটি সাধারণ স্বভাবে পাঠক বা দর্শকের চিত্তে উপস্থাপিত হয়; অপর দিকে এই সাধারণ স্বভাবটির স্বরূপ কাব্যজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের চিত্তেই একরূপেই প্রকাশ পায়। অর্থাৎ বিভিন্ন কাব্যজ্ঞের চিত্তে এই সাধারণীকৃত স্বভাবটি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পায় না;...।"

এবং—

"কাব্যজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রের মধ্যেই ভয়াদি যে সমস্ত ভাব কাব্যার্থ হইতে উপস্থিত হয়, তাহা এক জাতীয় সর্বসাধারণপ্রতীতি। আমাদের সকলের চিত্তের মধ্যেই প্রসুপ্ত ভাবে অনাদি কাল হইতে নানা জাতীয় ভোগানুভূতি ও ভোগের আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। সাধারণীকৃত ভয়াদি ভাব চিত্তের মধ্যে উপস্থাপিত হইলে অনাদিকাল সঞ্চিত কোন না কোন ভোগবাসনার সহিত যে পরিচয় ঘটে তাহার ফলেই সেই সাধারণীকৃত ভয়াদি ভাব রসরূপে পরিপুষ্ট হইয়া উঠে।"

ব্যক্তিনিরপেক্ষ ও বিষয়নিরপেক্ষ এই প্রতীতি সম্পর্কে ইংরেজি প্রতিশব্দ ব্যবহার করে সুরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটি-র বিশদতর ব্যাখ্যানের চেষ্টা করেছেন। "ইংরেজীতে বলিতে গেলে বলিতে পারি তাহা Universal Ideal Content"—তাঁর এই মন্তব্যের পাশাপাশি ডক্টর সুশীল দে-র ইংরেজি বইয়ের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। অধ্যাপক দে লিখেছিলেন—

"To state it briefly ahd without any technicality, there is in the mind a latent impression of feelings which we once went through [or which we acquired from previous births] and this is roused when we read a poem which des-

cribes similar things. By universal sympathy or feeling we become part and parcel of the same feeling and imagine ourselves in that condition. Thus the feeling is raised to a state of relish, called rasa, in which lies the essence of poetic enjoyment."

ইহজীবনে অথবা জন্মান্তরে লব্ধ অনুভূতির স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয় সমধর্মী অথবা তদ্বিষয়ক অনুভূতিময় কাব্য পাঠের ফলে। মানবমনের সর্বজনীন সমবেদনার সামর্থ্যের গুণে সেই অবস্থায় সেই জাতীয় অনুভূতির ভোগ থেকে আমরা কাব্যের রসপ্রতীতি লাভ করে থাকি। এই মন্তব্যের পরে তিনি জানিয়েছেন—

"It will be noticed that these theorists presuppose latent impression of experience [vasana] and universal sympathy [sadharanya or sadharanikarana].[১]

অর্থাৎ—এ থেকে এই সত্যটি চোখে পড়ে যে এই সব মতবাদের যাঁরা পোষক, তাঁরা কবিতা উপভোগের অভিজ্ঞতায় অস্ফুট স্মৃতিলোকের পুনরুজ্জীবন-তত্ত্বে এবং সার্বিক সমবেদনাঘটিত রসিকজনবেদ্য এক রকম আত্মীয়তা সাধনের সাধারণ সত্যে বিশ্বাসী। প্রথমটির নাম 'বাসনা', দ্বিতীয়টির নাম 'সাধারণ্য' বা 'সাধারণীকরণ'।

১। Studies in the History of Sanskrit Poetics. vol. II. pp. 168-69.

বাসনা

প্রাক্তন এবং বর্তমান ভেদে বাসনা দু'জাতের হতে পারে। 'সাহিত্য-দর্পণ'কার এ বিষয়ে আলোচনা করে জানিয়ে গেছেন যে, বাসনা যে রসোদ্বোধের হেতু রূপে স্বীকার্য, তাতে সন্দেহ নেই। ধর্মদত্ত নামে আর এক প্রাচীন শাস্ত্রকার বলেছিলেন যে, বাসনা যাদের নেই, সেরকম লোকেরা নাট্যশালায় নাট্যাভিনয়ের সাক্ষী হয়ে থাকে মাত্র,—তারা পাষাণের মতো জড়, কাষ্ঠখণ্ডের মতো নিষ্প্রাণ। নাটকের রসানুভূতি লাভ করা তাদের সাধ্যের বহির্ভূত।

বাংলায় লেখা আলোচনার মধ্যে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কয়েকটি কথা এইসূত্রে স্মরণীয়। কাব্য আস্বাদনের আন্তর্ব্যাপার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছিলেন—

> "কবিতা পড়িবার সময় একদিকে যেমন শব্দগুলি চক্ষুতে দেখিতে পাই, অপরদিকে তেমনি সেই শব্দগুলির শব্দাত্মক ধ্বনিমূলক কল্পনা মনের কানে ভাসিয়া বেড়ায়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহা উচ্চারণ করিতে গেলে বাগ্‌যন্ত্রের যে ক্রিয়াত্মক অনুভব, তাহার ছায়াও তাহার সহিত মিলিত হয়। শব্দ উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের ব্যাপারের কিংবা শব্দশ্রুতির যে অস্ফুট কল্পনা মনের মধ্যে ওঠে তাহার স্পষ্টতা ও গভীরতার তেমন প্রাধান্য নাই, কিন্তু তাহার ফলে চিত্তের মধ্যে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়, বাসনারূপে তাহার দ্বারা যে একটি নূতন চৈত্তিক ব্যাপার উদ্ভূত হয় তাহাই প্রধানতঃ কাব্যাস্বাদের প্রযোজক হয়।"

Richards-এর কথা মনে রেখে সুরেন্দ্রনাথ আরো বলেছেন—

> "সমসাময়িক ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যও বাসনার উদ্বোধের দ্বারা দ্যোতিত রস বা প্রবৃত্তিকেই কাব্যাস্বাদের সামগ্রী বলিয়া মনে করিয়াছে, এবং এই সামগ্রী যে শব্দশক্তিমূলক ও অর্থশক্তিমূলক ব্যঞ্জনার ফলে উদ্ভূত হয় তাহাও স্বীকার করিয়াছে।"

অন্যত্র তিনি বলেছেন—

> "প্রত্যেকের চিত্তের মধ্যেই অনাদিকাল সঞ্চিত নানাবিধ ভোগানুভূতি ও তজ্জন্য ভোগাকাঙ্ক্ষা, ভোগকুতুকতা সুপ্তপ্রায় ভাবে অর্দ্ধনিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সাধারণীকৃত স্বভাবটি যখন চিত্তে উপস্থাপিত হয় তখন তাহার সহিত এই অর্দ্ধনিমগ্ন কোন না কোন বাসনার যে অন্তরের পরিচয় ঘটে, তাহার ফলে রস-সম্ভোগ পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পায়। সাধারণীকৃত রূপের সর্বহৃদয়ে একত্ব থাকিলেও বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্বুদ্ধ বাসনার বৈচিত্র্যপ্রযুক্ত পরিচয়ের বৈচিত্র্য সম্ভব হয়।"

পণ্ডিতসমাজের দেওয়া এই ব্যাখ্যান থেকে 'বাসনা' কথাটির মধ্যে পাঠকের 'বোধশক্তি ও সহমর্মিতার' অর্থের ইশারা পাওয়া যাচ্ছে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর একটি প্রবন্ধে কাব্যপাঠের কথা বলতে গিয়ে এই দুটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ ইংরেজ কবি টেনিসনের যে উক্তিটি তিনি স্মরণ করেছিলেন, সেটি এখানে তুলে দেওয়া হলো—

> "Poetry like shot silk has many glancing colours ; every reader must find his own interpretation according to his light and according to his sympathy with the poet."

বাংলায় একথার অনুবাদের রূপ দাঁড়াবে এই রকম—

> এক জাতের রেশমী কাপড়ে যেমন নানা রঙের ঝলক লুকিয়ে থাকে এবং দ্রষ্টার অবস্থানভেদ অনুসারে যেমন চোখে পড়ে তার ভিন্ন-ভিন্ন রঙের জৌলুষ, কাব্যেও তেমনি একই রচনায় বহু অর্থ-সমাবেশের কথা মিথ্যা নয়,—পাঠকের আপন মনের আলো দিয়েই কবিতার অর্থে পৌঁছুতে হয়, কবির সঙ্গে পাঠকের সহ-মর্মিতার পার্থক্য অনুসারেই কবিতার অর্থভেদ ঘটে থাকে।

অতঃপর আধুনিকতর আর এক জন কবির আর একটি কথা মনে পড়ে। T. S. Eliot জানিয়েছেন যে, স্পর্শকাতর কবির মন তার শিল্পসাধনার পথে চিরসন্ধানী। চারিদিকের মনোজগৎ ও বস্তুজগৎ থেকে কবিতায় ব্যবহার্য

ছবি, শব্দ, শব্দবন্ধ ইত্যাদি যাবতীয় উপাদান নিত্য আহরণ করতে-করতে কবির জীবন ক্রমশঃ এগিয়ে চলে। কবে দেখা গেছে দশ বছর বয়সের একটি বালকের ব্যবহার,—পাহাড়ী পটভূমি, সমুদ্রের জল, তারই এক ফাঁকে প্রথম সমুদ্রকুসুমের সমারোহে বিস্মিত ছেলেটার জটিল মন! বিশ বছর পরে কবিকল্পনার গভীর তাগিদে কোনো অনাগত কবিতার ছত্রে হয়তো রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেবে সেদিনের বিলুপ্ত বহির্দৃশ্য !

এলিয়ট সাহেব এখানে কি শুধু মনের ওপরতলার ভাসা-ভাসা ভাবানুষঙ্গের কথাই বলেছেন? কেবলি কি শিল্পপ্রযুক্তির উপাদানের সংবাদ আর মামুলি কৌশলের ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে এখানে?

কবির সৃষ্টিতে তাঁর যাবতীয় পূর্বাভিজ্ঞতার প্রভাবের ইশারা এ মন্তব্যে সন্দেহাতীত ভাবে বিদ্যমান।

কবির পূর্বাভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর কবিতার বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গের যোগ ঘনিষ্ঠ। মনের সমস্ত প্রাপ্তি, সমস্ত আশাভঙ্গ, স্বপ্ন ও বাস্তবের সমস্ত নির্যাস ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয় তাঁর গূঢ় বাসনালোকে। তেমনি পাঠকেরও অন্তর্গূঢ় বাসনালোক! ইহজীবনের সঙ্গে জন্মান্তরের প্রত্যক্ষ বিভেদকে তুচ্ছ করে স্মৃতির সূক্ষ্ম, অতল পরিব্যাপ্তিকে স্বীকার করে নিয়েছেন কাব্যতত্ত্বের বিশ্লেষকসমাজ। প্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রচ্ছন্নের, কাছের সঙ্গে দূরের এবং বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যে মনোলীন সমাবেশ, সেই সংযোগভূমিরই নাম বাসনা!

ইংরেজিতে এই বাসনার নাম দেওয়া হয়েছে, 'acquired impulses' অথবা 'latent impressions'। 'ইদানীন্তনী' আর 'প্রাক্তনী' ভেদে বাসনার দুই পৃথক শ্রেণীর কথা বলেছেন বিশ্বনাথ কবিরাজ। প্রথমটির সাহায্যে ইহজীবনের স্মৃতির কথা বোঝানো হয়, দ্বিতীয়টিতে জন্মান্তরের। 'বাসনা'র বিষয়ে তাঁর মূল কথা অল্পকথায় বুঝিয়ে দিয়েছেন ডক্টর সুশীলকুমার দে। তাঁর মন্তব্য এখানে তুলে দেওয়া হলো—

> "If one is not endowed with these germs of the capacity of appreciation, one may develop them by study of poetry and experience of life. In the case of the grammarian, the philosopher or one well-versed in the sacred lore, these susceptibilities are deadened. ...Viswanatha is

anxious to show that experience and cultivation of the power of imagination are essential in one who seeks to enjoy rasa."[১]

১। Studies in the History of Sanskrit Poetics Vol. II, p. 331.

রসনা, চর্বণা, ভাবকত্ব, ভোজকত্ব

সংস্কৃত ভাষায় রসতত্ত্বমূলক গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত রসজ্ঞের নামান্তর হলো 'সামাজিক'।

কাব্য পাঠের সময়ে সামাজিকের মনোলোকে মোটামুটি এই রকম ব্যাপার ঘটে থাকে—কাব্যে বর্ণিত বা সংকেতিত ভাবের সঙ্গে তন্ময়ীভবনের ফলে তাঁর ভাবময় স্থির চিত্তে আনন্দস্বরূপের আবির্ভাব সম্ভব হয়। অর্থাৎ বাহ্য জগতের যে পরিচয় কবি তাঁর আপন মন দিয়ে আত্মসাৎ করেন এবং শিল্প-বাহনে সমর্পণ করে সামাজিকের উপভোগের জন্যে তিনি যা পরিবেষণ করেন, রসজ্ঞ পাঠক [অর্থাৎ সামাজিক] শব্দ-বাক্য-রীতিতে সমর্পিত কবি-মানসের সেই অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে তাঁর নিজের বাসনালোকে অনুরূপ ভাবের স্পন্দন অনুভব করেন। সাধারণীকরণের ফলে কবির অভিজ্ঞতা সামাজিকের অভিজ্ঞতা হয়ে ওঠে। এইভাবে কবির কাব্য থেকে রসিকের শান্ত চিত্তে স্মৃতির পুনরুজ্জীবন বশতঃ যে চর্বনা ঘটে, তারই নাম রস। চর্বনা কথাটি এই রহস্য প্রকাশের একটি ইশারা মাত্র। পণ্ডিতরা ও-কথা বার বার প্রয়োগ করেছেন। রসরহস্য ব্যাখ্যানের প্রচেষ্টায় রসনা, চর্বনা, আস্বাদ ইত্যাদি যতো শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে প্রায় সবগুলিই হলো স্বাদনার্থক। অভিনব গুপ্ত বলেছেন রসপ্রতীতির কথা। কাব্যের রস তাহলে ব্যক্তিনিরপেক্ষ বা ভোক্তানিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। একটি সমঝদার মনে ছাড়া রসের অন্যত্র অস্তিত্বের কল্পনা করা দুঃসাধ্য। তবে, লৌকিক জগতে লৌকিক রসনায় লৌকিক খাদ্যের স্বাদ নেওয়া, আর, সাহিত্যরসের স্বাদন, দুটি ব্যাপার অভিন্ন নয়। লৌকিক জগতে সন্দেশ খেতে খেতে সন্দেশের যে মধুর স্বাদ পাওয়া যায় তার সঙ্গে সেই বিশেষ সন্দেশের স্মৃতি অনিবার্যভাবে জড়িত থাকে। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে কেবল সেই স্বাদের নাম রস যা আমাদের ব্যক্তিগত আসক্তি-মুক্ত মনকে কোনো বিশেষ লৌকিক অভিজ্ঞতা বা উপাদানের সংকীর্ণ সীমানার মধ্যে ধরে রাখে না। লৌকিক খাদ্যের তালিকা থেকে শাস্ত্রকার সরবতের দৃষ্টান্ত তুলে ব্যাপারটি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। গোলমরিচ, চিনি, কর্পূর প্রভৃতির সমবায়ে তৈরি সরবৎ খাবার সময়ে আমরা যে স্বাদ পাই, সেটা গোলমরিচের নয়, চিনির স্বাদও নয়, কেবল কর্পূরেরও নয়। পৃথক-পৃথক

উপাদানের পার্থক্য ছাড়িয়ে পানক বা সরবতের ভোক্তা যে মিলিত, মিশ্র স্বাদের অভিজ্ঞতায় পৌঁছোন, কাব্যের রসাস্বাদনে কতকটা তেমনিই যেন ঘটে থাকে। তাকে বলা যায় 'অবিশেষ স্বাদনাত্মক ধর্ম'। কবি কর্ণপুর সামাজিকের এই আনন্দাত্মক বৃত্তির কথা বলে গেছেন।

অতএব সাহিত্য পাঠের ফলে রসজ্ঞ সামাজিকের মনে যে আনন্দ জাগে, সে হলো 'অবিশেষ' আনন্দ। বাসনালোকে বিদ্যমান স্থায়ীভাব উদ্রিক্ত হয় কাব্যোক্ত বিভাবের দ্বারা। বিভাব কোনো বিশেষ লৌকিক রূপ-গুণ-বস্তুর উল্লেখমাত্র নয়। কাব্যে আশ্রয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে যা-কিছু বিশেষ, সবই রূপান্তরিত হয় 'অবিশেষ'-এ।

ডক্টর সুশীলকুমার দে এর পরের অবস্থা সম্বন্ধে লিখেছেন—

> "The vibhavas, therefore, are generalised or impersonalised in the minds of the reader, and do not refer to particularities, not through the power of bhavakatva, as supposed by Bhatta Nayaka, but generally through the suggestive power of sound and sense and specifically through a skilful use of guna and alankara in poetry, and clever representation in the drama."[১]

ভট্টনায়ক সম্ভবতঃ অভিনব গুপ্তের সমকালীন ব্যক্তি। 'ভাবকত্ব' এবং 'ভোজকত্ব', এই দুটি কথার ওপর নির্ভর করে তিনি কবির সৃষ্টি এবং পাঠকের ভোগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন! তাঁর মতে শিল্প-সৌন্দর্যের উপলব্ধি এই দুটি সত্যে আশ্রিত। রস উৎপন্নও হয় ন', ব্যঞ্জিতও হয় না। রস কোনো উপাদানের সমাবেশে কিংবা নিমিত্তের কর্তৃত্বে তৈরি পদার্থ নয়। শিল্পসৃষ্টির আভ্যন্তরীণ একটি বিশেষ লক্ষণ হলো এই যে, তা আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে বাইরের বস্তুসৌন্দর্যের অভিজ্ঞতাজাত দেহহীন লাবণ্যের স্বীকৃতি। মনের সেই ক্ষমতার নাম 'ভাবকত্ব'। এ বিষয়ে দ্বিতীয় সত্যের নাম 'ভোজকত্ব'। ভোক্তার অন্তর্নিহিত যে শক্তি তাঁকে পূর্বোক্ত দেহহীন নির্বিশেষের স্বাদনে সমর্থ করে থাকে, ভট্টনায়ক তাকেই বলেছেন 'ভোজকত্ব'। অভিনব গুপ্ত কিন্তু এই ভেদ স্বীকার করেন নি। তবে ভট্টনায়কের ভাবকত্ব-

১। Studies in the History of Sanskrit Poetics. Vol. II. pp. 167-8.

ভোজকত্ববাদের আলোচনা করেছেন তিনি। বিভাবাদির সূত্র ধরে ভোক্তা কাব্যের রস ভোগ করেন, এই আপাতবিশ্বাস্য কথাটির চুলচেরা বিচার করে এর অন্তর্নিহিত ত্রুটির কথা বলা হয়েছে। অভিনব গুপ্ত জানিয়েছেন যে ভট্টনায়কের 'ভাবকত্ব'-বাদ সম্ভবতঃ 'ভাব' সম্বন্ধে ভরতের দেওয়া সংজ্ঞা থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকবে। তাছাড়া ভট্টনায়কের ওপর সাংখ্যদর্শনের প্রভাবের কথাও বলা হয়েছে। তিনি যে বলেছেন, "রস প্রতীতও হয় না, উৎপন্নও হয় না, অভিব্যক্তও হয় না", সে কথা এই সূত্রে একটু ভেবে নিতে আপত্তি হবে না। যে জিনিস একান্ত এবং সম্পূর্ণ নিজের বলে মনে হয় তাকেই বলে প্রতীতির বিষয়। ভট্টনায়ক দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন যে, রামায়ণ পড়বার সময়ে কোনো উদার মানুষ সীতাকে তাঁর নিজের স্ত্রী মনে করেছেন, এমন কথা অস্বাভাবিক। তারপর রসের উৎপত্তি কেন অসম্ভব, একথার জবাবে বলা হয়েছে যে, বিভাবাদিই যখন অলৌকিক তখন অ-বাস্তব থেকে কোনো কিছুর উৎপত্তি ঘটা কেমন করেই বা সম্ভব বলা যায়! আর, যা নেই তার অভিব্যক্তি বা প্রকাশই বা বিশ্বাস্য হবে কি করে? কোনো লৌকিক কার্যকারণ চিন্তার পথেও এ সামগ্রীর রহস্য ভেদ করা অসম্ভব মনে করে ভট্টনায়ক তাই রসিকজনের মনোলীন অলৌকিক এবং স্বতন্ত্র ঐ দুটি বৃত্তির কথা মেনে নিতে বলেছিলেন।

অভিনব গুপ্ত এসব কথার উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে রসের ভোগী-করণ ব্যাপারটি ভট্টনায়ক ঠিক পরিস্ফুট করতে পারেন নি। তিনি তাঁর নিজের মত জানাতে গিয়ে বলেছেন যে, যিনি কাব্যের প্রকৃত সমঝদার, কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ থেকে তিনি অর্থের অতিরিক্ত আরো কিছু পেয়ে থাকেন। শব্দার্থ-উপলব্ধির পরে তাঁর মনে শব্দার্থবাহিত বিশেষ বস্তুর বস্তুসীমা উবে গিয়ে নির্বিশেষ এক প্রতীতি জন্ম নেয়। মৃগান্বেষী দুষ্মন্ত শিকারের অনুসরণ করছেন, হরিণ প্রাণভয়ে আহার ফেলে দৌড়ে পালাচ্ছে, —'শকুন্তলা' কাব্যে এই সংবাদ যেখানে কবিতা হয়ে উঠেছে, সেখানে কাব্যের সেই রসসত্য তো বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ হরিণের সঙ্গে আবদ্ধ নয়। তবু, সমঝদারের মনে হরিণও থাকে, শিকারীও দেখা দেয়। রসিকের মনে ওরা নির্বিশেষ, সাধারণীকৃত, বাসনাচিত্রীকৃত, অলৌকিক সত্য।

•
••

ধ্বনি

স্ফোট—ব্যঞ্জনা—ব্যঙ্গ্যার্থ।

প্রথমে পতঞ্জলির মহাভাষ্যে, পরে ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়ে 'স্ফোট'-বাদের কথা বলা হয়েছে। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের কথা পুনরায় স্মরণ করে এবার 'ধ্বনি'র কথায় এগিয়ে যেতে হবে। তিনি লিখেছেন—

> 'তালু-ওষ্ঠাদির সংযোগের দ্বারায় যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকেই ধ্বনি বা নাদ বলা যায়। তাহাদের দ্বারা যে অখণ্ড শব্দের অভিব্যক্তি হয় তাহাকেই স্ফোট বলে।'

ধ্বনিবাদের আলোচনায় অনিবার্যভাবে 'স্ফোট'-কথাটি মনে পড়া স্বাভাবিক। ব্যাকরণের শাসন উপেক্ষা করে রসশাস্ত্রের মৌলিক মতামত গড়ে তোলা সেকালে সম্ভব ছিলো না। ডক্টর সুশীলকুমার দে'র বই থেকে এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক একটি মন্তব্য দেখা যাক—

> "Originating as a theory of expression, the theory of 'vyanjana', no doubt, received no recognition from orthodox grammarians, but not choosing to appear as an entirely novel theory, it sought the protection of the grammarian's authority by pretending that it was founded on the analogy of their 'sphota'-theory."[১]

অর্থাৎ—সনাতনপন্থী গোঁড়া বৈয়াকরণসমাজের কাছে 'ব্যঞ্জনা'-বাদ যে সমর্থন পায়নি, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আনকোরা নতুন একটি মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশের কুণ্ঠাবশতঃ বৈয়াকরণের আশ্রয়লিপ্সার তাগিদে 'ব্যঞ্জনাবাদের' প্রবর্তকরা ব্যাকরণশাস্ত্রে প্রচারিত প্রাচীন স্ফোটবাদের সাদৃশ্যসূত্রেই যে তাঁদের নতুন ধারণায় উদ্ভব ঘটেছিল, এই রকম ভাণ করেছিলেন।

১। পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃঃ ১৭৯।

ইংরেজিতে 'expression,' 'notion,' 'concept,' 'idea' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে 'স্ফোট' কথাটির অর্থ নির্দেশ করবার চেষ্টা হয়েছে। সুশীলকুমার বলেন যে, এইসব প্রয়োগের দ্বারা ও-কথার প্রকৃত অর্থের হদিস দেওয়া সম্ভব নয়। 'স্ফোট' ব্যাপারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "বৈয়াকরণেরা বলেন যে কানের মধ্যে যখন ধ্বনিপরম্পরা প্রবেশ করে, তখন, সেই ধ্বনিপরম্পরার শেষ ধ্বনিটি কানের মধ্যে প্রবেশ করিলে সেই ধ্বনিপরম্পরা-প্রভাবে একটি অখণ্ড শব্দের সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে, তাহাকে স্ফোট বলা হয়। ধ্বনি-পরম্পরার ঢেউগুলি একটির পর একটি আসিয়া যেমন উপস্থিত হয়, পূর্বের ঢেউগুলিও তেমনি বিনষ্ট হয় কিন্তু তথাপি সেই ধ্বনি-পরম্পরার শেষ অংশটি যখন কানের মধ্যে প্রবেশ করে, তখন একটি অখণ্ড শব্দের বোধ হয়।"

সুশীলকুমার লিখেছেন—

> "The sounds of a word as a whole and apart from those of the constituent letters, reveal the 'sphota'."

শব্দের বর্ণগত উচ্চারণের পারম্পর্য থেকে পাওয়া পূর্ণ শব্দটির এই জাতীয় অখণ্ডতাবোধের সাদৃশ্য-সূত্রের ওপর নির্ভর করে, আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা অতঃপর তাঁদের ধ্বনিবাদের ধারণা গড়ে তুলেছেন।

একথা সকলেরই সুবিদিত যে, শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে দেখা দেয় সেই শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ। 'বই' কথাটি উচ্চারণ করবার সঙ্গে-সঙ্গে মনে জেগে ওঠে বই সামগ্রীর বিশেষ ধারণা। 'মানুষ' বললে মা-নু-ষ, এই মিলিত অখণ্ড ধ্বনিসমাবেশের সংকেত ধরে আমরা যা বুঝি, সে হলো মানুষের ধারণা। বিশেষ শব্দের সঙ্গে সেই শব্দের দ্বারা সূচিত অর্থের এই যে প্রত্যক্ষ যোগ, এরই নাম শব্দের 'অভিধাশক্তি'। শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে চিরপরিচিত 'অভিধার্থ' আমাদের মনে জেগে ওঠে। এতো গেল বিভিন্ন শব্দের পৃথক-পৃথক অবস্থানের কথা। বাক্যের মধ্যে আশ্রিত পৃথক শব্দগুলির পরস্পরের যোগ তেমনি আবার 'তাৎপর্যশক্তি'র গুণে বোঝা

যায়। 'রাম বাড়ি যাবে', এই বাক্যের অন্তর্ভুক্ত পৃথক-পৃথক শব্দগুলি এই 'তাৎপর্যশক্তি'র গুণেই পরস্পর অন্বিত হয়ে শ্রোতা বা পাঠকের মনে তাদের অন্বিত অর্থ পরিবেষণ করে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাক্যের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ কোনো শব্দ অভিধাশক্তির গুণে তার নিজের প্রসিদ্ধ অর্থের সূচনা করলেও সেই অর্থ ধরে পুরো বাক্যের অন্বয়ে বাধা ঘটিয়ে থাকে। 'সভায় লালপাগড়ি এসে গেছে'—এখানে 'লালপাগড়ি'-র অভিধার্থ নিলে চলবে না। 'বিঘ্নের জাহাজ', 'রূপের হাট' ইত্যাদি প্রয়োগের অভিপ্রেত অর্থ এইসব শব্দের প্রসিদ্ধ আভিধানিক অর্থ নয়। নিজের প্রসিদ্ধ অর্থ পরিত্যাগ করে বাক্য বা শব্দবন্ধের অন্তর্ভুক্ত শব্দ যে-গুণে তৎসম্পর্কিত অন্য অর্থ প্রকাশ করে থাকে তার নাম 'লক্ষণা'। পণ্ডিতেরা বলেন যে, লক্ষণা ঠিক শব্দের গুণ নয়। ও এক রকম অনুমানশক্তি। যাই হোক্, অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণার মতো আরো এক গুণ আছে। তার নাম 'ব্যঞ্জনা'। ব্যঞ্জনার দ্বারা যে অর্থ পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ব্যঙ্গ্যার্থ। আলঙ্কারিক পণ্ডিতেরা পূর্বোক্ত স্ফোটবাদের প্রসঙ্গ থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে ক্রমশঃ ব্যঞ্জনা, ধ্বনি, ব্যঙ্গ্যার্থ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা সূচিত সেই অন্য বিশ্বাসের কথা বলেছেন। 'ব্যঙ্গ্যার্থ' মানে, দ্যোতিত অর্থ—তার নামান্তর হলো—'প্রতীয়মান অর্থ'। এখানে ধ্বনিবাদের এই ভূমিকার মধ্যে এই ক'টি জ্ঞাতব্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করা গেল।

অভিনব গুপ্ত তাঁর 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে লিখেছেন—

> **শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেনৈব ন বেদ্যতে।**
> **বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্।**
>
> —ধ্বন্যালোক ১।৭

অর্থাৎ কাব্যের আসল অর্থ শুধু শব্দার্থ-জ্ঞানের অধিগম্য নয়। যাঁরা কাব্যার্থতত্ত্ব জানেন, কেবল তাঁরাই তা জানতে পারেন।

কারণ, কাব্য তো শুধু বাচ্যার্থ নয়। শব্দ এবং শব্দের অর্থ জান্‌লেই কি কবিতার মর্মার্থবোধ সম্ভব হয়? শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ধ্বন্যালোকের এতৎসম্পর্কিত একাধিক বৃত্তির বঙ্গানুবাদ করে সেই সঙ্গে অতি সহজভাবে তাঁর নিজের মন্তব্য যোগ করে তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র এক জায়গায় লিখেছেন—

"কেবল বাচ্যবাচক লক্ষণের জ্ঞানলাভেই যারা শ্রম করেছে, কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত কাব্যতত্ত্বের অস্বাদনে বিমুখ, প্রকৃত কাব্যার্থ তাদের অগোচরে থাকে, যেমন গানের লক্ষণ মাত্র যারা জানে, তাদেরই সংগীতের সুর ও শ্রুতির অনুভূতি হয় না। অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা করে। আলঙ্কারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'।"

ধ্বন্যালোকে ধ্বনির পরিচয় দেওয়া হয়েছে বিস্তারিতভাবে। সেখান থেকে একটি শ্লোক এখানে আহৃত হলো—

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থম্ উপসর্জ্জনীকৃত-স্বার্থৌ
ব্যঙ্‌ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ।

—ঐ ১।১৩

অর্থাৎ, শব্দ ও শব্দার্থ যেখানে আত্মপ্রাধান্য পরিত্যাগ করে অর্থান্তরের দ্যোতনা করে, সেই ব্যঞ্জিত, দ্যোতিত বা প্রতীয়মান অর্থকেই বলা হয় 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'।

অতএব বিশেষভাবে একথা মনে রাখা দরকার যে, কোনো রচনায় শব্দার্থলব্ধ বাচ্যার্থের তুলনায় তদ্‌বাহিত ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য যদি না থাকে তাহলে সেখানে 'ধ্বনি'র অস্তিত্বের কথা কোনোমতেই ভাবা যাবে না। পূর্বোক্ত শ্লোকের বৃত্তিতে বলা হয়েছে—"ব্যঙ্গ প্রাধান্যে হি ধ্বনিঃ"। সমাসোক্তি প্রভৃতি অলঙ্কারে শব্দার্থের অতিশায়ী যে ব্যঞ্জনা পাওয়া যায়, তাকে 'ধ্বনি' বলা চল্‌বে না। যেখানে বাচ্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে বাচ্যের অনুগামী মাত্র সেখানে ধ্বনির কথা ওঠেনা। সমাসোক্তি, সংকরালঙ্কার ইত্যাদি ব্যাপারের বিশেষত্বের কথা ভেবে দেখা দরকার। সাধারণতঃ অচেতন বস্তুতে চেতন বস্তুর ব্যবহার আরোপ করবার ফলেই সমাসোক্তি হয়। সমাসোক্তি একরকম উপমা। সমাসে,—অর্থাৎ সংক্ষেপে উপমান ও উপমেয় দুইই ব্যক্ত হয় এই অলঙ্কারে। তাই এর নাম সমাসোক্তি। রবীন্দ্রনাথের 'মংপু পাহাড়ে' থেকে একটি দৃষ্টান্ত তুলে দেখা যেকে পারে—

"ঐ ঢালু গিরিমালা, রুক্ষ ও বন্ধ্যা,
দিন গেলে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা।"

এখানে সন্ধ্যা চেতনধর্ম লাভ করেছে। বাচ্যার্থের অতিরিক্ত আরো কিছু তৃপ্তি আছে এই কল্পনায়। রুক্ষ, নিষ্পাদপ পাহাড়ের গায়ে দিনের শেষে সন্ধ্যার আবির্ভাব হয়। চারিদিকের কঠোরতার ওপর তখন নেমে আসে তপস্বিনীর অপরূপ জ্যোতির্ময়া! সন্ধ্যার শান্ত স্তব্ধতা দেখে কবির মনে জেগেছে তপস্বিনীর শুচি, সুন্দর নিঃসঙ্গতার ধ্যান। কবিতার উদ্ধৃত অংশের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে—'দিন গেলে ওরি পরে জপ করে সন্ধ্যা'। "জপ করে", এই বাচ্যার্থ-লব্ধ আচরণের গণ্ডী পেরিয়ে ক্রমে এখানকার অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা অনুসারে সায়াহ্নের শান্তি, স্তব্ধতা, নিঃসঙ্গতা ইত্যাদি অনুমান করা গেল। সন্ধ্যার শ্রী এবং চারদিকের পার্বত্য প্রকৃতির বন্ধুরতা থেকে কবির মনে জেগেছে রূপোল্লাস। তবু, এখানে বাচ্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামী মাত্র। বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে বাচ্যের ইশারা বেশিদূর যায়নি। অতএব পারিভাষিক বিশেষ অর্থে যাকে 'ধ্বনি' বলা হয়, এখানে সেই 'ধ্বনি-'র প্রাধান্য নেই। সমাসোক্তির এই দৃষ্টান্তে অচেতনের ওপর চেতনের ব্যবহার আরোপ করা হয়েছে। তেমনি আবার চেতনের ওপরেও অচেতনের ব্যবহার আরোপিত হতে পারে। আবার, রূপকের সঙ্গে সমাসোক্তির পার্থক্য এই যে, রূপকে 'বিষয়' বা উপমেয়বস্তুর ওপর 'বিষয়ী' বা উপমানবস্তুর এমন ভাবে সংস্থাপন ঘটে থাকে, যাতে উপমান নিজের রূপে উপমেয়কে রূপায়িত করে উভয়ের অভেদত্বের ধারণা জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ রূপক হলো উপমানপ্রধান, অভেদপ্রধান অলঙ্কার। সমাসোক্তিতেও বিষয়ের ওপর বিষয়ীর আরোপ ঘটে থাকে, অর্থাৎ, সেও উপমানপ্রধান অলঙ্কার, কিন্তু সেক্ষেত্রে বিষয়ের ওপর বিষয়ীর ব্যবহারমাত্র আরোপিত হয়। সেই ব্যবহার থেকেই বিষয়ীকে বোঝা যায়। ওপরের দৃষ্টান্তে 'জপ করে' এই আচরণ থেকেই যিনি জপ করেন, সেই অনুচ্চারিতনাম্নী তপস্বিনীর ধারণা মনে আসছে। তপস্বিনী উপমান, সন্ধ্যা উপমেয়। সন্ধ্যা বিষয়, তপস্বিনী বিষয়ী। উপমেয় সন্ধ্যার ওপর উপমান জপন্তী নারীর আরোপ ঘটার ফলে এখানে উভয়ের অভেদত্ব সূচিত হয়েছে। বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান হতে পারেনি। এইসূত্রে সেই আসল কথাটিই স্মরণীয়।

'ধ্বন্যালোকে' বলা হয়েছে—

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ
তদুপায়তয়া তদ্বদ্ অর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ॥ ১।৯

অর্থাৎ, দীপশিখার প্রতি যত্ন রেখে তবেই আলোকার্থী আলো পেতে পারেন, কারণ প্রদীপের শিখা-ই যে তার আলোকের উপায়। প্রথমে বাচ্যার্থের প্রতি যত্নবান হয়ে তবেই ব্যঙ্গ্যার্থের লক্ষ্যে পৌঁছোনো যায়—ব্যঙ্গ্যার্থের যিনি আদর করেন, বাচ্যার্থ টি তাঁকে যত্ন করে দেখতে হয়।

উক্তিবিশেষের শুধু শব্দার্থটুকু দেখলেই চলবেনা,—শব্দার্থ, বাক্যার্থ, প্রসঙ্গ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার একযোগে এবং মিলিতভাবে কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনির অভিমুখে ভাবুকের মনকে ভাবিত করে থাকে। এ বিষয়ে প্রাজ্ঞ আলোচক লিখেছেন—

> "Just as in the 'sphota' theory it is supposed that the words and propositions as a whole conjointly signify a particular meaning, so it is held by the upholders of 'dhvani', like Anandavardhana and Abhinava and others, that a whole situation, a context, the speakers, the words and their meanings, all may jointly co-operate to produce a suggestion. The consideration of the context and the situation is the most important condition of 'dhvani'."

অর্থাৎ স্ফোটবাদে যেমন স্বীকার করা হয় যে, শব্দাদির অন্তর্ভুক্ত বর্ণাদির অর্থাৎ সমস্ত উপাদানের সম্মিলিত উদ্যোগের ফলে বিশেষ-বিশেষ শব্দের যথাযথ অর্থবোধ সম্ভব হয়, আনন্দবর্ধন, অভিনব এবং অন্যান্য ধ্বনিবাদীরা তেমনি স্বীকার করেন যে, সমগ্র পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির বিশেষ পূর্বপ্রসঙ্গ, বিভিন্ন বক্তা, তাঁদের বিচিত্র পদ ও শব্দের সমাবেশ এবং সেই সবের অর্থ প্রভৃতি একযোগে, সম্মিলিতভাবে দ্যোতনা ঘটিয়ে তোলে। সুতরাং পরিস্থিতি এবং পরিস্থিতির পূর্বপ্রসঙ্গের বিবেচনা হলো ধ্বনিবিচারের একটি বড়ো কথা।

এই সতর্কবাণী প্রকাশ করে আলোচক এই পরিস্থিতি আর পূর্বপ্রসঙ্গের গুরুত্ব বোঝাবার জন্যে মহাভারতের একটি গল্প স্মরণ করেছেন। গল্পটি এই—এক শিশুর শব নিয়ে তার আত্মীয়স্বজন শ্মশানে এসেছেন। সেখানে

A History of Sanskrit Literature [Classical Period] Vol.-1., p.608 [Calcutta University].

বক্তৃতা শুরু করলো এক শিবা আর এক শকুন। প্রথম বক্তার কথা এই যে, অন্তত সন্ধ্যা পর্যন্ত শববাহকদের শোক করা উচিত। তাঁদের শোকে এবং অশ্রুতে অতিবাহিত হোক্ কিছুটা সময়। কে জানে, হয়তো শিশুটির জীবন ফিরে আসতে পারে! অতঃপর শকুনের বক্তৃতা। সেটি প্রধানতঃ প্রথম বক্তার প্রতিবাদ। শ্মশানে সমাগত মৃতদেহের পক্ষে কি কখনো পুনর্জীবন পাওয়া সম্ভব? অধিক বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। শববাহকেরা অতঃপর ফিরে যেতে পারেন।

বলা বাহুল্য, উভয় পক্ষেই সঙ্গত যুক্তি ছিল। কিন্তু কূটনীতিবিশারদের আসল অভিপ্রায় লুকোনো থাকে প্রকাশ্য সদুক্তির অন্তরালে। রাত হয়ে গেলে পরিত্যক্ত শবের ভোজে শকুনের কোনো ভাগ থাকবে না,—আবার দিনের অবসান ঘট্‌বার আগেই যদি শববাহকরা মৃতদেহ ফেলে রেখে চলে যায় তাহলে তার মালিকানা নিয়ে শৃগালকে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। মৃতদেহের প্রতি উভয় পক্ষেরই লোভ অতি তীব্র। তাদের নীতিবচনের গূঢ় উদ্দেশ্য নিহিত ছিল সেই লোভে। পরিস্থিতি ও পূর্বপ্রসঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করেই সাধু ব্যক্তি এই গল্পের মর্মার্থ বুঝতে পারেন। সাদা কথায় যা এখানে উচ্চারিত হয়েছে, তার অতিরিক্ত সেই আসল অর্থটি এইভাবে তলিয়ে দেখতে হবে।

ধ্বনিবাদীরা বলেন যে, কেবল বাচার্থ্যের অতিরিক্ত কিছু একটা অর্থ থাকাই যথেষ্ট নয়। দ্যোতিত অর্থটি বাচ্যার্থকে গৌণ করে দেওয়া চাই,—'ধ্বনি'-র সাক্ষাৎ তবেই পাওয়া যাবে। দ্যোতিত অর্থ যেখানে দুর্বল মনে হয়, সেইসব ক্ষেত্রেই তার নাম দেওয়া হয় 'গুণীভূত ব্যঙ্গ্য'। ব্যঙ্গার্থ যেখানে মুখ্য না হয়ে গুণীভূত বা গৌণ হয়, সেখানেই বিচারকেরা এই 'গুণীভূত ব্যঙ্গ্য' নামটি ব্যবহার করে থাকেন।

উক্তিবিশেষের সাহায্যে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে রসিকের মন কতোদূর যাবার সুযোগ বা উৎসাহ পাচ্ছে সেইটিই শান্তভাবে ভেবে দেখতে হবে। কাব্যের 'ধ্বনি' আর সমাসোক্তির 'ব্যঞ্জনা' এই দুই ব্যাপারই মূলে সেই মনের দূরগামিতা সূচনা করে। দুয়ের পার্থক্য হলো আপেক্ষিক। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত পাশাপাশি দুটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিষয়টি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। কালিদাসের বর্ণনায় দেখা যাচ্ছে—

"কর্পূর ইব দগ্ধোহপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোহস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈকুসুমধন্বনে॥"

মদনের দেহ ভস্ম হলেও দগ্ধ কর্পূরের মতো সেই দেহাবশেষ প্রতিজনকে মদনের গুণ জানাচ্ছে, সেই অবার্যবীর্য পুষ্পধনু মদনকে নমস্কার। অভিনব গুপ্ত [১।১৩] বলেছেন যে, এতে শুধু কর্পূরের স্বভাবের সঙ্গে মদনের স্বভাবের তুলনা পাওয়া যাচ্ছে,—তার বেশি কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পরে' কবিতা থেকে অতুলচন্দ্র একটি দৃষ্টান্ত তুলেছেন এর পরে—

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একী সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।"

এবং অতুলচন্দ্র বলেছেন যে, কালিদাসের পূর্বোক্ত কথাই রবীন্দ্রনাথের এ কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে। তাঁর নিজের কথা—"অভিনব গুপ্ত নিশ্চয় বলতেন, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানব-মনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে। এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনব গুপ্ত অবশ্য ঠিক এ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ঐ একই কথা তিনি তাঁর আলঙ্কারিকের ভাষায় বলতেন যে, এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে এর 'করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনি'।"

ধ্বনিকার অতঃপর ধ্বনির দুই পৃথক শ্রেণীর কথা বলেছেন—[১] অবিবক্ষিতবাচ্য, এবং [২] বিবক্ষিতান্য-পরবাচ্য।

যেখানে বাচ্যার্থ মোটেই অভিপ্রেত নয়,—প্রতীয়মান অর্থই যেখানে উদ্দিষ্ট, সেখানে ধ্বনি হবে 'অ-বিবক্ষিত বাচ্য'; আর, বাচ্যার্থ বিবক্ষিত বা অভিপ্রেত হয়েও যেখানে অন্য অর্থের পাধান্য সূচিত হয়, সেখানেই পাওয়া যায় 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি'। অতঃপর আরো সব উপশাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সে আলোচনা এখন থাক্।

বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য ঘটেছে, এমন কয়েকটি দৃষ্টান্ত এইবার তুলে দেখা যাক্—

"অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।"

—'মহুয়ার দেশ' : সমর সেন

সমর সেনের একটি কবিতা থেকে উদ্ধৃত এই অংশে নগরসভ্যতার ধূসর পরিবেষ্টনীতে আবদ্ধ কবিপ্রাণের একরকম ব্যাকুলতার অভিব্যক্তি দেখা যাচ্ছে। এখানে দূর মহুয়ার দেশ সম্বন্ধে কয়েকটি উল্লেখ দেখে কবির মনে এই বিশেষ দৃশ্য স্মরণের সঙ্গে কিছু বেদনা যে জড়িত রয়েছে, সেকথা বোঝা যাচ্ছে। তবে, একে 'স্মরণোপমা' বা 'স্মরণ' অলঙ্কার বলা যাবে না। বিশ্বনাথ বলেছেন —'সদৃশানুভবাদ্বস্তুস্মৃতিঃ স্মরণমুচ্যতে'—সদৃশ অনুভব থেকে তৎসদৃশ অন্য বস্তুর স্মৃতি মনে জেগে উঠ্‌লে 'স্মরণোপমা' অলঙ্কার হয়। এখানে সদৃশ থেকে সদৃশের উদ্রেক ঘটেনি। নগর-জীবনের ক্লান্তি থেকে বিপরীত আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। কাব্যে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে, পাঠকের মনে তৎসদৃশ অন্য কোনো কাব্যের প্রসঙ্গ দেখা দিলে কাব্যস্মৃতি হয়েছে, বলা যায়। উদ্ধৃত অংশে সে রকমও কিছু নেই। এখানে বরং 'ভাবিক' অলঙ্কারের ভাব রয়েছে কতকটা। ইংরেজিতে এ অলঙ্কারের নাম vision। 'মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ' অনেক দূরের দেশ! তবু দূর থেকেই কবি তা অন্তরে দেখ্‌ছেন, মনে হয়। সেখানে সমস্তক্ষণ পথের দু'ধারে রহস্যময় দেবদারুর ছায়া,—রাত্রে দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস ;—নির্জন নিঃসঙ্গতা তাতে আলোড়িত হয়! কবি যেন অনুপস্থিত দৃশ্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। অতএব 'ভাবিক' অলঙ্কার বল্‌তে যদিই-বা আপত্তি হয়, vision বল্‌তে বাধা নেই। কিন্তু এই বর্ণনার বাচ্যার্থটুকুই এ কবিতার সর্বস্ব নয়। কবি যখন বল্‌লেন—

"আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক্ মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।"

—তখন তাঁর কথা বাচ্যকে ছাড়িয়ে সমকালীন পৃথিবীর বহুভার-

পীড়িত মানুষের আর্তির ব্যাকুলতাকেই প্রকাশ করলো। আপাতদৃষ্টিতে যাঁরা সুখী, এ যুগের সেই সব মানুষদেরও এ-কবিতা পড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌তে হবে। এইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনব গুপ্তের আলংকারিক পরিভাষা অনুসারেই এখানে সর্বজনীন এবং নির্বিশেষ এক অপূর্ব 'ধ্বনি'-র সাক্ষাৎ যে পাওয়া গেল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে, একালের বাংলা কবিতা থেকে ধ্বনির এই দৃষ্টান্ত তুল্‌তে কিছু সংকোচের হেতু আছে। কারণ, প্রাচীন সাহিত্যব্যাখ্যাতাদের মতামত এবং দৃষ্টান্ত দুইই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। বাংলায় এবং ইংরেজীতে যাঁরা সেইসব পুরোনো কথার পুনরালোচনা করেছেন, যে কারণেই হোক্ তাঁরাও রবীন্দ্রযুগের তরুণতর কবিদের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত তুলতে সংকোচ বোধ করেছেন। পূর্বসূরীদের সে প্রকৃতির কথা স্মরণ করে এবিষয়ে সতর্ক হওয়াই বিধেয়। কিন্তু অহেতুক সংকোচের বাড়াবাড়িও পরিত্যাজ্য। আর একথাও নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, আধুনিক বাংলা কবিতার সর্বত্র উঁচুদরের 'ধ্বনি'-র সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে বল্‌লে সত্যের অপলাপ হবে। যাই হোক্, আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক্—

"সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন,
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

—'বনলতা সেন' : জীবনানন্দ দাশ

এখানেও বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে আরো দূর, আরো বিচিত্র অনুভূতির ব্যাপ্তি সূচিত হয়েছে। একই সঙ্গে বনলতা সেন নামটিকে, আর, দিনাবসানের বর্ণ-স্পর্শ-স্মৃতিকে ঘিরে সামাজিকের হৃদয়ে যে ভাবস্পন্দন চল্‌তে থাকে, সে তো কেবল শিশিরের শব্দের সঙ্গে সন্ধ্যা-সমাগমের সাদৃশ্য-চিন্তার মৌলিকতায়, বা চিলের ডানাতে রৌদ্রের গন্ধ কল্পনার বিশেষত্বে, বা জোনাকির রঙে ঝিলিমিল্ পাণ্ডুলিপির রূপচিন্তাতে—অর্থাৎ বাচ্যার্থেই পরিসমাপ্ত নয়। এই কবিতা আমাদের সবার মনে যেন ঘরে ফের্‌বার বাসনা জাগিয়ে তোলে। সেইখানেই এর কাব্যত্ব। সেইখানেই 'ধ্বনি'।

ধ্বনির দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে 'কুমারসম্ভবে'র পার্বতীর প্রসিদ্ধ ছবিটি অনেকেই স্মরণ করেছেন—

এবং বাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী ॥

কারণ, এর বাচ্যার্থ হলো লীলাকমলের পত্রগণনা কিন্তু এর কাব্যত্ব আছে পূর্বরাগের লজ্জার ব্যঞ্জনায়। এবং ভিন্ন মনোভাবের পরিচায়ক হলেও অনুরূপ কারণেই রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' থেকে উদ্ধৃত এই অংশটিতেও ধ্বনি আছে বলতে হবে—

"সূর্যদেব, তোমার বামে এই সন্ধ্যা, তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, এদের তুমি মিলিয়ে দাও। এর ছায়া ওর আলোটিকে একবার কোলে তুলে নিয়ে চুম্বন করুক, এর পূরবী ওর বিভাসকে আশীর্বাদ করে চলে যাক্।"

বাচ্যার্থ পার হয়ে যাবার নিঃসংশয় উৎসাহ আছে এইসব কথার মধ্যে।

ধ্বনি থেকে রস

ধ্বনিবাদীরা বস্তুধ্বনি, অলংকারধ্বনি এবং রসধ্বনি, এই তিনরকম ধ্বনির কথা বলেছেন। বাচ্যার্থ থেকে যেখানে বস্তু-ব্যঞ্জনা হয় সেখানে বস্তুধ্বনি, আর, যেখানে অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা, সেখানে অলঙ্কারধ্বনি হয়ে থাকে। রসধ্বনির কথা পরে প্রকাশ্য। এ ছাড়া ধ্বনির আরো দুরকম ভেদবিচারের কথা এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—'অবিবক্ষিত বাচ্য' এবং 'বিবক্ষিতান্যপর-বাচ্য'। প্রথমটির দুই শাখা—'অর্থান্তর সংক্রমিত' এবং 'অত্যন্ত তিরস্কৃত'। শেষেরটিরও দুই শাখা 'অসংলক্ষ্যক্রম' ও 'সংলক্ষ্যক্রম'। এইসব শাখা-প্রশাখার ভেদ-বিভেদের তত্ত্ব চিত্তাকর্ষক বটে, তবে সেসব কথার বিস্তার ব্যতিরেকেও মূলকথাটি বুঝতে অসুবিধা হবে না। অন্যান্য প্রশাখার কথা স্থগিত রেখে এখানে কেবল বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি ও রসধ্বনি, এই তিনটি শ্রেণীর কথা বিবেচ্য।

বাচ্যার্থ থেকে যেখানে বস্তুবিশেষের ব্যঞ্জনা ঘটে, সেখানে হয় বস্তুধ্বনি, যেখানে অলঙ্কার-বিশেষের ব্যঞ্জনা হয় সেখানে অলঙ্কারধ্বনি। বর্ণনীয় এক সামগ্রী থেকে অন্য প্রসঙ্গের ব্যঞ্জনাই বস্তুধ্বনির মূলকথা। ডক্টর সুধীর কুমার দাশগুপ্ত বাংলা কবিতা থেকে একাধিক বস্তুধ্বনির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। মেঘনাদবধ-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে রামচন্দ্রের বিলাপোক্তির মধ্যে যখন লক্ষ্মণের উদ্দেশে তাঁকে বলতে শোনা যায়—

"নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।
বৃথা, হে জলধি! আমি বাঁধিনু তোমারে;
অসংখ্য রাক্ষস-গ্রাম বাঁধিনু সংগ্রামে;
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে
সসৈন্য; শোণিত-স্রোতঃ হায়, অকারণে,
বরিষার জলসম, আর্দ্রিল মহীরে।

* * * *

লক্ষ্মণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে
এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা।"

—তখন, বাচ্যার্থের এই বিলাপ থেকে মনে জেগে ওঠে লক্ষ্মণের সম্বন্ধে রামচন্দ্রের আশঙ্কার কথা। বীর মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী! এই যে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরের ব্যঞ্জনা, এরই নাম বস্তুধ্বনি।

বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কারধ্বনি দুয়েরই 'সংলক্ষ্যক্রম'; অর্থাৎ এইসব ক্ষেত্রে ধীরে-ধীরে, ক্রমে-ক্রমে শব্দ এবং অর্থের অনুরণন থেকে অভীষ্ট ব্যঞ্জনাতে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। কিন্তু রসধ্বনির কথা পৃথক। শব্দ, অর্থ, ব্যঞ্জনা সবই নিমজ্জিত হয় রসে। রস স্বানুভববেদ্য, আস্বাদস্বরূপ,—ভাষায় অপ্রকাশ্য। তবু, বস্তুধ্বনি এবং অলঙ্কারধ্বনির সঙ্গে রসধ্বনির নাম করা হয়েছে—কারণ, পণ্ডিতরা সে ক্ষেত্রেও শব্দ-অর্থ-প্রসঙ্গের একরকম ক্রম-বাহিতা বা অনুরণন লক্ষ্য করেছেন। তবে সে পারম্পর্য রসিকের চৈতন্যে গিয়ে বস্তু বা অলঙ্কারের ক্রমাবস্থানের বোধ জাগায় না, সবই যেন যুগপৎ স্ফূরিত হয়ে ওঠে। শব্দের অভিধা থেকে লক্ষণা বা ব্যঞ্জনাতে যেতে কিছু-না-কিছু সময় লাগে। কিন্তু রস যেন সব নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ফুটে ওঠা। তাই ব্যঞ্জনাবৃত্তির অতিরিক্ত 'রসনাবৃত্তি' নামে আর এক শক্তির কথা কেউ কেউ বলেছেন। ব্যঞ্জনা উপভোগ করছি, এরকম বোধেরও অতীত এই 'রস'! রসধ্বনির মধ্যে এই লক্ষণটিই চূড়ান্ত।

অলঙ্কারধ্বনির দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হলো—

"মাটি মাগে ভাই হলের আঘাত
সাগর মাগিছে হাল,
পাতালপুরীর বন্দিনী ধাতু
মানুষের লাগি কাঁদিয়া কাটায় কাল,
দুরন্ত নদী সেতুবন্ধনে বাঁধা যে পড়িতে চায়
নেহারি আলসে নিখিল মাধুরী
সময় নাই যে হায়।"

—'আমি কবি যত কামারের' : প্রেমেন্দ্র মিত্র

প্রেমেন্দ্র মিত্রের তরুণ বয়সের এই আত্মস্বীকৃতির মধ্যে মাটি, সাগর, ধাতু, এবং নদী এই চার অচেতন পদার্থে চেতনধর্ম আরোপিত হবার ফলে যে অলঙ্কারের উদ্ভব ঘটেছে, সেই অলঙ্কারের স্বাদটুকুই এই কাব্যাংশের

মুখ্য চমৎকৃতি। এখানে ক্রমানুসারে, একটির পরে একটি,—ভিন্ন-ভিন্ন শব্দের বাচ্যার্থ থেকে অলঙ্কারের ব্যঞ্জনা অবধিই পাঠকের কল্পনার বিলাস্। তার বাইরে আর বেশি দূরে যাবার রসদ নেই এ উক্তির মধ্যে।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ কাব্য যেন আরো দূরে যেতে চায়। কাব্যের লক্ষ্য রস। শব্দ, বাচ্যার্থ, পদরচনার ভঙ্গি বা রীতি, কাব্যের প্রসঙ্গ, কবিতার ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার হলো সেই রসলোকে পৌঁছোবার আয়োজন। অতএব অলঙ্কার, শব্দ, ছন্দ ইত্যাদি সবই হলো রসের উপায়।

'ধ্বন্যালোকে' বলা হয়েছে—

রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারাণি কানিচিৎ
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্ত্যন্তে মহাকবেঃ।

—২।১৭ বৃত্তি

অর্থাৎ, মহাকবির এক প্রযত্নেই কাব্যের রস এবং অলঙ্কার দুই-ই সার্থক হয়।

এই 'অপৃথগ্‌যত্ন'-ব্যাপার কবিদের সাধারণ সজ্ঞান মনের কাজ নয়। দেশে-দেশে কাব্যরসিক কবিদের এই পরম সামর্থ্যের কথা পণ্ডিতসমাজ স্বীকার করেছেন। এ সামর্থ্য যে গভীর অন্তর্জীবনের সামগ্রী, তাও বলা হয়েছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত ইংরেজ কবি বার্ডসার্থের 'emotion recollected in tranquillity'-তত্ত্বটি স্মরণ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থে কাব্যরহস্য সম্পর্কে ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচের উক্তির ইংরেজি অনুবাদও করেছেন—"...poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself whatever may be his efforts."। এই অনুবাদে 'idealization' শব্দটির একটি গূঢ় ইঙ্গিত আছে। কাব্য প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যাসূত্রে অতুলচন্দ্র সংক্ষেপে বলেছেন যে,

"কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।" তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যে—

> "আজকের দিনের লিরিক কাব্যের যুগে, যখন কবির নিজের মনের ভাবই কাব্যের উপাদান, তখন এ ভ্রম সহজেই হয় যে, কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই বুঝি কাব্যের লক্ষ্য। এবং যে কবির হৃদয়ের ভাব যত তীব্র ও যত আবেগময়, তাঁর কাব্যরচনাও তত সার্থক। কিন্তু লিরিক কিছু আলংকারিকদের কাব্যবিশ্লেষণের বাইরে নয়। ভাব যদি না কবির মনে রসের মূর্তি পরিগ্রহ করে, তবে কবি কখনও তাকে সে বিভাব ও অনুভাবে প্রকাশ করতে পারেন না, যা পাঠকের মনেও সেই রসের রূপ ফুটিয়ে তোলে।"

অর্থাৎ, কাব্যের লক্ষ্য রস, একথা মেনে নেবার পরে রসের স্বরূপ সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন—'তোমার পুত্র জন্মেছে, এই কথা শুনে পিতার যে হর্ষ, তা রস নয়।'—[অতুলচন্দ্রের অনুবাদ : 'কাব্যজিজ্ঞাসা' পৃঃ ২৬]। Aristotle-এর কাব্যতত্ত্বব্যাখ্যানের মধ্যেও অনুরূপ কথা আছে। "Poetry is more philosophical than history, and it has a greater value as truth, we may regard it as coming between philosophy and history ; the first deals with general principles, the second with individual facts. Poetry works out the principles in facts."[১]

১। Aristotle on the Art of Poetry : A.S.Owen [Oxford 1931] p.21.

ঔচিত্য ও বক্রোক্তি

রসবোধের পরে আর রসজিজ্ঞাসার অবকাশ নেই। তবে, রসতত্ত্বের আলোচনা যতই সংক্ষেপে সারা যাক্, 'ঔচিত্য' কথাটি একবার অন্তত: উল্লেখ না করে উপায়ান্তর নেই। আনন্দবর্ধনের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

অনৌচিত্যাদৃতে নান্যৎ রসভঙ্গস্য কারণম্
প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা॥

—ধ্বন্যালোক

অর্থাৎ, অনৌচিত্যের চেয়ে রসভঙ্গের আর কোনো বড় কারণ নেই।

ঔচিত্য সম্পর্কে ক্ষেমেন্দ্রের আলোচনা প্রসিদ্ধ। তিনি একাদশ শতকের লোক। 'ঔচিত্যবিচারচর্চা' এবং 'কবিকণ্ঠাভরণ' নামে তাঁর দুখানি গ্রন্থের কথা স্মরণীয়। ভরতের নাট্যসূত্রে অনুভাবের যথোচিত প্রয়োগ সম্পর্কে নির্দেশ আছে। মহিম ভট্ট প্রভৃতি বহু আলোচক ঔচিত্যের কথা বলেছেন। ধ্বনিবাদীরা এ বিষয়ে লিখে গেছেন। সকলের চেয়ে বেশি বলেছেন ক্ষেমেন্দ্র। তাঁর কথা হলো—ঔচিত্যই রসের প্রাণ। যে চমৎকারিত্ববোধে রসের ভিত্তি, ঔচিত্য সেই বোধের সঙ্গে জড়িত।

রসানুকূল পদের প্রয়োগ বোঝাবার জন্যে তিনি 'অলঙ্কারৌচিত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন,—রসানুকূল বাক্য বিন্যাসের নাম 'গুণৌচিত্য'। ঔচিত্যের বিচিত্র বিভাগের দীর্ঘ তালিকা আছে তাঁর আলোচনায়। বলা বাহুল্য, 'ঔচিত্য' ব্যাপারটি বিশেষ মনোযোগের যোগ্য। কিন্তু ঔচিত্য সম্বন্ধে বাইরে থেকে কোনোরকম নির্দেশ দেওয়া সত্যিই নিরর্থক। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে এ আলোচনা 'কবিশিক্ষা'র অন্তর্ভুক্ত। কবিকে শিক্ষা দেওয়া এবং সেই শিক্ষার ফলে সুকাব্যের সম্ভাবনা প্রত্যাশা করা শিক্ষকের ধর্ম। শিক্ষক নিজে যদি কবি হন তাহলে এ প্রয়াস সার্থক হতে পারে। অবশ্য, সমালোচকের পক্ষে ঔচিত্যের তালিকা জেনে রাখা সংগত। শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার ইত্যাদি সামগ্রী রসানুকূল না হলেই অনৌচিত্য ঘটেছে, বলতে হবে। ঔচিত্যের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো propriety। যেখানে কাব্য সার্থক, সেখানে অনৌচিত্যের কথা ওঠেনা।

সংস্কৃতে যাকে বলে, 'চিত্রকাব্য' সে হলো সত্যিকার কাব্যের নকল। ও শব্দটি আনন্দবর্ধনের দেওয়া। বলা বাহুল্য, অনৌচিত্য-অপরাধের ও একটি শিষ্ট, কিন্তু তীব্র তিরস্কারবচন। 'ধ্বন্যালোক' থেকে অনুবাদ করে অতুলচন্দ্র লিখেছেন—"রসতৎপরতাশূন্য বিশৃঙ্খলবাক্ লেখকদের কাব্যরচনার প্রবৃত্তি দেখে তিনি 'চিত্রকাব্য' নামটির পরিকল্পনা করেছেন।"

কোনো কাব্য রসোত্তীর্ণ হলো কিনা, সে বিচার রসিকের সাধ্য। বাইরে থেকে শুধু তথ্যজ্ঞানের সূত্র ধরে, কবিতার কোনো বিশেষ উপাদান বা সব উপাদান স্পর্শমাত্র করে কবিতা বিচারের চেষ্টা সমালোচকের পক্ষে একরকম অনৌচিত্যেরই নিদর্শন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"প্রজাপতি বসে আছে যে কাব্যপুঁথির পরে
স্পর্শ তারে করে,
চক্ষে দেখে তারে
তার বেশি সত্য যাহা একেবারে
তার কাছে সত্য নয়,
অন্ধকারময়।
ও জানে কাহারে বলে মধু, তবু
মধুর কী সে রহস্য জানে না ও কভু।"

কাব্যের মধুতত্ত্বের মধ্যেই যথার্থ ঔচিত্যের আশ্রয়। অর্থাৎ অভিপ্রেত রসের যা বিঘ্ন, কাব্যশরীরের সেইসব ব্যাপারই হলো 'অনৌচিত্য'।

ঔচিত্য শব্দটির মানে বোঝাতে গিয়ে শাস্ত্রকার বলেছিলেন—"যৎ কিল যস্য অনুরূপম্ তদুচিতমুচ্যতে। তস্য ভাবমনুরূপম"। অর্থাৎ, যার সঙ্গে যা মানায়, তাকেই বলা হয় উচিত। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা কাব্যের অন্যতম প্রধান গুণ হিসেবে 'ঔচিত্যের' মর্যাদা স্বীকার করেছেন। ক্ষেমেন্দ্র যেমন ঔচিত্যকে রসের প্রাণ বলে মেনেছিলেন, অভিনব গুপ্তের সমকালীন কুন্তক তেমনি 'বক্রোক্তি'কেই কাব্যের সার বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। পরবর্তী লেখকদের মধ্যে এই বক্রোক্তিবাদের প্রতিবাদের উৎসাহ দেখা গেছে। তাঁরা 'ধ্বনিবাদ' আর 'বক্রোক্তিবাদ', এই দুটিকে বিরুদ্ধ মতবাদ মনে করে আলোচনা করে গেছেন। সোমেশ্বর, মাণিক্যচন্দ্র প্রভৃতি লেখকের নাম করা হয় এই প্রতিবাদকারী দলের মধ্যে।

কুন্তক ঔচিত্যকে বক্রোক্তির পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় উপাদান মনে করেছিলেন। যাঁরা 'ধ্বনি'কে বক্রোক্তির তুলনায় বড়ো মনে করেছেন, তাঁদের কথা খণ্ডন করে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত দেখিয়েছেন যে, 'বক্রোক্তি'বাদীর মতে 'ধ্বনি'বাদ পরিত্যাগ করা হয়নি, তা ওতেই নিহিত আছে।

কয়েকটি কারিকা এবং বৃত্তির সমবায়ে, চার অধ্যায়ে সমাপ্ত কুন্তকের 'বক্রোক্তিজীবিত' বইখানির মধ্যেই বক্রোক্তির বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অলঙ্কার-শাস্ত্রকাররা কাব্যের চমৎকারিত্বের কোনো কারণ নির্ণয় করতে পারেন নি, এই কথা বলে, যথার্থ কাব্যে শব্দ ও অর্থের অপরিহার্য সমন্বয়-ভিত্তিকেই কুন্তক তাঁর 'বক্রোক্তি'বাদের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। শুধু শব্দের জোরে কাব্য হয়না,' আবার নিছক অর্থের গুরুত্বেও কাব্য হয়না। শব্দ এবং অর্থ, উভয়ের পারস্পরিক সহায়তা ছাড়া সার্থক কাব্যের সৃষ্টি সম্ভব নয়। সুরেন্দ্রনাথ এই 'শব্দার্থসাহিত্যে'র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উভয়ের তুল্যযোগিতার কথা বলেছেন। ভাষার উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে ভাষার নিহিত অর্থের সামঞ্জস্য ঘটা চাই। অধ্যাপক দাশগুপ্ত লিখেছেন—

> "এস্থলে কুন্তক সমগ্রতার সামঞ্জস্যই যে আর্টের প্রাণ, তাহা অতি সুন্দর ভাবে ধরিয়াছেন।...ইংরেজিতে বলিতে গেলে এই সাহিত্য [পূর্বোক্ত 'শব্দার্থসাহিত্য'] শব্দকে আমরা 'unity of expression and language' বলিতে পারি।"

তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে, কুন্তকের এই 'সাহিত্যবাদ' আর য়ুরোপের Expressionism এক জিনিস নয়। যেসব শব্দের মধ্য দিয়ে কবির মনোভাব যথাযথভাবে বাহিত হয়, সেইগুলিই হলো 'উচিত' শব্দ। এই রকম ঔচিত্যের ওপরেই কাব্যের সার্থকতা নির্ভর করে।

বাইরের জগৎ যখন কবির সৃজনী চৈতন্যের গোচর হয়, তখন মনোলোকে সে আর বহির্জগতের যথাযথ নকলমাত্র থাকেনা। সে জগৎ এক আবেগময় ভাবজগৎ হয়ে ওঠে। সেই ভাবজগৎ তার যথাযথ শব্দরূপ পরিগ্রহণের ফলে শব্দার্থসাহিত্যময় কাব্য হয়ে দেখা দেয়।

শব্দ ও অর্থের এই রকম সমন্বয়সঞ্জাত কাব্য-গুণের নাম বক্রতা। সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"The word literally means arch speech"। অন্যত্র তিনি কুন্তকের এই বক্রোক্তি-ধারণাকে আবার পৃথক শব্দ ব্যবহারের সাহায্যে বলেছেন 'aesthetic quality'।[1]

১। বর্তমান গ্রন্থের ৩৩-৩৪

রসাভাস

'সাহিত্যদর্পণে' বলা হয়েছে—

অনৌচিত্য প্রবৃত্তত্ব আভাসো রসভাবয়োঃ।

রস অথবা ভাব যখন ঔচিত্য লঙ্ঘন করে, তখন যথাক্রমে রসাভাস অথবা ভাবাভাস হয়। অর্থাৎ অনৌচিত্যের ফলে রসত্ব বা ভাবত্ব সেসব ক্ষেত্রে সম্যক স্ফূর্তিলাভ করে না। অনৌচিত্য যে অনেক রকম হতে পারে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। শাস্ত্রকাররা ভাব ও রসের অনৌচিত্যের দিগ্‌দর্শন হিসেবে কতক-কতক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। 'সাহিত্যদর্পণে' এই সূত্রে বলা হয়েছে যে—

> **শৃঙ্গারে**—নায়ক নায়িকার প্রতি আসক্ত না হয়ে উপনায়িকার প্রতি আসক্ত হলে কিংবা বিপরীত ক্ষেত্রে নায়িকা উপনায়কের প্রতি আসক্ত হলে,—কিংবা মুনি, গুরুপত্নী প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ জন্মালে এবং আরো কোনো-কোনো ক্ষেত্রে রসাভাস ঘটে থাকে।
>
> **রৌদ্রে**—মাতা পিতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ক্রোধ জন্মালেও রসাভাস ঘটেছে বলতে হবে।
>
> **হাস্যে**—গুরুজন প্রভৃতিকে হাসির বিষয় হিসেবে স্থির করলেও রসাভাস ঘটবে।
>
> **বীরে**—ব্রহ্মবধের উৎসাহ হলে কিংবা রস নীচ পাত্রে স্থাপিত হলেও রসাভাসের দৃষ্টান্ত ঘটে থাকে।

কাব্যশরীরের বিভিন্ন উপাদানের অনৌচিত্যের মতো রসের অনৌচিত্যও এইভাবে বিবৃত হয়েছে। কাব্যের ভেতরের সংগতি এবং বাইরের সংগতি দুই-ই দরকার। 'ধ্বন্যালোকে' বিভাব, অলঙ্কার ইত্যাদির ঔচিত্য রক্ষা, এবং রসবিরোধ পরিহার করবার দায়িত্ব গ্রহণ করা, এই দুই বিষয়েই স্রষ্টাকে সতর্ক করা হয়েছে। বামনের আমলে পদ-পদার্থ-বাক্য-বাক্যার্থগত দোষের কথা

বলা হয়েছিল। পরের যুগে ক্ষেমেন্দ্র তাঁর 'ঔচিত্যবিচারচর্চায়' এসব বিষয়ের বিশদ আলোচনা করলেন। মহিমভট্ট প্রধানতঃ শব্দের অনৌচিত্য এবং অর্থের অনৌচিত্য এই দুই বিভাগের বিশ্লেষণ করে 'বহিরঙ্গ অনৌচিত্য' আর, 'অন্তরঙ্গ অনৌচিত্যে'র কথা লিখেছেন।

যাই হোক্ 'রসাভাস' যে রসসৃষ্টি প্রক্রিয়ার অনৌচিত্যমূলক দোষ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শাস্ত্রকার বলেছেন যে, 'হেত্বাভাস' যেমন হেতু নয়, হেতুর আভাস বা বৃথাবোধ মাত্র, রসাভাস ঠিক সেরকম নয়। রসাভাসের ব্যাখ্যানসূত্রে সুশীলকুমার লিখেছেন—

> "...'rasabhasa' or semblance of 'rasa' and the analogous 'bhavabhasa'...occur when the poetic sentiments and emotions are falsely attributed".[১]

বিশ্বনাথের সাহিত্যদর্পণে 'রসাভাস' সম্বন্ধে সেই কথাই বলা হয়েছে।

১। Studies in the History of Sanskrit Poetics Vol.2.p.351.

অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা

অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের 'অলঙ্কারচন্দ্রিকা' [মাঘ, ১৩৫৩] ডবল-ক্রাউন ১৬ পৃষ্ঠা ফর্মার মাপে সর্বসমেত ১৩৭ পৃষ্ঠার ছোট একখানি বই। অলঙ্কারশাস্ত্রের বিষয়ে জ্ঞাতব্য বহু তথ্য পরিবেষণ করা হয়েছে এই বইটির মধ্যে। তিনি অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাস লেখেননি। ছাত্রসমাজের পরীক্ষার প্রশ্নমালায় অলঙ্কার সম্পর্কে যেসব প্রসঙ্গ সুপরিচিত এবং বহুল অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, অধ্যাপক চক্রবর্তী প্রধানতঃ সেই সব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিদ্যায়তনগুলির বাইরে যে বৃহত্তর বিদ্যার্থিসমাজ বাস করেন, অধ্যাপক চক্রবর্তী তাঁদের চাহিদাও বিস্মৃত হননি।

বাংলায় অলঙ্কারশাস্ত্র বহুশ্রুত, কিন্তু স্বল্পলিখিত বিদ্যা। লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়', শিতিকণ্ঠবাচস্পতির 'অলঙ্কার-দর্পণ', সুবলচন্দ্র মিত্রের বাংলা অভিধানে অলঙ্কারের আলোচনা, যদুগোপালের 'পদ্যপাঠ' [তৃতীয় ভাগ] এবং দীননাথ সান্যাল-সম্পাদিত 'মেঘনাদবধকাব্য'—এই ক'খানি বইয়ে অলঙ্কার সম্পর্কে যেসব কথা প্রচারিত হয়েছে, সে গুলির বিন্যাসক্রম অনেকটা একই রকম। এই সব লেখকের আলোচনার ভঙ্গিতে বিশেষ পার্থক্য নেই। আধুনিক কালে ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী এবং ডক্টর সুধীরকুমার দাশগুপ্ত যথাক্রমে 'কাব্যবিচার,' 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকা' এবং 'কাব্যশ্রী' লিখে পাঠকদের নবদৃষ্টির সহায়তা করেছেন। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বইখানি যদিও অপর দুখানি বইয়ের মতো অলঙ্কার সম্বন্ধে পূর্ণনিষ্ঠ নয়, তথাপি সেটিতেও অলঙ্কারশাস্ত্রের সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে, ব্যাকরণ এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করা হয়েছে, ধ্বনি এবং অলঙ্কারের ভেদ ঘোষণা ও ব্যাখ্যান করা হয়েছে এবং এই জাতীয় আরো কিছু আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

ডক্টর সুশীলকুমার দে বাংলায় অলঙ্কার সম্বন্ধে ইতস্ততঃ কিছু আলোচনা করেছেন। শ্রীযুক্ত নবেন্দু বসুও কিছু-কিছু লিখেছিলেন। সম্প্রতি অধ্যাপক জীবেন্দ্র সিংহরায়ও অলঙ্কার সম্বন্ধে বাংলায় একখানি বই লিখেছেন। প্রাচীন

আলোচকদের মধ্যে জয়গোপাল গোস্বামীর লেখা 'কাব্য-দর্পণ' বইখানি স্মরণীয়। ১২৮১ সালে তাঁর বইখানি এবং ইংরেজি ১৮৬২-তে লালমোহন বিদ্যানিধির বইখানি ছাপা হয়। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণে' এবং আরো কয়েকজন বাঙালী বৈয়াকরণের বাংলা ব্যাকরণে অলঙ্কার সম্পর্কে ছাত্রপাঠ্য তথ্যাবলী সরবরাহ করা হয়েছে। লালমোহন বিদ্যানিধির বই দীর্ঘকাল এই প্রদেশের প্রায় একমাত্র গ্রন্থের মর্যাদা উপভোগ করে বর্তমানে লুপ্তপ্রচল। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ E.B Cowell সাহেব এই বইটির 'বিজ্ঞাপনী'-অংশে লিখেছিলেন—

> "The following little work [কাব্যনির্ণয়] by Lal Mohon Bhattacharyya a student of Calcutta Sanskrit College, is an attempt to give in Bengali a succinct account of the Hindu Rhetoric with appropriate illustrations. The earliest extant work on this subject by Sri Dandin was nearly 1200 years ago, and the peculiar style patronised in Bengal had even then given its name to one of the 'ritis' therein discussed, and surely if the 'Gauri Riti' (গৌড়ী রীতি) was current so long ago it is high time that the intelligent study of Rhetoric should revive in the renascent Bengal of our own time."

অলঙ্কারশাস্ত্রের ইতিহাসে অধুনাস্বীকৃত প্রাচীনতম গ্রন্থ হলো ভামহের 'কাব্যালঙ্কার'। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতকে যদি এ বইখানি লেখা হয়ে থাকে, তাহলে, তার পূর্ববর্তী 'অগ্নিপুরাণ' এই শাস্ত্রের আদি-গ্রন্থ বলে স্বীকৃত হতে পারে। 'কাব্যাদর্শের' লেখক দণ্ডী ছিলেন ভামহের পরবর্তী লোক। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'কাব্যবিচার' বইখানিতে 'শাস্ত্রধারা' নামে যে অধ্যায় যোজনা করেছেন, তাতে তিনি বলেছেন যে, সংস্কৃত ভাষায় খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বে বোধ হয় গ্রন্থাকারে কোনো অলঙ্কারশাস্ত্র লেখা হয়নি। নবম-দশম শতকের 'কাব্যমীমাংসা'-লেখক রাজশেখর 'সহস্রাক্ষ', 'উক্তি-গর্ভ,' 'সুবর্ণনাভ,' 'চিত্রাঙ্গদ' প্রভৃতি যে সব ব্যক্তির নাম করেছেন, তাঁদের মধ্যে কারো-কারো নাম যদিও বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া

যায়, তথাপি তাঁদের সম্পর্কে একালের পাঠক-লেখক-সংগ্রাহকদের জ্ঞান অতি সামান্য। ভরতের 'নাট্যসূত্র' খ্রীষ্টজন্মের তিনশ' বছরের মধ্যে লেখা হয়েছিল বলে মনে হয়;—কোহল, নন্দীকেশ্বর প্রভৃতি আলোচকদের হস্তক্ষেপের ফলে 'নাট্যসূত্রের' মূল চেহারা উত্তরকালে বদলে গিয়েছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। ভামহ এবং কালিদাস উভয়েই ভরতের নাট্যসূত্রের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতকে অভিনব গুপ্ত 'নাট্যসূত্রের' যে টীকা রচনা করেন, তাতে তিনি লোল্লট, শঙ্কুক, ভট্টনায়ক, কীর্তিধর, উদ্ভট, রাহুল, ভট্টযন্ত্র প্রভৃতির নাম করেছেন। এসব নাম মাত্র। অভিনব গুপ্তের টীকা-ই বরং এ-রাজ্যের বহুশ্রুত আলোচনা। সেই প্রসিদ্ধ টীকার নাম 'অভিনবভারতী'।

উদ্ভট এবং বামন—অলঙ্কার বিষয়ের এই দুই লেখকই সম্ভবতঃ অষ্টম-নবম শতকে বর্তমান ছিলেন। আনন্দবর্ধন তাঁর বৃত্তিতে ভামহের নাম করেছেন। উদ্ভটালঙ্কারের টীকাকার প্রতীহারেন্দুরাজ লিখেছেন যে, উদ্ভট 'ভামহবিবরণ' নামে ভামহের অলঙ্কার সম্পর্কে এক টীকা লিখেছিলেন। বামনের লেখাতেও ভামহের আলোচনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের প্রমাণ আছে।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভামহের প্রাচীনত্ব এইভাবে ব্যাখ্যা করে ভামহের 'কাব্যালঙ্কারের' পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষের একটি শ্লোক তুলে দেখিয়েছেন যে—

> "যে সমস্ত অলঙ্কারের কথা তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আহরণ করিতে গিয়া তিনি অনেক প্রাচীন লেখকের নিকট ঋণী। কিন্তু তিনি নিজেও অনেক চিন্তা করিয়া তাহার মধ্যে নবীনতা বিধান করিয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে যে ভামহের পূর্বেও বহু আলঙ্কারিক অলঙ্কার লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন।"

ভট্টিকাব্যের জয়মঙ্গলা-টীকায় লেখা আছে যে, ঐ কাব্যের দশম সর্গটি ভামহকথিত অলঙ্কারের উদাহরণ দেবার উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল। ভট্টি-কাব্যের বাইশের সর্গে ভট্টি বলেছেন,—আমি পণ্ডিতদের ভালোবাসি,—পণ্ডিতসাধ্য ব্যাখ্যান ব্যতিরেকে আমার কাব্য মূর্খের বোধগম্য নয়। এই

উক্তিটির পাল্‌টা জবাব দিয়ে ভামহ লিখেছিলেন—শাস্ত্রের মতো কাব্যও যদি বিনা ব্যাখ্যানে বোধগম্য না হয়, তাহলে অবিশ্যি পণ্ডিতদেরই উৎসব,—দুর্মেধার নিশ্চিত মৃত্যু!

অধ্যাপক দাশগুপ্ত ভট্টি ও ভামহকে এইসব কারণে সমকালীন ব্যক্তি বলে মনে করেছেন। ভামহকে এই পর্যায়ের প্রাচীনতম আলোচক মনে করে দণ্ডীকে তাঁর পরবর্তী,—'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'র লেখক বামনকে, তাঁর সমসাময়িক উদ্ভটকে এবং 'ধ্বন্যালোক'-লেখক আনন্দবর্ধনকে নবম শতকের,—'কাব্যালঙ্কার'-লেখক রুদ্রটকে নবম-দশম শতকের,—'অভিনব-ভারতী' ও 'লোচনটীকা' লেখক অভিনব গুপ্তকে দশম-একাদশ শতকের,—'দশরূপকে'র লেখক ধনঞ্জয়কে দশম শতকের,—বক্রোক্তিবাদী কুন্তককে, 'কাব্যমীমাংসা'-লেখক রাজশেখরকে, 'ঔচিত্যবিচারচর্চা', 'কবিকণ্ঠাভরণ' ও 'কবিকর্ণিকা'-র গ্রন্থকার ক্ষেমেন্দ্রকে, 'সরস্বতীকণ্ঠাভরণ', 'শৃঙ্গার-প্রকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ভোজকে, এবং 'ব্যক্তিবিবেক'-রচয়িতা মহিমভট্টকে একাদশ শতকের,—'কাব্যপ্রকাশ'-লেখক মম্মটকে, 'কাব্যানুশাসন'-প্রণেতা হেমচন্দ্রকে, 'বাগ্‌ভটালঙ্কার'-লেখক বৃদ্ধ বাগ্‌ভটকে এবং 'অলঙ্কারসর্বস্ব'-রচয়িতা রুয্যককে দ্বাদশ শতকের লোক বলে স্থির করেছেন। তারপর ত্রয়োদশ শতক থেকে নরহরি সরস্বতীতীর্থ, জয়ন্তভট্ট, সোমেশ্বর, বাচস্পতি মিশ্র, বিশ্বনাথ [একাধিক] ভাস্কর, পরমানন্দ চক্রবর্তী, গোবিন্দঠক্কুর, কেশব মিশ্র, অপ্পয় দীক্ষিত, জগন্নাথ প্রভৃতি খ্যাতনামা বহু আলঙ্কারিকের উল্লেখ করা হয়েছে। জগন্নাথ সপ্তদশ শতকে জীবিত ছিলেন। তাঁর পরেও সংস্কৃতে এ-শাস্ত্রের নানা গ্রন্থ লেখা হয়েছে। উনিশের শতকে প্রসিদ্ধ বাঙালী আলঙ্কারিক চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার অলঙ্কারসূত্র লিখেছিলেন।

সুধীরকুমার 'কাব্যালোক' লেখবার পরে [কাব্যালোকের ভূমিকার তারিখ—২৪এ্‌ কার্তিক, ১৩৫৩] অলঙ্কারের বিষয়ে তাঁর 'কাব্যশ্রী' [প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৬, আষাঢ়] বইখানি লিখেছিলেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী ১৩৫৩ সালে তাঁর 'অলঙ্কার-চন্দ্রিকার' ভূমিকায় এবং আরো পরে সুধীরকুমার তাঁর 'কাব্যশ্রী'র ভূমিকায় তাঁদের গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি কারণ এই দিয়েছিলেন যে, আধুনিক কালের উপযোগী করে, বাংলা সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত

আহরণ করে যথার্থ বাংলা অলঙ্কারের বই লেখা আবশ্যক। সুধীরকুমার জানিয়েছেন—"অলঙ্কার শিক্ষা দেয় ভাবশুদ্ধি ও চিন্তাশুদ্ধি, রচনার শৃঙ্খলা, সরসতা, সরলতা, সবলতা, সার্থকতা বা আমোঘতা।" অলঙ্কার যে কাব্যের শ্রী, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের একটি কবিতার মধ্যে একথার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

"মন যে দরিদ্র
তার তর্কের নৈপুণ্য আছে
ধনৈশ্বর্য নাইক ভাষার।
কল্পনাভাণ্ডার হতে তাই করে ধার
বাক্য অলঙ্কার।
কখন হৃদয় হয়
সহসা উতলা
তখন সাজিয়ে বলা আসে অগত্যাই।"

কবিমনের এই উতলা অবস্থা থেকেই সার্থক অলঙ্কার জন্মগ্রহণ করে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটিতে কাব্যের অলঙ্কার সম্বন্ধে কথা উত্থাপন করে অবশেষে নারীর অলঙ্কারের কথা বলা হয়েছে। সুন্দরী নারীর প্রসঙ্গ এর আগেও অলঙ্কারবিদ্‌কে অলঙ্কার যুগিয়েছে। ভামহের কথা তুলে শ্যামাপদ চক্রবর্তী তাঁর বই শুরু করেছেন—"ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতা মুখম্"। অর্থাৎ কান্ত বা কমনীয় হলেও বনিতার মুখ বিনা অলঙ্কারে সুষমাময় হয়না।

অলঙ্কারের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Figure। কিন্তু পণ্ডিতরা বলেছেন যে, এ-দুটি শব্দের অর্থ ঠিক এক নয়। ইংরেজিতে Figure-এর সংজ্ঞা হলো "a deviation from the plain and ordinary way of speaking for the sake of greater effect."। আমাদের দেশে খ্রীষ্টাব্দের নবম শতকে রচিত 'ধ্বন্যালোক' গ্রন্থে বলা হয়েছে—

রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্য-ক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ন নির্বর্ত্যঃ সোঽলঙ্কারো ধ্বনৌ মতঃ॥"

—ধ্বন্যালোক, ২।১৭

অর্থাৎ, রসের দ্বারা আক্ষিপ্ত বা আকৃষ্ট এবং রসের সঙ্গে একই প্রযত্নে সিদ্ধ যে রচনা, তারই নাম অলঙ্কার।

কবির মনন, সংবেদন, অনুভূতি থেকেই ভালো অলঙ্কারের জন্ম হয়। অলঙ্কারের প্রধান দুটি ভাগের একটি হলো শব্দালঙ্কার, অন্যটি অর্থালঙ্কার। **উচ্চারিত ধ্বনির মধ্যে অনুভূতি সু-সঞ্চারিত হবার ফলে রচনা-বিশেষ যখন সামঞ্জস্যময় অনুরণনের দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে তখনই সেখানে শব্দালঙ্কার ঘটেছে বলতে হবে।** এইবার শব্দালঙ্কারের কয়েকটি নমুনা দেখা যাক্—

১। "গান তার গুন্ গুন্
মঞ্জীর রুন্ রুন্,
বোল তার ফিস্ ফিস্
চুল তার মিশ্ মিশ্।
সেই মোর বুলবুল,—
নাই তার পিঞ্জর,
চঞ্চল চুল্‌বুল্
পাখনায় নির্ভর।"

—'পিয়ানোর গান' : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

২। "খুঁজে মেলেনিক ইশারা ;
ডাকঘরে নেই ঠিকানা,
চিঠি নেই ; দিবানিশারা—
ভস্মলোচন তুষারা
ভবঘুরে ঘোরে বেগানা ;
পালায় পিশাচ ইসারা!"

—'অপস্মার' : বিষ্ণু দে

৩। "বামুন বাদল বান দক্ষিণা পেলেই যান।"

—বাংলা প্রবাদ

৪। "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার
বহেনা চল মলয়ানিল লুটিয়া ফুল গন্ধভার"।

—'বৃন্দাবনা অন্ধকার' : কালিদাস রায়

৫। "খাদ্যে-খাদকে বাদ্যে-বাদকে প্রকৃতির ঐশ্বর্য,
ষড় ঋতু ছলে ষড় রিপু খেলে কাম হতে মাৎসর্য্য।"

—'দুখবাদী' : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

৬। "অঙ্গে রাখিনা কাহারো অঙ্গীকার ?
চাঁদের আলোয় চাঁচর বালির চড়া।"

—'ঘোড়সওয়ার' : বিষ্ণু দে

এইসব দৃষ্টান্তের মধ্যে শব্দের উচ্চারিত ধ্বনি নিয়ে কবিদের কারিকুরি দেখা যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রে বিভিন্ন উক্তির রম্যতা প্রধানতঃ উচ্চারিত শব্দের ধ্বনিতেই আশ্রিত। এই কারণে, রম্যতা-বিধায়ক কোনো একটি শব্দ বদলে তার অন্য কোনো প্রতিশব্দ দিলে সৌন্দর্য নষ্ট হবে। "অঙ্গে রাখি না কাহারো অঙ্গীকার",—এই উক্তির বাচ্যার্থ যথাসাধ্য বজায় রেখে যদি বলা যায় 'শরীরে কি কারও রাখি না প্রতিশ্রুতি ?'—তাহলে ঐ পূর্বকথার শ্রুতিগম্য বিশেষ ধ্বনির বিশেষ স্বাদ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। মানে হয়তো ঠিক রইলো, কিন্তু কানের আনন্দের প্রকৃতি হয় বদলে গেল, নয়তো পুরোপুরি বিলুপ্ত হলো। এই স্বতঃসিদ্ধ মনে রেখে বাংলা শব্দালঙ্কারের পাঁচটি প্রধান শ্রেণীর কথা স্মরণীয়—ধ্বন্যুক্তি, অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ এবং বক্রোক্তি। সুধীর-কুমার এই পাঁচটির কথা বলেছেন। শ্যামাপদ চক্রবর্তীর হিসেবে বাংলা শব্দালঙ্কারের প্রধান পাঁচ শ্রেণীর নাম—অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ এবং পুনরুক্তবদাভাস। এই দুই বিশেষজ্ঞের তালিকা মিলিয়ে এখন মোট যে ছ'টি শব্দালঙ্কারের কথা এখানে আলোচ্য, যথাক্রমে সেগুলির নাম দেওয়া হলো—অনুপ্রাস, যমক, বক্রোক্তি, শ্লেষ, ধ্বন্যুক্তি এবং পুনরুক্ত-বদাভাস। এইবার একে-একে এদের বৈশিষ্ট্য দেখা যাক্।

"বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ" [সাহিত্যদর্পণ]। বর্ণসাম্যের নাম অনুপ্রাস। **কিন্তু স্বরবর্ণ নয়, বাংলায় ব্যঞ্জনবর্ণের সাম্য থেকেই অনুপ্রাস ঘটে থাকে।** 'সাহিত্যদর্পণের' ব্যাখ্যাকার কানে (Kane) লিখেছেন—

> "The repetition of the same letters (consonants) constitutes অনুপ্রাস। It is possible in various ways :—e. g. 1) the same consonant may be repeated twice ; 2) many consonants (ব্যঞ্জন-

সঙ্ঘ) may be repeated only once and in the same order ; or 3) the same consonant may be repeated a number of times."

অর্থাৎ—একই বর্ণগুচ্ছের [ব্যঞ্জনবর্ণ] পৌনঃপুনিক প্রয়োগের নাম অনুপ্রাস। এ অলঙ্কার নানাভাবে উৎপন্ন হতে পারে—যেমন [১] একই ব্যঞ্জনের দু'বার ব্যবহারে ; [২] কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের সম্মিলন-ঘটিত কোনো ব্যঞ্জনসঙ্ঘের দু'বার মাত্র প্রয়োগে ; কিন্তু, অপরিবর্তিত ক্রমে, অর্থাৎ বিন্যাসের যথাযথ ক্রম রক্ষা করেই সে রকম প্রয়োগ ঘট্‌তে পারে ; এবং [৩] একই ব্যঞ্জন বহুবার ব্যবহার করে।

প্রথম ও তৃতীয় রীতির নাম বৃত্ত্যনুপ্রাস, দ্বিতীয়টির নাম ছেকানুপ্রাস।

প্রত্যেক অনুপ্রাসই এক হিসেবে **বৃত্ত্যনুপ্রাস**। 'বৃত্তি' বা রসব্যঞ্জক বর্ণ-প্রয়োগ থেকেই বৃত্ত্যনুপ্রাসের উদ্ভব ঘটে থাকে। এর আগে যে ছ'টি বাংলা দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে তার প্রথমটিতে এই সাধারণ অর্থে তো বটেই, তা'ছাড়া বিশেষ অর্থেও বৃত্ত্যনুপ্রাস বিদ্যমান। 'গুন্ গুন্', 'রুন্ রুন্', 'ফিস্ ফিস্', 'মিশ্ মিশ্' ইত্যাদি প্রয়োগের মধ্যে এই বৃত্ত্যনুপ্রাসের নমুনা রয়েছে। যথাক্রমে গু, রু, ফি, মি-র দুই-দুই দফায় আবির্ভাব ঘটেছে [১]। তৃতীয় দৃষ্টান্তে 'বামুন, বাদল, বান', এই অংশে 'বা'-ব্যঞ্জনের বহুবার পুনরুচ্চারণ ঘটেছে। ওখানেও বৃত্ত্যনুপ্রাস [২]। আবার বহুবার উচ্চারিত সংযুক্ত ব্যঞ্জনের বৃত্ত্যনুপ্রাসের [৩] নমুনা রয়েছে 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' উক্তিতে। ওখানে 'ন' অন্য ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে বার-বার উচ্চারিত হচ্ছে। আবার, বিষ্ণু দের 'অপস্মার' থেকে তালিকায় দ্বিতীয় যে নমুনাটি তুলে দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে 'শারা'-ব্যঞ্জনগুচ্ছের আবর্তন—'ইশারা', 'নিশারা', 'তুষারা'-ই তার প্রমাণ। মনে রাখা উচিত যে যদি লেখা হতো—

কেশ্‌নগরের মশারা
সারা হলো সেই বিষেতে
মনীষারা এসে বলেছে।

—তাহলে তাতে কাব্যপ্রাণ না থাকলেও 'শারা' ধ্বনির বৃত্ত্যনুপ্রাস অক্ষুণ্ণ থাকতো। 'মশারা' 'সারা' এবং 'মনী-ষারা' এই তিন শব্দ থেকেই অযুক্ত

'শারা' ব্যঞ্জনগুচ্ছ খুঁজে নিতে কষ্ট হবার কথা নয়। বাংলা উচ্চারণে 'শারা' 'সারা', 'ষারা', তিনটিই সমমূল্যের—অর্থাৎ এই তিন ক্ষেত্রেই শ-এর উচ্চারণ sh-এর মতন।

বিশেষ অর্থে 'বৃত্ত্যনুপ্রাস' বল্‌তে যা বোঝায়, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে অতঃপর এই কটি সাধারণ লক্ষণ মনে রাখা প্রয়োজন,—এক ব্যঞ্জনের বহু প্রয়োগ,—যুক্ত বা অযুক্তভাবে একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের একই ক্রমানুসারে বহুবার প্রয়োগ, এবং,—ক্রমভঙ্গ বা পর্যায়ভেদ হলেও একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের দুবার প্রয়োগ। প্রথম তিনটি লক্ষণের দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া হয়েছে। এইবার যদি বলা যায়—

টবে বটগাছ
দেখে পাই **লাজ**
জলা বাংলায়
এ কী হয় আজ।

তাহলে 'টব' আর 'বট', 'লাজ আর 'জলা' শব্দের মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণের পর্যায়-ভঙ্গ সত্ত্বেও যে সমাবস্থান দেখা যাবে, সেও ঐ 'বৃত্ত্যনুপ্রাস'-এরই দৃষ্টান্ত [৪]।

বিশেষভাবে **'ছেকানুপ্রাস'** বল্‌তে যা বোঝায়, তার প্রকৃতি সম্বন্ধে মনে রাখা দরকার যে, একটিমাত্র ব্যঞ্জনের পুনরাবৃত্তি কখনোই 'ছেকানুপ্রাস' নয়। ছেকানুপ্রাসের আর এক নাম 'একানুপ্রাস'; কিন্তু **একটিমাত্র ব্যঞ্জনের অনুপ্রাস নয়, একই ব্যঞ্জনগুচ্ছের অনুপ্রাস।** দুই বা দুইয়ের বেশি ব্যঞ্জন থাকা চাই এবং তারা হয় যুক্তভাবে, না হয় অযুক্তভাবে একই ক্রমে মাত্র দুবার ধ্বনিত হবে। এই রকম অনুপ্রাসের নমুনা আছে ওপরের পঞ্চম উদ্ধৃতিতে—

"খা**দ্যে**-খা**দকে** বা**দ্যে**-বা**দকে**"

কিংবা, "**ষড়** ঋতু ছলে **ষড় রি**পু খেলে"

এ সব ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত ক্রমে তিনটি-তিনটি ব্যঞ্জনের মাত্র দুবার করে প্রয়োগ ঘটেছে—'দ্যে-দকে' এবং 'ষড়রি'। এরই নাম 'ছেকানুপ্রাস'।

অতঃপর শ্রুত্যনুপ্রাসের কথা। আমাদের মুখবিবরে ভিন্ন-ভিন্ন ধ্বনি উচ্চারণের স্থানগত পার্থক্য আছে। **এক উচ্চারণস্থান থেকে উচ্চারিত বিভিন্ন ব্যঞ্জনের অনুপ্রাসকে বলা হয় 'শ্রুত্যনুপ্রাস'।** যেমন—

"ঢালি মধুরে মধুর বধুরে আমার হারাই বুঝি,
পাই নে খুঁজি।"

—'ঝুলন' : রবীন্দ্রনাথ

অধরোষ্ঠের সংস্পর্শের ফলে উচ্চারিত 'ম', 'ব', 'প' ধ্বনির এই অনুপ্রাসের নাম শ্রুত্যনুপ্রাস।

ধ্বনিচমৎকারিত্বের উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ প্রযুক্ত একাধিক অনুপ্রাসের নাম 'মালানুপ্রাস'।

"আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে⋯"

—'প্রণয়-প্রশ্ন' : রবীন্দ্রনাথ

এখানে জ, ল, ক, ঝ ইত্যাদির একাধিক অনুপ্রাসমালা দেখা যাচ্ছে। এর নাম 'মালানুপ্রাস'।

অনুপ্রাসের পরে এবার যমকের কথায় আসা যাক্। **শুনতে একই রকম, কিন্তু অর্থের ভেদবাচক শব্দসমাবেশের পুনরাবৃত্তির নাম 'যমক'।** বাংলায় কবিওয়ালারা ছিলেন যমকের ভক্ত। দাশরথি রায়ের পদ্যে যমকের প্রাচুর্য দেখা যায়। একালের লেখকদের মধ্যে শিবরাম চক্রবর্তী এ-রাজ্যের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি।

'জীবনে কখনো ভালোবাসা না পেলেও একটি ভালো বাসা
পেয়েছিলাম।'

—এই উক্তির মধ্যে 'ভালোবাসা' আর 'ভালো বাসা' উচ্চারণে সমধর্মী হলেও অর্থে পৃথক। এই রকম প্রয়োগ-কে বলা হয় 'যমক'।

মনে রাখা উচিত যে, উচ্চারণে দুটি শব্দের সম্পূর্ণ ঐক্য থাকা চাই। 'গুঞ্জন' আর 'গঞ্জনা,—কিংবা, 'নিরত' আর 'তরণী' ইত্যাদির মধ্যে যে আংশিক বর্ণগত সাদৃশ্যের চেহারা বিদ্যমান, সে সাদৃশ্য যমকের নয়। তা'ছাড়া শ্লেষ আর যমকের ভেদটিও মনে রাখা দরকার। **যমকে শব্দটি একাধিক বার আবৃত্ত হওয়া চাই। শ্লেষে একবারই যথেষ্ট।**

সংস্কৃত সাহিত্যে ঘটকর্পর, ভট্টি, নীতিবর্মণ প্রভৃতি লেখকদের অনুশীলনে

যমকের বহু দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। বাংলায় আঠারোর শতকের কবিদের রচনায় যমক অলঙ্কারের বহুল ব্যবহার চোখে পড়ে। যমক অলঙ্কার সম্বন্ধে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে, এতে যে বর্ণগুচ্ছ আবৃত্ত হয়ে থাকে, তার মানে থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আবার, একটি অর্থযুক্ত এবং অন্যটি নিরর্থক হতেও বাধা নেই। তারপর, আদ্য, মধ্য, অন্ত্য এবং সর্ব ভেদে যমক চার রকম হয়ে থাকে। পর-পর এই চার শ্রেণীর চারটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

[১] "**আনা** দরে **আনা** যায় কত আনারস।" [আদ্যযমক]

[২] "যাইতে ভবের **পারে পারে** সেই জন।" [মধ্যযমক]

[৩] "যত কাঁদে বাছা বলি **সর সর**
আমি অভাগিনী বলি **সর্ সর্**।" [অন্ত্যযমক]

[৪] "**ভাল ভাল** বঁধু! **ভাল** ত আছিলে ?
ভাল সময়, **ভাল** এসে দেখা দিলে।" [সর্বযমক]

বাংলায় 'সর্বযমকের' ব্যবহার প্রায় নেই-ই। এই নমুনাগুলি দেখলেই বোঝা যায় যে, উঁচুদরের ভাবের কবিতায় যমকের জায়গা খুবই কম। যমকের সঙ্গে ইংরেজি Pun বা Paronomasia অলঙ্কারের সাদৃশ্য আছে। বাংলায় ব্যাপকভাবে শ্লেষ এবং যমক উভয় অর্থেই মাঝে মাঝে 'শব্দক্রীড়া' কথাটি ব্যবহৃত হয়।

যমকের মূল বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। ওপরের দৃষ্টান্তগুলির প্রত্যেকটিতেই **'সার্থক যমক'** দেখা যাচ্ছে। এইবার **'নিরর্থক যমকে'র** কথা। বাংলায় 'নিরর্থক যমক' আর 'ছেকানুপ্রাস' মনে হয় একই ব্যাপার। ছেকানুপ্রাসের নমুনা আবার মিলিয়ে দেখা যাক্—

"ষড় ঋতু ছলে ষড় রিপু খেলে"

—এখানে 'ষড়ঋ' 'ষড়রি' প্রয়োগ দুটি শুনতে একরকম, কিন্তু অর্থহীন। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী এরকম ক্ষেত্রে 'ছেকানুপ্রাস' আর 'নিরর্থক যমক'কে অভিন্ন মনে করেছেন।

এইবার 'বক্রোক্তি'-র কথা। এর আগে কুন্তকের প্রসঙ্গে যে 'বক্রোক্তি-র কথা বলা হয়েছে, এখানে আলোচ্য 'বক্রোক্তি-শব্দালঙ্কার' সে জিনিস নয়।

বক্তার কথা শ্রোতার পক্ষে যখন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তখনই 'বক্রোক্তি-শব্দালঙ্কার' ঘটেছে বলতে হবে।

যমকে যেমন শব্দগত চাতুর্যের নমুনা দেখা গেছে, বক্রোক্তিতেও কতকটা তাই দেখা যায়। এ যেন শব্দ নিয়ে খেলা করবার মর্জি। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গলকাব্যে অন্নপূর্ণা আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে যখন শিবের সম্বন্ধে বলেন—

"কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ"

—তখন শব্দার্থজ্ঞানী পাঠক বুঝতে পারেন যে, 'কু' মানে 'পৃথিবী এবং 'মন্দ' দুই-ই হতে পারে ;—'পঞ্চমুখ' মানে 'পঞ্চানন' মহাদেব এবং 'অতিশয় বাচাল' দুই-ই হওয়া সম্ভব ;—'কণ্ঠভরা বিষ' 'নীলকণ্ঠ' মহাদেবকেও বোঝাতে পারে, আবার, 'অতিশয় তিক্তভাষী' অর্থও সম্ভব। অতএব যিনি এসব কথা বল্‌ছেন তিনি যে-অভিপ্রায়ে বল্‌ছেন, তাঁর সে-অভিপ্রায়ের বিপরীত অর্থ করলে শ্রোতাকে দোষ দেওয়া যায় না। একে বলা হয় 'বক্রোক্তি'।

এই দৃষ্টান্তে উচ্চারণবৈচিত্র্য-নিরপেক্ষভাবে কেবল শব্দার্থের বিভিন্নতা বশতঃ একই শব্দে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের ধারণা হচ্ছে। আবার, প্রধানতঃ উচ্চারণের তারতম্যজনিত অর্থভেদও হতে পারে।

'তুমি কি পড়েছ ?' এবং 'তুমি কী পড়েছ !'

এই দুটি প্রশ্নের ভাষা একরকম, বানান একই রকম। কিন্তু প্রথমটিতে জিজ্ঞাসার এবং দ্বিতীয়টিতে বিস্ময়ের স্বরগত তারতম্য ঘটানো প্রশ্নকর্তার বলবার ভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। এই জাতীয় স্বরভঙ্গির পারিভাষিক নাম 'কাকু'।

অতএব বক্রোক্তির পূর্বদৃষ্টান্তকে **শ্লেষবক্রোক্তি** এবং এটিকে **কাকুবক্রোক্তি** বলা যাবে।

শ্লেষ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া গেল। শ্লেষবক্রোক্তি-তে বক্তা এবং শ্রোতা দুটি ভিন্ন পক্ষের দরকার হয়। কিন্তু শুধু শ্লেষের ক্ষেত্রে,—অর্থাৎ **শব্দশ্লেষ**-এ একা লেখক বা বক্তা থাকলেই চলবে। ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল কাব্য থেকে যে দৃষ্টান্তটি তুলে দেওয়া হয়েছে সেটিকে 'শব্দ শ্লেষ' বলাই সংগত। কারণ, ওখানে দুটি পক্ষ আছেন বটে, কিন্তু এক পক্ষই সক্রিয়। অন্নপূর্ণা বলেছেন, আর শ্রোতা সে সব কথা মুখ বুজে শুনেছেন মাত্র। একটি

শব্দে একাধিক অর্থের অবস্থিতির ফলে শ্লেষ হয়ে থাকে। যমকের মতো এতে শব্দটি বার-বার উচ্চারিত হবার দরকার নেই। পণ্ডিতরা শ্লেষের নানান্ শ্রেণীর কথা বলেছেন। আ-ভাঙা শব্দের শ্লেষ-কে বলা হয় **অভঙ্গশ্লেষ**। যেমন—

"কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর ?

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত মানে, 'একজন বাঙালী কবি' এবং 'ভগবান গুপ্ত' দুই-ই বোঝা যায়, শব্দ দুটিকে না ভেঙেই সে অর্থবৈচিত্র্য পাওয়া যাচ্ছে। আর, সংস্কৃতে যাকে **সভঙ্গশ্লেষ** বলা হয়, তাতে দেখা যায় শব্দ ভেঙে অর্থবৈচিত্র্য সাধনের প্রয়াস। একালের বাংলায় শিবরাম চক্রবর্তী-র লেখাতে এই অলঙ্কারের নানা নমুনা দেখা গেলেও বাংলাতে কিন্তু সংস্কৃতের মতো এ জিনিসের চর্চা ততো বেশি হয়নি। দাশরথি রায়ের একটি লেখাতে বলা হয়েছে "অপরূপ রূপ কেশবে"—সেখানে 'কেশবে', কথাটি ভেঙে 'কে শবে' করে নিলে ভিন্ন অর্থ পাওয়া যাবে। অতএব সেটি সভঙ্গশ্লেষের দৃষ্টান্ত।

এইবার 'ধ্বন্যুক্তি'র কথা। সুধীরকুমার 'ধ্বন্যুক্তি'র এই সংজ্ঞা দিয়েছেন—"**বর্ণ, শব্দ বা বাক্যের ধ্বনিরূপ দিয়া অর্থের উক্তি অর্থাৎ আভাসে প্রকাশ হইলে, সেই বিশিষ্ট সৌন্দর্যের নাম ধ্বন্যুক্তি অলঙ্কার** হয়।"

বলা বাহুল্য, Pope তাঁর Essay on Criticism-এ এই কথাই বলেছিলেন—"The sound must seem an echo to the sense. ।" যমকে এবং শ্লেষে চাতুর্যের ভাবটাই প্রধান; ধ্বন্যুক্তিতে সেরকম নয়। ধ্বন্যুক্তি যেন গভীরতর ব্যঞ্জনার দিকেই নিবিষ্ট।

"বনের মন্দির মাঝে তরুর তম্বুরা বাজে,
অনন্তের উঠে স্তবগান
চক্ষে জল বহে যায়, নম্র হল বন্দনায়
আমার বিস্মিত মনপ্রাণ।" —'অসমাপ্ত' : রবীন্দ্রনাথ

—এখানে উচ্চারিত ধ্বনি থেকেই এর অন্তর্নিহিত বিশিষ্ট অর্থের স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে। আবার—

"বেগুন মুলো পাওয়া যাবে নিলফামারির বাজারে
নগদ দামে বিক্রি করে, তিন টাকা দাম হাজারে।"

—রবীন্দ্রনাথের এই ছড়ার মধ্যে পূর্বদৃষ্টান্তের মতো গভীরতার স্বাদ

না থাকলেও এর উচ্চারিত ধ্বনিপারম্পর্য থেকে অন্তর্নিহিত লঘু কৌতুকের অনুরণন অনুভব করা যাচ্ছে। সুতরাং ভেতরের মানেটি গম্ভীরও হতে পারে, হাল্‌কা হতেও আপত্তি নেই। ধ্বন্যুক্তিতে শুধু এইটুকু দেখা দরকার যে, উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে মনে তার প্রত্যক্ষ ব্যঞ্জনা জাগা চাই। সুধীরকুমার বিশেষভাবে বাংলায় ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে ধ্বন্যুক্তি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বলে স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে অনেক প্রশংসার কথা লিখে গেছেন। ভারতচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কবির রচনাতে বাংলা ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহু বিস্ময়কর প্রয়োগ লক্ষ্য করা গেছে। আধুনিক কালে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রভৃতি কবিরাও এদিকে বিশেষ সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা থেকে এই ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহারলব্ধ ধ্বন্যুক্তির নমুনা দেখা যেতে পারে—

"তুল্ তুল্ টুক্ টুক্
টুক্ টুক্ তুল্ তুল্
তার তুল্ কার মুখ ?
তার তুল্ কোন্ ফুল্ ?
বিল্‌কুল্ তুল্ তুল্
টুক টুক্ বিল্‌কুল্।"

এই দৃষ্টান্তের মধ্যে ধ্বন্যাত্মক 'তুল্ তুল্' এবং 'টুক্-টুক্'-এর বিচিত্র আবেদন দেখা যাচ্ছে। এখানে তৃতীয়-চতুর্থ লাইনের 'তুল্' অবিশ্যি ধ্বন্যাত্মক শব্দ নয়। ভারতচন্দ্রের লেখাতে এর চেয়ে সার্থক দৃষ্টান্ত আছে। একটি দৃষ্টান্ত দিলেই সে কথা সুপরিস্ফুট হবে—

"লটাপট জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা।"

—এখানে জলাশয়ের পূর্ণতাবাচক 'ছলচ্ছল', জলের নির্মলতাবাচক 'টলটল' এবং জলের গতিশীলতা এবং ধ্বনিময়তার পরিচায়ক 'কলকল',—এই তিনটি ধ্বন্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

এইবার ধ্বন্যুক্তি সম্বন্ধে এই তিনটি কথা মনে রাখা দরকার—

[ক] সুধীরকুমার লিখেছেন—"ইহাতে ভাবানুকারী যে কোন প্রকার উৎকৃষ্ট বর্ণ প্রয়োগ হইলেই চলে, বর্ণের পুনরাবৃত্তি একান্ত আবশ্যক নহে।"

[খ] শব্দ, বাক্য, পুরো অনুচ্ছেদ—সর্বত্রই এই ধ্বন্যুক্তির প্রয়োগ ঘটতে পারে। [গ] ধ্বন্যুক্তির এইসব লক্ষণ দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা চলে যে, অনুপ্রাস, যমক ইত্যাদি অন্যান্য এক বা একাধিক শব্দালঙ্কার যেখানে আছে, অন্যান্য অলঙ্কারময় হয়েও উচ্চারিত ধ্বনিমাধুর্যের গুণে সেইসব অংশও ধ্বন্যুক্তির দৃষ্টান্ত হতে পারে।

অতঃপর শব্দালঙ্কার-এর শেষ প্রসঙ্গ 'পুনরুক্তবদাভাস'-এর কথা। অধ্যাপক শ্যামাপদ চক্রবর্তী অতি সহজ কথায় এর সংজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সে অংশ এখানে তুলে দেওয়া হলো :—**"কোন বাক্য শোনা-মাত্রই যদি মনে হয় যে একই অর্থে একের বেশি ভিন্নরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু অর্থ বোঝামাত্র যদি সে ধারণা কেটে যায়, তবেই হয় পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার।"**

এই অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত—

"কোথা আজি পঞ্চশর অনঙ্গ মদন" —শ্যামাপদ চক্রবর্তী

শুনলে হঠাৎ মনে হয় পঞ্চশর, অনঙ্গ এবং মদন তিনটি একই অর্থবাচক শব্দ। কিন্তু পরে বোঝা যায় যে, শিবের ক্রোধে ভস্মীভূত [অনঙ্গ] মদনকে কবি জিজ্ঞাসা করেছেন—তোমার পাঁচখানি শর আজ কোথায় ?

এইবার অর্থালঙ্কারের কথা—

অর্থনির্ভরশীল অলঙ্কারের নাম অর্থালঙ্কার। এ রাজ্যে শব্দের উচ্চারণগত ধ্বনিচাতুর্য বা ধ্বনিসৌন্দর্যের কোনো কথা ওঠে না। এখানকার সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অর্থগত। 'পাহাড় মেঘের মতো দিগন্তে দৃশ্যমান', অথবা 'দিগন্তে নীরদনিভ গিরিমালা দৃষ্টিগোচর হয়'—এই দুই উক্তিতেই অর্থগত ঐক্য আছে, যদিও এদের মধ্যে শব্দগত সমতা নেই। কিন্তু অর্থালঙ্কারের বিচারে তাতে কিছু আসে যায় না। অর্থালঙ্কার সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা এই যে, এ রাজ্যে চিত্রধর্মেরই প্রাধান্য। শব্দালঙ্কারে যেমন কানের আবেদন, অর্থালঙ্কারে তেমনি অর্থগ্রাহী মনের আবেদনই প্রধান মনে হয়। এইবার আগে যথাক্রমে স্বভাবোক্তি, লক্ষ্যোক্তি, আরোপোক্তি, ব্যঙ্গোক্তি ইত্যাদির কথা বলে নিয়ে পরে সাদৃশ্য-বাচক অলঙ্কারের কথা বিশেষভাবে,—এবং বিরোধবাচক, শৃঙ্খলাবাচক, ন্যায় বা তর্কবাচক অন্যান্য অর্থালঙ্কারের মধ্যে প্রধান দু'একটি প্রসঙ্গ দেখা যাবে।

'ক্ষণিকায়' 'চিরায়মানা'-কবিতায় মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—

"এসো হেসে সহজ বেশে, আর কোরো না সাজ
গাঁথা যদি না হয় মালা ক্ষতি তাহে নাই গো বালা
ভূষণ যদি না হয় সারা ভূষণে নাই কাজ।"

অর্থালঙ্কারের প্রথম প্রসঙ্গ **স্বভাবোক্তির** কথা ভাবতে বসলেই রবীন্দ্রনাথের সেই উক্তিটি মনে পড়ে। দণ্ডী বলেছিলেন, স্বভাবোক্তিই 'আদ্যা অলঙ্কৃতি'। সেকালে এ-অলঙ্কারের নামান্তর ছিল 'জাতি'। কিন্তু ভামহ একে অলঙ্কার বলে মানেননি। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন যে, 'যেমন আছ তেমনি এসো'—এ আহ্বান অলঙ্কারপ্রীতির নিদর্শন নয়। উক্তির বক্রতা-ছাড়া অলঙ্কার অসম্ভব। এই ছিলো ভামহের বিশ্বাস। লোকমুখের প্রসাধনহীন বচনে যা দুর্লভ, ভাষার সেই বিশেষ রমণীয়তা বোঝাবার জন্যে সেকালে 'বিচ্ছিত্তি' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিচ্ছিত্তি' তো সংসারের পথে-ঘাটে, যত্রতত্র, বিনা-আয়াসে, বিনা-প্রযত্নে পাবার জিনিস নয়। 'ভূষণে নাই কাজ'—কবির এই প্রস্তাবের মধ্যেও বচনের একরকম নির্বাচন ঘটেনি কি? 'গয়না পরা শেষ না হয়ে থাকে তো এমনিই চলে এসো, গয়নার দরকার নেই।'—এইভাবে মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করলে সেটা সত্যিই হয়তো লোকমুখের কথা হতো। কিন্তু কবি তা করেননি। কথাকে কিঞ্চিৎ মার্জিত-ভাবে, বক্রভাবে পরিবেষণ করাই তো কবিতার রীতি। বক্রতা-হীন অলঙ্কার আমাদের কল্পনার অগোচর!

আচার্য দণ্ডী যদিও 'স্বভাবোক্তি'র গুণগান করেছিলেন, তবু তাঁকেও 'বক্রোক্তি' এবং 'স্বভাবোক্তি'র মধ্যে ভেদ স্বীকার করতে হয়েছে। তিনি ভামহের 'অতিশয়োক্তি'-সম্পর্কিত মন্তব্য স্মরণ করেছেন। ভামহ বলেছিলেন, সকল অলঙ্কারেই উক্তির কিছু-না-কিছু বাড়াবাড়ি ঘটে থাকে। অর্থাৎ—'বক্রতা' বা কিঞ্চিৎ আতিশয্য ছাড়া অলঙ্কার হয় না। অভিনবগুপ্ত বলে গেছেন সকল অলঙ্কারের মধ্যেই অতিশয়োক্তি আছে—অতিশয়োক্তি হলো "সর্বালঙ্কারসামান্যরূপম্।"

সুতরাং 'বক্রতা', বিচ্ছিত্তি' বা 'ভঙ্গি'-র ছোঁয়াচ্ এড়িয়ে কোনোরকম অলঙ্কারের উদ্ভব সম্ভব বলে মনে হয় না। দণ্ডী তাই 'স্বভাবোক্তি'-কে 'বক্রোক্তি'-র থেকে আলাদা করে দেখলেও অলঙ্কার মাত্রেই যে কিছু-না-কিছু

অতিশয়োক্তির ওপর নির্ভরশীল, শেষ পর্যন্ত সে কথা স্বীকার করেছেন। তার মানে, 'স্বভাবোক্তি' কথাটাই কিঞ্চিৎ অতিশয়োক্তি! একেবারে সোজাসুজি যা মনে আসে, তাই বলে ফেল্‌লে চল্‌বে না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে যতদূর সম্ভব আপন মহিমায় প্রকাশিত হতে দিতে হবে। সুতরাং **কবির আপাতপ্রযত্ন-হীন মনোদর্পণে যেখানে বহির্জগৎ স্ব-মহিমায় প্রকাশিত বলে মনে হয়, সেখানে স্বভাবোক্তি অলঙ্কার ঘটেছে বলতে হবে।** এই বইয়ের ৩১-৩২ পৃষ্ঠায় হেমচন্দ্র বাগচীর একটি কবিতা থেকে স্বভাবোক্তির দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সেটি দেখে নিলেই এ বিষয়ে সন্দেহ দূর হবে।

'স্বভাবোক্তি'র পরে অর্থালঙ্কারের তালিকায় কেউ-কেউ **'লক্ষ্যোক্তির'** কথা উল্লেখ করেন। 'লক্ষণা'র কথা আগেই বলা হয়েছে।[২] 'লক্ষণা' একরকম শব্দশক্তি। অধ্যাপক হরিহর মিশ্র তাঁর 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' বইখানির মধ্যে 'অভিধা', 'লক্ষণা' এবং 'ব্যঞ্জনা' সম্বন্ধে যেসব সূত্র দিয়েছেন, এখানে পর-পর সে তিনটি তুলে দেওয়া হলো। 'লক্ষ্যার্থে'র কথাসূত্রে পূর্বালোচিত প্রসঙ্গ পুনরায় দেখে নিলে ভালোই হবে। অধ্যাপক মিশ্র বলেছেন—

"শব্দ তাহার অভিধা শক্তির বলে যে অর্থটি আমাদের বুদ্ধিতে উপস্থাপিত করে তাহা সেই শব্দের বাচ্যার্থ এবং এই বাচ্যার্থের অপর নাম মুখ্যার্থ।...

"...কোন শব্দের মুখ্যার্থ যখন বক্তার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে গিয়া কুণ্ঠিত হয়, তখন সেই শব্দ তাহার অন্তর্নিহিত লক্ষণা শক্তির বলে অন্য একটি অর্থ উপস্থাপিত করিয়া সমস্যার সমাধান করে। এই দ্বিতীয় অর্থটিকে লাক্ষণিক অর্থ বলিয়া থাকি এবং সেইরূপ শব্দকে লক্ষক শব্দ বলি। লক্ষ্যার্থ সবসময়েই মুখ্যার্থের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইয়া থাকিবে।

"...কোন শব্দের বা বাক্যের বাচ্যার্থ বোধের পরেও বক্তা, শ্রোতা বা প্রসঙ্গাদির বৈশিষ্ট্য হেতু বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি বহু অর্থান্তরের উদ্ভাস হইতে পারে। এমন কি, একই ব্যক্তির দ্বারা উচ্চারিত হইয়াও পূর্বোক্ত বাক্যটি বিভিন্ন ব্যক্তির চিত্তে বিবিধ অর্থকে উল্লসিত করিতে পারে। সুতরাং বাচ্য অর্থ সঙ্কেতবশে নিয়ত হইলেও এই পরবর্তী অর্থগুলি একান্ত অনিয়ত এবং নিরবধি। ইহাদের বৈচিত্র্যের অন্ত নাই।

"এখন ঐরূপ অর্থগুলিকে শব্দের মুখ্য অর্থ এইজন্য বলা যায় না যে ইহাতে

২। বর্তমান গ্রন্থের ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শব্দের সঙ্কেত নাই, সুতরাং এইগুলি শব্দের স্বাভাবিক অর্থ নহে। ইহারা তাৎপর্যার্থও নহে; কারণ তাৎপর্যশক্তি বাক্যান্তর্গত পদার্থগুলির অন্বয়মাত্রে পর্যবসিত হয়। লক্ষ্যার্থের এস্থলে অবকাশ নাই, কারণ মুখ্যার্থগুলির মধ্যে অন্বয় বা তাৎপর্যের কোন বাধা নাই; এইরূপ অর্থের বোধের জন্য পূর্বোক্ত তিনটি শক্তির [অর্থাৎ—অভিধা, লক্ষণা, তাৎপর্য ৩] অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা নামক চতুর্থ শক্তি স্বীকার করিতে হয়।"৪

শব্দ এবং তার অর্থ উভয়ের আশ্রয় স্বীকার করেই ব্যঞ্জনার উল্লাস ঘটে থাকে বটে, তবু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় যে, কখনো তা প্রধানতঃ শব্দাশ্রয়ী, আবার কখনো তা প্রধানতঃ অর্থাশ্রয়ী হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে পণ্ডিতরা ব্যঞ্জনা-বিচারে দুটি শ্রেণীর নাম করেছেন—'শাব্দী ব্যঞ্জনা' এবং 'আর্থী ব্যঞ্জনা'। কিন্তু এখন সে কথা থাক্। অর্থালঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে 'লক্ষ্যোক্তি'র কথা থেকে প্রসঙ্গান্তরে মনোযোগ পড়েছিল। এইবার সেই লক্ষ্যোক্তির কথাতে পুনরায় ফেরা যাক্। লক্ষণা যে শব্দশক্তি, এবং কারো-কারো মতে ও যে একরকম অনুমান-শক্তি, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। অধ্যাপক সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বলেছেন—

"লক্ষণা একটি শব্দশক্তি, তাহা অলঙ্কার নহে; তাহার প্রয়োগে লক্ষ্যার্থে অলঙ্কার বা সৌন্দর্য প্রকাশ পায়।"

লক্ষণার দুই শাখা—'রূঢ়ি লক্ষণা' এবং 'প্রয়োজন লক্ষণা'। ভাষায় বহু জনের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ফলে উক্তিবিশেষের যে প্রসিদ্ধি দাঁড়িয়ে যায়, সেরকম লক্ষণার নাম 'রূঢ়ি লক্ষণা'। যেমন—'দেশে দেশে সাড়া', 'প্রেমে হাবুডুবু', 'জাগ্রত এশিয়া' ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে অভিধার্থ বা মুখ্যার্থ অতিক্রম করে লক্ষণার্থে পৌঁছে তবে উক্তিগুলির অর্থবোধ সম্ভব হয়। আমরা অতিশয় নির্দিষ্ট কোনো অর্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকেই এইসব প্রসিদ্ধি বা অভ্যস্ত লক্ষ্যোক্তি ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু কখনো-কখনো বিশেষ প্রয়োজনে, বিশেষ অর্থ বোঝাবার জন্যেও লক্ষণার ব্যবহার ঘটে থাকে। যেমন—'লোকটি চলন্ত অভিধান';—'আহা, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির এলেন!' এসব ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনের তাড়না আছে। যেমন, প্রথম উক্তিটিতে লোকটির

৩। বর্তমান গ্রন্থের পৃঃ ৫০ দ্রষ্টব্য।

৪। 'ব্যঞ্জনা ও কাব্য' [১৩৬২]—হরিহর মিশ্র পৃঃ ২৪-৩৬।

অসীম তথ্যজ্ঞানের কথা সূচিত হয়েছে, দ্বিতীয়টিতে হয়তো ছলনার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের আঘাত দেওয়া হয়েছে। এইসব হলো 'প্রয়োজন লক্ষণা'র দৃষ্টান্ত। বাংলা সাহিত্যে ব্যবহৃত এই 'লক্ষ্যার্থ' অর্থালঙ্কারের দু'জাতের দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

[১] "গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া।" [রূঢ়ি-লক্ষণা]

[২] "বাঘেরে তোর জাগিয়ে দে গো,
রাগিয়ে দে তোর নাগেরে।" [প্রয়োজন-লক্ষণা]

মনে রাখা দরকার যে, **লক্ষ্যার্থ সব সময়েই মুখ্যার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকবে, কিন্তু মুখ্যার্থ কুণ্ঠিতও হওয়া চাই।** ওপরের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'বাঘেরে' এবং 'নাগেরে' তাদের পৃথক-পৃথক মুখ্যার্থ বজায় রেখেও অর্থবোধের উদ্দেশ্যে অভিধার্থকে কিঞ্চিৎ বিস্তারিত হতে দিয়েছে। বাংলার তেজস্বী মানুষ বাঘের মতো, বাংলার আহত সম্মান দলিত নাগিনীর মতো,—এই অর্থ প্রকাশের প্রয়োজনে এবং সাদৃশ্যটি এর চেয়ে আরো যেন ঘনিষ্ঠ করবার জন্য সাদৃশ্যবাচক কোনো শব্দ না প্রয়োগ করেই সরাসরি 'বাঘ' এবং 'নাগ'-এর প্রয়োগ ঘটেছে। ইংরেজির Metonymy এবং Synecdoche-র সঙ্গে লক্ষ্যোক্তির আংশিক মিল আছে—কিন্তু সর্বত্র নয়। মুখ্যার্থের কুণ্ঠা না ঘট্‌লে লক্ষ্যোক্তি হয় না।

অর্থালঙ্কারের সংখ্যা যেন গুণে শেষ হয় না। লক্ষণা থেকে পাওয়া দ্বিতীয় এক অলঙ্কারের নাম দেওয়া হয়েছে **আরোপোক্তি**। সুধীরকুমার লিখেছেন—**"লক্ষণা শক্তির দ্বারা একপদের বিশেষণ তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত অন্যপদে আরোপিত বা উপচারিত হইয়া যে সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে তাহার নাম আরোপোক্তি অলঙ্কার।"**

এটির সঙ্গে 'সমাসোক্তির সাদৃশ্য আছে, [অচেতনে চেতনের ধর্ম আরোপ বশতঃ]। এদের বৈসাদৃশ্যটুকু দৃষ্টান্ত দেখলেই পরিস্ফুট হবে—

"গাহিতে চাহিছে হিয়া পুরাতন **ক্লান্ত** বরষের সর্বশেষ গান"।

—আরোপোক্তির এই দৃষ্টান্তে 'ক্লান্ত' আসলে ইংরেজির Transferred epithet বা Hypallage-এর নমুনা। 'সমাসোক্তি'র আদর্শটা এই সূত্রে একবার দেখা যাক্। সেও সাদৃশ্যের অলঙ্কার। শ্যামাপদ চক্রবর্তী

লিখেছেন—"**প্রস্তুতের উপর অপ্রস্তুতের ব্যবহার আরোপিত হলে সমাসোক্তি অলঙ্কার হয়।**" 'প্রস্তুত', 'বিষয়' এবং 'প্রাকরণিক' কথার মানে হলো 'উপমেয়'। 'সমাসোক্তি'তে 'বিষয়ী'—অর্থাৎ 'উপমান' প্রকাশিত থাকে না। এখন ওপরের দৃষ্টান্তে 'ক্লান্ত' কথাটি যে 'হিয়ার' বিশেষণ এবং Transferred epithet হয়ে ও-শব্দটি যে 'বরষের'-শব্দের পূর্বে বসেছে, সে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। অতএব 'ক্লান্ত হিয়া'র মতো 'পুরাতন বরষ'—যথাক্রমে এই 'বিষয়ী' বা অপ্রস্তুত বা উপমান-এর সঙ্গে-সঙ্গে 'বিষয়' বা প্রস্তুত বা উপমেয় এখানে একইভাবে প্রকাশিত, দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সমাসোক্তিতে এরকম হয়না।

"ঘুরে ঘুরে, ঘুমৃতী চলে ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তুলে"

—সমাসোক্তির এই দৃষ্টান্তে নৃত্যপরা রমণীর মতো ঘুমৃতী নদীর লাস্য-ভাবের ইশারা ফুটেছে। 'নৃত্যপরা রমণী'ই তো এখানকার 'উপমান' বা 'অপ্রস্তুত' বা 'বিষয়ী'। সমাসোক্তিতে 'বিষয়ী' এইভাবে উহ্য থাকে। দীননাথ সান্ন্যালের সূত্রটি এইসঙ্গে মনে রাখা দরকার—"সমান কার্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় অচেতন পদার্থে সচেতন কার্যাদির সম্যক আরোপ"-এর নাম সমাসোক্তি।

ব্যঙ্গ্য বা ব্যঙ্গ্যার্থের কথা এর আগে বলা হয়েছে। ব্যঞ্জনার প্রসঙ্গে শাব্দী ও আর্থী ব্যঞ্জনার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। আর্থী ব্যঞ্জনার যাবতীয় দৃষ্টান্তই এই ব্যঙ্গোক্তি অলঙ্কারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। সুধীর কুমার সূত্র দিয়েছেন—"**ব্যঞ্জনাশক্তির প্রয়োগে উক্তিতে যে বিশিষ্ট সৌন্দর্যের প্রকাশ হয়, তাহার নাম ব্যঙ্গোক্তি বা পর্যায়োক্তি অলঙ্কার।**"

ভামহের 'কাব্যালঙ্কার' গ্রন্থে পর্যায়োক্তির কথা আছে। উদ্ভটের আলোচনাতেও 'পর্যায়োক্তি'র কথা বলা হয়েছে। 'ধ্বনি'-কেই কাব্যের আত্মা বলে মানা যাবে কিনা, সে বিচারের মধ্যে 'ধ্বন্যালোকে' প্রতীয়মান বা ব্যঞ্জিত অর্থের প্রসঙ্গে বস্তুধ্বনি, অলঙ্কারধ্বনি, রসধ্বনি, এই তিন শ্রেণীর ব্যঞ্জনার কথা বলে আনন্দবর্ধন বলেছেন যে, সমাসোক্তি, আক্ষেপ, পর্যায়োক্তি ইত্যাদি অলঙ্কারে কিঞ্চিৎ ব্যঞ্জনা থাকলেও বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থেরই প্রাধান্য দেখা যায়। অতএব ব্যঙ্গোক্তি-অলঙ্কার যে বাচ্যার্থেরই অনুরণন-

ক্রমে ধ্বনিত জিনিস, সে কথা স্পষ্টই দেখা গেল। শিতিকণ্ঠ বাচস্পতির 'অলঙ্কারদর্পণ' থেকে এখানে 'পর্যায়োক্তির' একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো—

"শচীর কেশের ন্যায় যতনে লালিত।
নন্দন কাননে ছিল পারিজাত যত॥
হয়গ্রীব দানবের যত সৈন্যদল।
অবাধে ছিঁড়িল তার সব ফুল দল॥"

—এই বর্ণনার মধ্যে হয়গ্রীব নামে দানব স্বর্গ জয় করেছে, এই কথাটি জানাতে গিয়ে, স্বর্গের নন্দন-কাননের বহু যত্নলালিত পারিজাত ফুলগুলি যে দানবসৈন্যেরা হেলায় ধ্বংস করেছিল, সেই খবরটি দেওয়া হয়েছে। বাচ্যার্থ—হয়গ্রীব দানবের সৈন্যদলের দ্বারা নন্দন-কাননের পারিজাত ধ্বংসের বৃত্তান্ত ধরেই দানব কর্তৃক স্বর্গবিজয়ের ব্যঞ্জিত সংবাদটি পাওয়া যাচ্ছে। অতএব, এখানে 'ব্যঙ্গ্যোক্তি' অলঙ্কার ঘটেছে বলতে হবে।

এইবার সাদৃশ্যবাচক অলঙ্কারের কথা। সাদৃশ্যবাচক অলঙ্কারের মধ্যে উপমা, রূপক, উল্লেখ, সন্দেহ, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি, ব্যতিরেক, ভ্রান্তিমান, অপহ্নুতি, নিশ্চয়, প্রতিবস্তূপমা ইত্যাদি বহু অলঙ্কারের কথা বলা হয়।

পৃথক-পৃথক জাতি বা শ্রেণীভুক্ত দুটি পৃথক উপাদানের মধ্যে কোনো ঐক্য, সংগতি বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যে সব অলঙ্কার প্রযুক্ত হয়, সেইসব অলঙ্কারের নাম সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার। আকাশের সঙ্গে আকাশের, গাছের সঙ্গে গাছের, মানুষের সঙ্গে মানুষের ইত্যাদি একই শ্রেণীভুক্ত বা একই জাতিভুক্ত দুই বিষয়ের মধ্যে তুলনা সম্ভব নয়। গাছের সঙ্গে মানুষের তুলনা করে মানুষকে 'বনস্পতির মতো স্থির' বলা চলে। এই ধরনের উক্তিতে দুটি পৃথক জাতির কথা সূচিত হয়ে থাকে।

"পাথরের উপর নির্ঝরের মতো
আমার উপর দিয়ে
বয়ে গেল অনেক বৎসর।" —'খোয়াই': রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'পাথর' আর কবির 'আমি',—'নির্ঝর' এবং 'অনেক বৎসর' এই দু'জোড়া মোট চারটি উপাদানের মধ্যে সাদৃশ্যের গিঁঠ বাঁধা হয়েছে। 'মতো' কথাটা তুলনাবোধকে স্পষ্ট স্বীকৃতি দিচ্ছে। ওটি হলো **তুলনাবাচক** শব্দ। কবির 'আমি' এবং বস্তুজগতের 'পাথর' এই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য

ভাবা হয়েছে, অপর পক্ষে 'নির্ঝর'-এর স্রোত এবং সময়ের ধারা ['অনেক বৎসর'] এই দুইয়ের মধ্যেও তুলনা চলেছে। সবটা মিলিয়ে মোট তুলনাটা গদ্যে এই রকম দাঁড়াবে —'পাথরের ওপর দিয়ে যেমন নির্ঝরের স্রোত বয়ে যায়, আমার ওপর দিয়ে তেমনি অনেক বৎসরের স্রোত বয়ে গেল।' এখানে কবির 'আমি' এবং সময়-ধারার সূচক 'অনেক বৎসর' হলো **উপমেয়** ; 'পাথর' এবং 'নির্ঝর' হলো **উপমান** ; উপমেয় এবং উপমান, দুয়ের মধ্যে যে সাধারণ গুণ থাকার ফলে এই তুলনার সম্ভাবনা দেখা দেয়, সেই গুণকেই বলা হয় **সাধারণ ধর্ম** ; একটু সমবেদনা নিয়ে এখানকার সাদৃশ্যটুকু ভাববার চেষ্টা করলে বোঝা যাবে যে পাথর যেমন কঠিন, পাথর যেমন বহু আঘাত সহ্য করে অটুট থাকে, কবির সত্তার মধ্যেও তেমনি স্থৈর্য, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণ আছে।

উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ এই চার উপাদানের সমবায়ে উপমা তৈরি হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের 'খোয়াই' কবিতা থেকে যে দৃষ্টান্তটি দেখা গেল তাতে তিনটি উপাদান স্পষ্ট করে বলা আছে, কিন্তু সাধারণ ধর্মটি অনুমান করে নিতে হলো। অতএব উপমা হলো বটে, কিন্তু ঠিক যেন পূর্ণ হলো না। উপমা ব্যাপারের মধ্যে এইরকম কিছু লুপ্ত থাকলে তাকে বলা হয় **লুপ্তোপমা**। এখানে তো মাত্র একটি উপাদান লুপ্ত আছে। 'লুপ্তোপমা'-তে মোট চারটির মধ্যে তিনটিও লুপ্ত থাকতে পারে।

আর একটি উপমার দৃষ্টান্ত দেখা যাক্—

"ডুবে যাবার সুখে আমার ঘটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।" —'দিঘি' : রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'ঘট' এবং 'অঙ্গ' যথাক্রমে 'উপমান' এবং 'উপমেয়'। ঘট সুখে ডুবে যায়'—এই কল্পনায় ঘটের নিমজ্জনের কল্পিত ধর্ম হচ্ছে 'সুখ'। অপর পক্ষে, অঙ্গও 'সুখে' ভরে ওঠে! অতএব সুখ হলো সাধারণ ধর্ম ; সাদৃশ্য-বাচক শব্দ 'মতো'-ও এখানে বিদ্যমান। এর নাম 'পূর্ণোপমা'।

শব্দালঙ্কারের আলোচনায় অনুপ্রাসের মালাকে যেমন বলা হয়েছে মালানুপ্রাস, অর্থালঙ্কারের ক্ষেত্রেও তেমনি আছে মালোপমা, মালা-রূপক ইত্যাদি। **একটি মাত্র উপমেয় যেখানে বহু উপমানের সঙ্গে তুলনা-সূত্রে আবদ্ধ হয়, সেখানে মালোপমার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।**

"তোমার বাসাখানি আঁটিয়া মুঠি
চাহেনা আঁকড়িতে কালের খুঁটি।
দেখি যে পথিকের মতোই তাকে,
থাকা ও না-থাকার সীমায় থাকে।
ফুলের মতো ও যে, পাতার মতো,—
যখন যাবে, রেখে যাবে না ক্ষত॥" —'কুটিরবাসী' : রবীন্দ্রনাথ

এই উদ্ধৃতিতে 'বাসা' একমাত্র উপমেয়; যথাক্রমে 'পথিক', 'ফুল' এবং পাতা, এই তিনটি উপমান তার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। এর নাম 'মালোপমা'।

পূর্ণোপমা, লুপ্তোপমা এবং মালোপমার কথা একে-একে বলা হলো। এইবার 'স্মরণোপমা'-র কথা। **সদৃশ অনুভব থেকে সদৃশ বস্তুর স্মৃতি উদ্রিক্ত হলে যে উপমা অলঙ্কার দেখা দেয়, তাকে বলা হয় স্মরণোপমা।** এ অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত এই রকম—

"মেঘের খেলা দেখে কত খেলা পড়ে মনে,
কত দিনের লুকোচুরি কত ঘরের কোণে!
মনে পড়ে ঘরটি আলো মায়ের হাসিমুখ—
মনে পড়ে মেঘের ডাকে গুরু গুরু বুক।" —রবীন্দ্রনাথ

এ শুধু পরস্পর অসংলগ্ন বা অসম্পর্কিত ব্যাপারের স্মৃতিমাত্র নয়। গভীর সাদৃশ্যের সূক্ষ্ম বন্ধন আছে এখানে। মেঘের স্বপ্নময় অন্ধকার স্তূপ,—বর্ষার দিনে অবিরত বর্ষণের রিম্‌ঝিম্‌,—আলোতে কোমল ঘনিষ্ঠতার ভাব, সব কিছু মিলে মনে পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছে। শৈশবে ঘরের কোণে লুকোচুরি,—মায়ের হাসিমুখ,—ছেলেবেলাকার মেঘলা দিন ইত্যাদি সদৃশ অভিজ্ঞতার স্মৃতি জেগে উঠেছে মনে!

'উপমা'-র সঙ্গে 'উৎপ্রেক্ষা' এবং 'রূপক'-এর পার্থক্যটুকু এইবার দেখা দরকার। **'উৎপ্রেক্ষা'**-র বিষয়ে 'সাহিত্যদর্পণে' বলা হয়েছে—"ভবেৎ সম্ভাবনোৎপ্রেক্ষা প্রকৃতস্য পরাত্মনা।" 'প্রকৃত' কথাটির মানে, উপমেয়; 'পরাত্মা' তেমনি উপমান। উপমা-র ক্ষেত্রে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে পরস্পরের পার্থক্য বজায় থাকে, শুধু সাদৃশ্যের বোধ জেগে ওঠে; 'উৎপ্রেক্ষা' যেন আর এক ধাপ এগিয়ে যাওয়া। **উৎপ্রেক্ষাতে সাদৃশ্যের ব্যাপারটা**

এতো বেশি যে, উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না সে বিষয়ে সংশয় জাগে। এতে 'যেন', 'প্রায়', 'মনে হয়', 'বুঝি' ইত্যাদি সাদৃশ্যবাচক শব্দ থাকে বটে, আবার কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এসব নাও থাকতে পারে। যেখানে সাদৃশ্যবাচক শব্দ বজায় থাকে, সেখানে হয় 'বাচ্যা উৎপ্রেক্ষা',—যেখানে না থাকে, সেখানে হয় 'প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা'। মনে রাখা দরকার যে, 'উৎপ্রেক্ষা' কথাটির মানে হলো সংশয় বা তর্কের উৎক্ষেপ। এখানে সাদৃশ্য বোঝাতে গিয়ে উপমান-কে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের বিরহিনী রাধিকার মুখে—'মোর মন পোড়ে যেন কুম্ভারের পণী'—উক্তিটি উৎপ্রেক্ষা হয়েছে। **'সন্দেহ'** বলে আর এক সাদৃশ্যবাচক অলঙ্কার আছে,—তাতে উপমান এবং উপমেয় দুই-ই হয় সংশয়ময়। **ব্যতিরেক**-এর কথাও এই সূত্রে ভেবে দেখা দরকার। **উপমানের চেয়ে উপমেয়ের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ ঘটলে ব্যতিরেক হয়ে থাকে। উপমা-র ক্ষেত্রে উপমানের উৎকর্ষ মাত্র ঘটা সম্ভব,—অপকর্ষ নয়।**

"তার জলচুড়িটির স্বপন দেখে
অলস হাওয়ায় দীঘির জল,
তার আলতা পরা পায়ের লোভে
কৃষ্ণচূড়া ঝরায় দল!"—'কিশোরী' : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

এখানে প্রথম ছবিটিতে দীঘির জলে বাতাস লেগে যে ঢেউয়ের বৃত্ত জেগে ওঠে, কম্পমান সেই জলবৃত্তের চেয়ে সুন্দরী কিশোরীর জলচুড়ির উৎকর্ষ বোঝানো হয়েছে। পরের ছবিতে আলতা-পরা পা এবং রক্তবর্ণ কৃষ্ণচূড়া ফুলের স্খলিত পাপড়ির মধ্যেও পাদু'টিরই উৎকর্ষ ফুটেছে। এই দুটি ছবিতেই 'ব্যতিরেক' হয়েছে। অপর পক্ষে—

"সোনার হাতে সোনার চুড়ি, কে কার অলঙ্কার"! —মোহিতলাল

—এ হলো 'সন্দেহ' অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত।

কবির কল্পনাগুণে যেখানে উপমেয় এবং উপমান দুয়ের সাধারণ ধর্মের অতিনৈকট্য রসিকের মনে উভয়েরই প্রাধান্যের ধারণা জাগিয়ে তোলে, সেখানে সন্দেহ অলঙ্কার ঘটে থাকে।

'রূপক' আর 'সন্দেহ' এই দুটির পার্থক্য এই যে, রূপক 'অভেদপ্রধান'

কিন্তু সন্দেহ 'অভেদসর্বস্ব'। [১] রূপকে উপমান প্রধান। [২] উপমাতে কারও প্রাধান্য না থাকলেও মনে হয় যেন উপমেয়ের দিকেই বেশি নজর থাকে। 'চাঁদের মতন মুখ' হলো উপমার দৃষ্টান্ত। কিন্তু, 'তার মুখচন্দ্র আমার মন উদ্ভাসিত করলো।—এখানে মুখ এবং চাঁদের মধ্যে তুলনাও বোঝানো হচ্ছে, আবার চাঁদের সঙ্গে মুখ যেন এক হয়ে যাচ্ছে। [৩] 'সন্দেহ'-অলঙ্কারে দুয়েরই যেন প্রাধান্য—দুয়ের মধ্যে সাধারণধর্মের নৈকট্য এতো বেশি যে, দুটির মধ্যে কে কার উপমান এবং কে কার উপমেয়, সে বিষয়ে সংশয় জেগে থাকে। [৪] উৎপ্রেক্ষাতেও উপমান প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উৎপ্রেক্ষার যে দৃষ্টান্তটি এখানে দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে রাধিকার বিরহ-অবস্থার মনোবেদনার চেয়ে কুম্ভকারের 'পণী'-র উত্তাপ যেন বেশি মনোযোগ দাবী করছে। যথাক্রমে রূপক, উপমা, সন্দেহ, ব্যতিরেক এবং উৎপ্রেক্ষার এই প্রভেদটুকু মনে রেখে এইবার রূপকের সংজ্ঞা দেখা যাক্—**উপমেয় যেখানে উপমানের মধ্যে প্রায় এক হয়ে মিশে যায়, সেখানে হয় রূপক অলঙ্কার।** শুধু তাই নয়, ক্রিয়া এখানে উপমানেরই অনুগামী হয়। এই কথাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওপরের দৃষ্টান্তে 'উদ্ভাসিত করলো', এই ক্রিয়া 'চন্দ্র', এই উপমানের অনুগামী হয়েছে।

রূপকের কথাসূত্রে 'সাহিত্যদর্পণে' বলা হয়েছে "রূপকং রূপিতারোপাৎ বিষয়েনিরপহ্নবে"; অর্থাৎ বিষয় বা উপমেয়ের অপহ্নব বা নিষেধ না ঘটিয়েও বিষয়ী বা উপমানের সঙ্গে তার অভেদত্ব 'আরোপ' করলে রূপক অলঙ্কার হয়। 'সাঙ্গ' 'নিরঙ্গ', এবং 'পরম্পরিত' এই তিন রকম রূপকের কথা বলা হয়ে থাকে। নিরঙ্গ রূপকের আবার দুই উপশাখা আছে। একটির নাম 'কেবল নিরঙ্গ', অন্যটির নাম 'মালা-নিরঙ্গ'।

'মেঘনাদবধকাব্যে', যেখানে বলা হয়েছে—'লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেল অস্তাচলে,' সেখানে 'লঙ্কা' এবং 'পঙ্কজ',—মেঘনাদ [উহ্য] এবং 'রবি',—মৃত্যু [উহ্য] এবং 'অস্তাচল'—যথাক্রমে এই সব উপমেয় এবং উপমানের মধ্যে অভেদ-কল্পনা দেখা গেছে। ওটিকে রূপকের দৃষ্টান্ত বলতে হবে।

দীননাথ সান্যাল সাঙ্গ-রূপকের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন—**"প্রস্তাবিত রূপকের উপমেয় ও উপমান অবলম্বন করিয়া যখন উভয় পক্ষেই উহাদের অন্যান্য অঙ্গও রূপকে কল্পিত হয়, তখন তাহাকে সাঙ্গ-রূপক বলে।"**

জগদানন্দের পদে আছে—

"নন্দের নন্দন চাঁদ পাতিয়ে রূপের ফাঁদ
ব্যাধ ছিল কদম্বের তলে
দিয়া হাস্য-সুধাচার অঙ্গচ্ছটা আঠা তার..."

—এখানে পাখি ধরবার বৃত্তি-ধারী এক ব্যাধের ছবি দিয়ে রূপক তৈরি হয়েছে। উপমেয়—কৃষ্ণ ["নন্দের নন্দন"], এবং উপমান—"ব্যাধ"। একদিকে 'নন্দের নন্দনের 'রূপ', হাস্যসুধা' এবং 'অঙ্গচ্ছটা',—অন্যদিকে ব্যাধের 'ফাঁদ', 'চার', আঠা', এইগুলিরও অভেদত্ব কল্পিত হয়েছে। তাই এর নাম 'সাঙ্গ-রূপক'—অর্থাৎ অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গীর রূপক, অঙ্গ এবং অঙ্গী উভয়েরই রূপক। 'লজ্জার বারিধি' বল্‌লে পাওয়া যাবে **নিরঙ্গ রূপক**। কারণ, সে উক্তিতে অঙ্গে রূপক নেই, কেবল অঙ্গীই রূপক। মালা-রূপকের প্রসঙ্গে দীননাথ লিখেছেন—**"একই উপমেয় বস্তুকে একাধিক ভিন্ন ভিন্ন উপমান দ্বারা রূপকিত করিলে মালা-রূপক হয়।"**

'শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা, বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না'—বিদ্যাপতিরএ উক্তি হলো মালা-রূপকের দৃষ্টান্ত। আবার, যেখানে একটি রূপক অন্য এক রূপকের কারণ হয়, সেখানে পাওয়া যায় **পরম্পরিত রূপক**। যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায়—

"যদিও সকল হাস্য-ফেন পুঞ্জতলে
জানি ক্ষুব্ধ ব্যথাসিন্ধু দোলে।"

এখানে সমুদ্রভাবনাসূচক 'হাস্যফেনপুঞ্জ' রূপক পরবর্তী 'ব্যথাসিন্ধু'-রূপকটিকে উদ্রিক্ত করেছে।

বর্ণনীয় বিষয়ের সমর্থনের জন্য সমভাবাপন্ন অন্য বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হয়। বিদ্যাপতির প্রসিদ্ধ একটি পদে পর-পর বলা হয়েছে, 'সূর্যের তাপে গাছ যদি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়, তাহলে জলদাতা মেঘের আনুকূল্যে আর কী-ই বা হবে? নবযৌবন যদি বিফলে যায়, তাহলে কৃষ্ণপ্রেমে কী আর হবে!' সে হলো দৃষ্টান্তের উদাহরণ।

কবিকল্পনার গুণে সাদৃশ্য বশতঃ এক বস্তুকে যদি অন্য বস্তু মনে হয়, তবে সেখানে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার ঘটেছে, বলা যাবে।

এতক্ষণ সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের কথাই বলা হলো। বিরোধমূলক অলঙ্কারেরও অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। 'বিরোধাভাস', 'বিষম' ইত্যাদি হলো এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

হঠাৎ দেখলে পরস্পর-বিরোধী মনে হয়, কিন্তু তলিয়ে দেখলে যেখানে সেই বিরোধের অবসান হয়, সেখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার পাওয়া যায়।

এই আপাতদৃশ্য বিরোধের ভাব সমস্ত বাক্যটির মধ্যে ঘটতে পারে, আবার পাশাপাশি দুটিমাত্র শব্দের মধ্যেও তা ঘটা সম্ভব। ইংরেজির Epigram পড়বে প্রথম শ্রেণীর মধ্যে,—Oxymoron পড়বে দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে। "অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর"—রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তিতে 'বিরোধাভাস' ঘটেছে, এবং তা বাক্যগত। বাংলায় শব্দ-ঘটিত 'বিরোধাভাস'কে কেউ-কেউ শুধু 'বিরোধোক্তি' বলেন। 'সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টিমাঝে বহুকাল করিয়াছি বাস'—এখানে 'সৃষ্টিছাড়া' এবং 'সৃষ্টি' পাশাপাশি বসে 'বিরোধোক্তি'র নমুনা হয়ে উঠেছে। কিন্তু নীচের দৃষ্টান্তটিতে 'বিরোধাভাস'ও নয়, 'বিরোধোক্তি'ও নয়,—'বিরুদ্ধ বিন্যাস' বা প্রতিবিন্যাসের নমুনা রয়েছে—

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।"

ইংরেজি Antithesis-এর সঙ্গে এর কিছু সাদৃশ্য আছে।

বর্ণনার মধ্যে কার্য-কারণের বৈষম্যবোধ থেকে চমৎকারিত্ব দেখা দিলে তাকে বলা হয় বিষম অলঙ্কার। "কালো, সে যে আলো করে!" এ কথার মধ্যে এই ধরনের কার্য-কারণগত বৈষম্য দেখা যাচ্ছে।

শৃঙ্খলামূলক অলঙ্কারের মধ্যে 'কারণমালা' এবং 'একাবলী'র কথা স্মরণীয়। 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'—কিংবা 'গাছে গাছে ফুল, ফুলে ফুলে অলি'—প্রথমটিতে কারণমালা, দ্বিতীয়টিতে একাবলী হয়েছে। **একটি কারণ তার কার্যের দ্বারা অনুসৃত হবে, সেই কার্য আবার পরবর্তী কার্যের কারণ হিসেবে দেখা দিয়ে কারণ-পরম্পরা সৃষ্টি করবে; সে রকম ঘট্‌লে কারণমালা হয়।**

স্থায়মূলক অলঙ্কারের মধ্যে অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, প্রতীপ ইত্যাদির কথা বলা হয়। **সামান্যের দ্বারা বিশেষের, বিশেষের দ্বারা সামান্যের,—কার্যের দ্বারা কারণের অথবা কারণের দ্বারা কার্যের সমর্থনের নাম অর্থান্তরন্যাস।** 'মানুষ অমর নহে, তুমিও মরিবে'—এরকম উক্তি এই অলঙ্কারের নমুনা।

অপ্রাসঙ্গিক থেকে প্রাসঙ্গিকের বোধ জেগে উঠে যেখানে চমৎকারিত্ব সঞ্চার করে, সেখানে হয় অপ্রস্তুতপ্রশংসা।

"কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে
কোকিল অখিল প্রিয় সুমধুর গানে।"

—ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তিতে কাক-কোকিল সম্পর্কিত 'অপ্রাসঙ্গিক' দৃষ্টান্তের জোরে, রূপের চেয়ে গুণের দাম বেশি,—এই প্রস্তুত বা 'প্রাসঙ্গিক', সামান্য [general] সত্যের সমর্থন ঘটেছে।

যে সব অলঙ্কারে গূঢ় অর্থের প্রতীতি জাগিয়ে তোলে,—অর্থাৎ সোজা কথায় যা বলা হচ্ছে তার ভেতরে আরো কিছু আছে, এই ধারণাটা যাতে ফুটিয়ে তোলা হয়, সেই সব গূঢ়ার্থ প্রতীতিমূলক অলঙ্কারশ্রেণীর মধ্যে ব্যাজস্তুতিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। **স্তুতির ছলে নিন্দা কিংবা নিন্দার ছলে স্তুতি করলে হয় ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।**

হাজার পৃষ্ঠার বই লিখলেও অলঙ্কারশাস্ত্রের যথার্থ আলোচনা শেষ হবে না। নৈয়ায়িকদের ভাবনা কবিদের সৃষ্টি কতোভাবেই যে ব্যবচ্ছেদ করেছে!

সেকাল থেকে একালে ফিরে এইসূত্রে কবি য়েট্‌সের একটি কথা মনে পড়ে। তিনি এক জায়গায় লিখেছিলেন—কলম নিয়েই হোক্, আর ছেনি নিয়েই হোক্, যে শিল্পী তাঁর কাজ শুরু করেছেন, তাঁকে মনে রাখতে হবে যে পুরোনো শিল্পের নমুনা দেখে-দেখে মৌলিকতার উপায় খুঁজে বেড়ানো তাঁর কাজ নয়। সংসারে এক বেদনার সঙ্গে আর এক বেদনা কখনোই পুরোপুরি মেলে না। একমাত্র সেই অকৃত্রিম বেদনাতেই তাঁর নির্ভর। সেই বেদনা খাঁটি হলে কাব্যও খাঁটি হবে। অলঙ্কারের মৌলিকতাও সেই মৌলিক অনুভূতির দান।

অলঙ্কারশাস্ত্রের কথা শেষ হলো। এইবার একালের কথা।

বাংলা উপন্যাসের কথা

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক জায়গায় লিখেছিলেন—

> "নবেলের বীজ ও মাসিক পত্রিকার বীজ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই আসিয়াছিল;—যাঁহারা উহার আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহা ফলাইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র যেদিন চাষের ভার গ্রহণ করিলেন, সেইদিন উহা জমিতে লাগিয়া গেল, এখন উহার শস্য-সম্পত্তিতে সুজলা সুফলা বঙ্গধরিত্রী ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।"

প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থাকারে [১৮৫৭] প্রকাশিত হবার অনতিকাল পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের সরকারি কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়। যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার পদে ঐ বছরের ৭ই আগষ্ট তারিখে তিনি যোগ দেন। তারপর ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২১-এ জানুয়ারি তিনি নেগুয়ায় [মেদিনীপুর জেলা] বদলি হয়ে ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সেখানকার কাজে যোগ দেন। ঐ বছর নভেম্বর মাসে আবার খুলনায় বদলির হুকুম হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মার্চ পর্যন্ত তিনি খুলনাতেই ছিলেন। এই সময় তাঁর ইংরেজি উপন্যাস 'Rajmohon's Wife' লেখা হয় এবং ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের Indian Field পত্রিকায় [সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র] তা' প্রকাশিত হয়। খুলনায় অবস্থানের সময়েই তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখা শুরু হয়। সম্ভবতঃ ১৮৬৪-র শেষ দিকে বারুইপুরে [চব্বিশ পরগণা] অবস্থানকালে 'দুর্গেশনন্দিনী'র কাহিনী সম্পূর্ণ হয়। 'কপালকুণ্ডলা' এবং 'মৃণালিনী-ও একই সময়ে লেখা হচ্ছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' গ্রন্থাকারে ছাপা হলো ১৮৬৫-তে, 'কপালকুণ্ডলা' ১৮৬৬-তে এবং 'মৃণালিনী' প্রায় আরো বছর তিনেক পরে,—১৮৬৯-এর নভেম্বর মাসে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার আগে, পরপর এই তিনখানি উপন্যাসের জনপ্রিয়তার ফলে তিনি যে বিশেষ উৎসাহ পেয়েছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৮৮৭-এ তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' ছাপা হয়।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব—বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্র।

অর্থাৎ, ১৮৬৪ থেকে '৮৭, মোট এই তেইশ বছরের মধ্যেই ঔপন্যাসিক বঙ্কিম-চন্দ্রের অভ্যুদয় ও পরিণতির কাল প্রসারিত। এর পর তিনি উপন্যাস লেখা বন্ধ করেন। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে তাঁর স্থায়ী প্রভাবের সূচনা ঘটেছিল এই তেইশ বছরের মধ্যে। রমেশচন্দ্র দত্তকে [১৮৪৮—১৯০৯] তিনিই প্রথম বাংলা উপন্যাস লেখার উৎসাহ দিয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' রমেশচন্দ্রের ঐতি-হাসিক উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা' [১৮৭৪] ছাপা হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীর [১৮৫৫—১৯৩২] প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ'-এ [১৮৭৬] পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার ঐতিহাসিক কাহিনী নির্বাচনের মূলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব অনুমান করা অসংগত নয়। দামোদর মুখোপাধ্যায় [১৮৫৩—১৯০৭] 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার হিসেবে 'মৃন্ময়ী' [১৮৭৪] রচনা করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপসংহার 'নবাবনন্দিনী বা আয়েষা'-ও [১৮৯৭] তাঁরই লেখা। বস্তুতঃ বঙ্কিম এবং রমেশচন্দ্রের মধ্যে মনোগঠনের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য সত্ত্বেও এঁদের উপন্যাস-গুলির আদর্শেই সে যুগের বহু উপন্যাস লেখা হয়েছে। ১৮৭০ থেকে ১৮৮২-৮৩ সালের মধ্যে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ আঢ্য, উমাচরণ চক্রবর্তী, গৌরীনাথ নিয়োগী, মদনমোহন মিত্র, শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বিনোদবিহারী গোস্বামী, ললিতমোহন ঘোষ, হারাণচন্দ্র রাহা, রাখালদাস গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, নীলরতন রায়চৌধুরী, হেমচন্দ্র বসু প্রভৃতি অধুনাবিস্মৃত বহু উপন্যাসলেখকের তথাকথিত অসংখ্য 'উপন্যাস' ছাপা হয়েছে।

রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের কাছে উৎসাহ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখার ধারা ছিল স্বতন্ত্র। রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস গ্রন্থাকারে ছাপা হবার আগেই প্রতাপচন্দ্র ঘোষের [মৃত্যু-১৯২১] 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'-এর প্রথম খণ্ড [১৮৬৯] ছাপা হয়। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর [১৮৩৪—১৮৮৯] 'কণ্ঠমালা' [১৮৭৭], 'মাধবীলতা' [১৮৮৪] এবং 'জাল প্রতাপচাঁদ' [১৮৮৩] তিনখানি বইই সেকালে বেশ খ্যাতি পেয়েছিল। ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন—"কণ্ঠমালার বিংশ পরিচ্ছেদে যে 'মহা-কুলীন' উপাধিধারী শুভাগুধ্যায়ী সম্প্রদায় উল্লিখিত হইয়াছে তাহাই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' পরিকল্পনা যোগাইয়া ছিল বলিয়া মনে করি।" তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের [১৮৪৩-১৮৯১] 'স্বর্ণলতা'-র [১৮৭৪] কাছাকাছি সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ছাপা হয়। রমেশচন্দ্রের 'সংসার' এবং 'সমাজ', তারকনাথের 'স্বর্ণলতা', স্বর্ণ-

আদিপর্বের বাংলা উপন্যাসে দেশপ্রেম ও সমাজপ্রসঙ্গ।

কুমারীর 'স্নেহলতা' ইত্যাদি রচনা সাধারণ গৃহস্থ-জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার নানান্ আলেখ্যে সমৃদ্ধ। মানুষের প্রতিদিনের সামাজিক-পারিবারিক সম্পর্কের কথা এবং জীবনের কিছু কিছু ব্যাখ্যানের চেষ্টাও এই সব কাহিনীতে বর্তমান। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির পাশে এরা ছিল দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী। রমেশচন্দ্র বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গ তুলে তবু কতকটা যা'হোক্ মৌলিকতার দাবী করেছিলেন। 'স্বর্ণলতা'-র দশম পরিচ্ছেদে তারকনাথ, নীলকমল ও বিধুভূষণের প্রসঙ্গে লিখেছেন—"তাঁহারা অল্পবয়স্ক, ১৯-২০ বৎসরের বেশি নহে। উভয়েই ব্রাহ্ম। এই গোলযোগের সময় তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন। অর্থাৎ একজন অতি মৃদুস্বরে ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করিতেছিলেন। তাঁহার মুদিত নেত্র হইতে অশ্রুধারা বহিতেছিল। আর একজন হেঁটমুণ্ডে একবার মুদিনীর দিকে সতৃষ্ণনয়নে, আর একবার নিজ সঙ্গীর দিকে সভয়নেত্রে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতেছিলেন।" শুধু এইমাত্র নয়। নীলকমল ও বিধুভূষণের প্রসঙ্গমাত্র মনে রেখে ব্রাহ্মদের সম্পর্কে তারকনাথ আরো ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন—"ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত আছে বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেঁদে কেঁদে চক্ষের জল দ্বারা সে অগ্নিটুকু সত্বরই নির্বাণ করিয়া ফেলেন।" যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু [১৮৫৪—১৯০৫] তাঁর 'মডেল ভগিনী' [১৮৮৬] লেখার সময়ে তারকনাথের নীলকমল-বিধুভূষণ প্রসঙ্গ যে বিস্মৃত হননি, তারও সমর্থন দুর্লভ নয়। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও [১৮৫৯—১৯১১] তারকনাথের কাছে এ বিষয়ে ঋণী ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ব্রাহ্ম-আতিশয্য-বিরোধী 'কল্পতরু-র [১৮৭৪] বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮৪৮—১৯২৫] একাঙ্ক-প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-ই [১৮৭২] হয়তো তারকনাথের প্রেরণার উৎস ছিল। সে যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন সমকালীন নবীন লেখকদের ইতিহাসজ্ঞান ও সৃজনীকল্পনার সমন্বয়প্রয়াসে উৎসাহিত করেছিল, তাঁর সামাজিক উপন্যাসও তেমনি সমকালীন সমাজসম্পর্ক ও সমাজসমস্যার চিন্তায় এবং প্রকাশে বাংলার সে যুগের বহু লেখককে উদ্দীপনা জুগিয়েছিল। শিবনাথ শাস্ত্রীর [১৮৪৭—১৯১৯] 'মেজবৌ' [১৮৭৯], 'যুগান্তর' [১৮৯৫], 'নয়নতারা' [১৮৯৯],—শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের [মৃত্যু ১৯০৮] 'শক্তি-কানন' [১৮৮৭], 'ফুলজানি' [১৮৯৪],—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৬৭—১৯২৩] 'উমা' ইত্যাদি রচনাও বঙ্কিম-যুগসীমার অন্তর্ভুক্ত। পল্লীজীবন,

নগরজীবন, ধর্মসম্প্রদায়গত আচার-বিচার, নরনারীর বৈধ ও অবৈধ প্রণয়, দেশপ্রেম ইত্যাদি সর্ববিদিত প্রসঙ্গ এইসব উপন্যাসের ধারায় বিভিন্ন লেখকের সমাজমনোযোগের সূত্র রক্ষা করেছে। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'স্বর্ণলতা'-র নামপৃষ্ঠায় একটি সংস্কৃত বচন স্মরণ করে ["কথাপি তোষয়েদ্ বিজ্ঞং যস্যসৌ তথ্যবদ্ ভবেৎ"] প্রত্যক্ষ অভ্যস্ত জীবনের বাস্তব ধর্মের প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, সামাজিক উপন্যাসের সেই হলো সর্বদেশীয় আদর্শ। ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং রোম্যান্সের কিন্তু ভিন্ন লক্ষ্য, ভিন্ন রীতি। সমাজের রুচি-আচার-বিশ্বাস পরিবর্তনের সঙ্গে তাদের মূল সংহতি বা 'ঐক্যবিধির' বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। ইতিহাসের মূল ধারা প্রামাণ্য ইতিহাসের পুঁথি থেকেই পাওয়া যায়। বড়ো বড়ো ঘটনাগুলির চেহারা নিয়ে এক পুঁথির সঙ্গে অন্য পুঁথির মতানৈক্য নেই। ইতিহাসের ব্যাখ্যান সম্পর্কে ঐতিহাসিকের স্বদেশ ও স্বকালগত অতিপ্রাধান্য—অর্থাৎ তাঁর আপন স্বাজাতিক পক্ষপাত মাত্রা ছাড়িয়ে যাক্ বা না যাক্, বড়ো বড়ো ঘটনার বর্ণনায় তাঁকে হক্-কথা বলতেই হয়। এই ঘটনাধারার রূপায়ণে নেমে ঔপন্যাসিক তাঁর নিজের বোধ-বুদ্ধি-বিশ্বাস অনুসারে নিজেই হয়ে ওঠেন ইতিহাসের ব্যাখ্যাতা। রাজসিংহের সঙ্গে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ,—এইটুকু ঐতিহাসিক তথ্য সম্বল করে সেকালের উচ্চপদস্থ কয়েকটি মানুষের মনঃসংঘাতের কাহিনী লিখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। আওরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেবউন্নিসা, এঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক চরিত্র। চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারী, মাণিকলাল প্রভৃতি কল্পিত ব্যক্তি এই দেশ-কাল-রুচির বেষ্টনীর মধ্যে জায়গা পেয়ে সার্থক হয়েছেন। একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধের উত্তেজনা-উদ্দীপনা ও ভয়াবহতার পটভূমিকায় মানুষের বিরহ-মিলন, শৌর্য-বীর্যের কাহিনী তার সম্ভাব্য স্বরূপ হারায়নি। ঘটনার কঙ্কালের সঙ্গে ঐতিহাসিকের বর্ণিত যুগরুচির রঙ্টুকুও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন। ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনা নিয়ে আত্মশক্তির প্রসাদে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র লেখক এইভাবে অগ্রসর হতে পারেন। কল্পনার বিশ্বস্ত সহযোগিতাই তাঁর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সেই কল্পনাই তাঁকে তাঁর উপন্যাসের কাহিনী-সৃষ্টির প্রেরণা দেয়। রাজা-রাজড়ার যুদ্ধের পাশে-পাশে

রোম্যান্স ও ঐতিহাসিক উপন্যাস ;—সামাজিক উপন্যাস;—'ঐক্য' ও সৌষ্ঠব।

সাধারণ মানুষের জীবনের কথা তিনি বর্ণনা করেন। কাহিনীর সংহতি বা 'ঐক্য' বিধানের জন্য একটি নির্দিষ্ট কালপর্বের বিস্তারে তিনি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে পারেন। অর্থাৎ, 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' কাহিনী-পরিকল্পনাগত 'ঐক্যে'র আদর্শ কতকটা স্থায়ী আদর্শ। কিন্তু সামাজিক উপন্যাস তেমন নয়। এ-রাজ্যে কাহিনীর বিষয়গত, প্রসঙ্গগত বা তথ্যগত বাস্তবতা যেমন সতর্কভাবে রক্ষা করা দরকার,—ভঙ্গি, রীতি, শিল্পকলার নব নব উদ্ভাবনী সামর্থ্যের দিকেও তেমনি লেখকের সদাসক্রিয় মনোযোগ আবশ্যক।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কিশোর রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত উপন্যাস 'করুণা'য় একই সঙ্গে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ছায়া এবং 'চোখের বালি'র পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছেন কোনো কোনো সমালোচক। বলা বাহুল্য, 'করুণা'-র গল্পবস্তু বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যচিন্তা ও শিল্প-রীতির এলাকা অতিক্রম করতে পারেনি। বিশেষভাবে বঙ্কিমী এলাকার অধীন রবীন্দ্রমানসের কৈশোরক কল্পনার দুর্বলতা ওতে সঞ্চিত আছে। রামেন্দ্র-সুন্দর লিখেছিলেন—

> "বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী আর কৃষ্ণকান্তের উইল,…এই চারখানি গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এক। প্রতাপ ও নগেন্দ্র, অমর-নাথ ও গোবিন্দলাল, সকলেই কুসুমসায়কের লক্ষ্য হইয়াছিলেন; ধর্মবুদ্ধির দৃঢ়তা ও প্রবৃত্তির তীব্রতার তারতম্যানুসারে কেহ বা জয়লাভ করিয়াছিলেন, কেহ বা পারেন নাই।"

'কুসুমসায়কে'র আঘাত বর্ণনার সঙ্গে তৎকালীন শিক্ষিত হিন্দু-সমাজের নীতিবোধের দিকে দৃষ্টি রেখে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাসে এক রকম প্রণয়নীতিমূলক পরিকল্পনা স্বীকার করেছিলেন বললে সত্যের অপ-লাপ হয় না। সে-যুগের সামাজিক উপন্যাসে এই ছিলো সর্বানুসৃত পরিকল্পনা, —গল্পবস্তুর সর্বপালিত 'ঐক্যবিধি'। অর্থাৎ গল্পের মধ্যে বাস্তব লাভ-ক্ষতি, কলহ-বিক্ষোভ, শান্তি-অশান্তি, সমাজ-সংসার সব কিছুই জায়গা পেয়েছে বটে, কিন্তু সব কথারই মূলে আছে প্রণয়কথা। প্রধানতঃ এক-একটি ভালোবাসার গল্পের সুতোতেই সংসারের নানা ছবির মালা গাঁথা হয়েছে। তারপর, বঙ্কিম-

চন্দ্রের সময় থেকে অগ্যাবধি আমাদের লোকাচার ধীরে ধীরে বদলেছে। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র এবং 'চোখের বালি'র প্রণয়-নীতির মধ্যে নীতিগত বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই বটে, কিন্তু—সহানুভূতিগত পার্থক্য অকাট্য। তবু, 'চোখের বালি'তেও [১৯০২] লেখকের সৃজনী পরিকল্পনা মূলতঃ প্রণয়াখ্যানের ঐতিহ্যই মেনে নিয়েছে। অপর পক্ষে, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রভৃতি বঙ্কিমযুগের একদল লেখক সামাজিক বা ব্যক্তিগত কয়েকটি অনাচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আদর্শকেই তাঁদের রচনার মূল লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছিলেন। তাঁদের গল্পেও প্রেমের প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু প্রেমই সেসব ক্ষেত্রে মুখ্য নয়, প্রধান নয়। সম্ভবতঃ ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় [১৭৮৭-১৮৪৮], প্যারীচাঁদ মিত্র [১৮১৪-৮২], কালীপ্রসন্ন সিংহ [১৮৩০-৭০], রামনারায়ণ তর্করত্ন [১৮২২-৮৬], মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-৭৩] প্রভৃতি লেখকের ভিন্নজাতীয় গগুরচনার বিশেষ আবেদন থেকেই উত্তরকালের এই ব্যঙ্গধর্মী উপন্যাসের রেওয়াজ চালু হয়েছিল। উপন্যাসের পরিকল্পনাগত 'ঐক্যবিধি'র [Law of Unity] বিচারে এটি যে একটি স্বতন্ত্র ধারা, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এঁদের লেখাতেও স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়-কথার আকর্ষণ আছে বটে, কিন্তু সেইটিই মূল বা মুখ্য আকর্ষণ নয়। সামাজিক বা ব্যক্তিগত কোনো-কোনো ত্রুটি ও অনাচারের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বর্ষণ করা-ই এঁদের স্বভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে কিন্তু প্রণয়ের আধ্যাত্মিক সত্যই অপেক্ষাকৃত বেশি স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-প্রদর্শিত প্রণয়মুখ্য পরিকল্পনা স্বীকার করে সেই সঙ্গে তাঁর আপন যুগসমুখ প্রগতির কথা যোগ করেছেন। পরের যুগে শরৎচন্দ্র ছিলেন সেই পথেরই পথিক। তবে, প্রণয়মুখ্যতা সত্ত্বেও 'দেবদাস' আর 'চরিত্রহীনে'র মধ্যে বিচার-ব্যাখ্যানগত পার্থক্য আছে। 'পথের দাবী'তে ব্যক্তিগত প্রণয়ের অতিশায়ী অন্য এক পরিকল্পনার আদর্শ চোখে পড়ে। তেমনি দেখা গেছে রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়ে'। 'চতুরঙ্গ' বইখানির পরিকল্পনা ঠিক প্রণয়মুখ্য বলা সংগত হবে না। আবার, 'আনন্দমঠ' কতকটা ঐতিহাসিক হলেও তা' 'চার অধ্যায়ে'র সমধর্মী নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই বইখানির বাস্তব আলেখ্য-সম্পদের মাধ্যমে বাঙ্গালীর দেশাত্মবোধময় পৌত্তলিকতা উদ্‌বোধনে সাফল্যলাভ করে সমকালীন রাজনৈতিক প্রেরণাকে যে-পথে চালনা করেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামাজিক

গল্পের বিষয়ভেদ এবং 'ঐক্যের' বিচিত্রতা।

উপন্যাস 'গোরা'র পরিকল্পনায় সেই পূর্বপথের পুনর্বিচারলব্ধ নবতর যুগসূচক সর্বসমন্বয়াত্মক বিশ্বাত্মবোধকেই আদর্শ হিসেবে স্বীকার করেছেন।

'ঐক্যের' বিষয়ভেদ ও প্রকাশের বিচিত্রতা।

উপন্যাসের বিষয় বা প্রসঙ্গগত এই ঐক্যবিধির বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পরীতিগত বিচিত্রতা স্বতঃই উৎসারিত হয়েছে। লেখকরা নিজেদের সমকালীন পাঠকরুচির প্রতি নিত্যজাগর মনোযোগের ফলে তাঁদের পৃথক পৃথক সামর্থ্য অনুসারে লেখার ভঙ্গি বদলেছেন। অম্বিকাচরণ গুপ্তের 'পুরাণো কাগজ' [১৮৯৯] আজ বিস্মৃত রচনা। কিন্তু এই উপন্যাসের শিল্পরীতির মধ্যে অভিনবত্বের প্রয়াস ছিল। পুরোনো দলিল, চিঠিপত্র ইত্যাদির বিন্যাস মাত্র অবলম্বন করে অম্বিকাচরণ গল্প বলে গেছেন। তাঁর আগে নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বসন্তকুমারের পত্র' [১৮৮২] বইখানিতে অনুরূপ পত্ররীতি প্রয়োগ করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় [১৮৪৭-১৯১৯] রূপকথার ভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে', 'শেষের কবিতা'—প্রত্যেকটিতে পৃথক শিল্পরীতি দেখা গেছে। সে তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র উভয়েই এদিকে যেন অপেক্ষাকৃত বৈচিত্র্যহীন। চিত্তচমৎকারী গল্পের টানে তাঁদের খুঁটিনাটি শিল্পবিচ্যুতি বা শিল্পাভাব পুষিয়ে গেছে।

উপন্যাসে গল্পের গৌরব।

প্রাচীন কালের স্রষ্টা ও সমালোচক, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই উপন্যাসে গল্পবস্তুর প্রাধান্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। চরিত্র, মনস্তত্ত্ব, সমাজ-চেতনা, —সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক ব্যাপারে তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি প্রসঙ্গ মনোযোগ দাবী করছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। তথাপি, আজ পর্যন্ত গল্পের আকর্ষণই হলো উপন্যাসের প্রধান ধর্ম। অন্ততঃ বাংলা উপন্যাসের প্রসঙ্গে একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। 'ঐক্যবিধি' কথাটি বর্তমান আলোচনায় মূলতঃ এই গল্পবস্তুর সৌষ্ঠবভিত্তির আদর্শ বা বিধি অর্থেই প্রয়োগ করা হচ্ছে। সব দেশেই ভালোবাসার গল্পের বিশেষ আকর্ষণ আছে। এ আকর্ষণ সনাতন এবং সর্বদেশীয়। সেজন্য গল্পের মধ্যে অন্যান্য যতো কথাই থাক্ না কেন, সকলের মূলে প্রণয়-কথার কিছু-না-কিছু সিঞ্চন প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। তবে, প্রণয় ব্যতিরেকেও যে উপন্যাস লেখা অসম্ভব হয়নি, তারও দৃষ্টান্ত আছে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগের উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কথাই ধরা যেতে পারে।

সার্থক উপন্যাসের দৃষ্টান্ত হিসেবে এ-বইখানির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে না। এ রচনার ত্রুটি-বিচ্যুতি-অক্ষমতার কথা একালের সাহিত্যানুরাগী বালকেরও সুবিদিত। পণ্ডিতরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, এতে না আছে সুবিন্যস্ত কাহিনী, না আছে 'মানব হৃদয়ের গোপনতম প্রদেশের চিত্র'। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সংক্ষেপে সার কথা বলেছেন—"আলালের ঘরের দুলাল প্রথম পূর্ণাবয়ব উপন্যাস এবং বাস্তব রসে বিশেষ সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাকে খুব উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাসের মধ্যে স্থান দিতে পারা যায় না।"

আগে গল্পেরই আকর্ষণ,—তারপর কালক্রমে চরিত্র, মনস্তত্ত্ব, সমাজ-বিতর্ক ইত্যাদির স্বীকৃতি,—উপন্যাসের পরিণতির ইতিহাসে তার সৌষ্ঠবের ভিৎ বদলেছে এই রুচিবিকাশের ধারায়। এবং এই সৌষ্ঠবের কথা ভাবতে বসলেই যুগে যুগে উপন্যাসের অন্তর্লীন পরিবর্তনশীল যে 'ঐক্য'-পরিকল্পনার কথা মনে পড়ে, বর্তমান আলোচনায় তারই নাম দেওয়া হয়েছে, 'ঐক্যবিধি'। উপন্যাসের বিষয়গত এই সংসৃষ্টি বা ঐক্যের বিচিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-রীতিগত বিচিত্রতা যে স্বতঃই উৎসারিত হয়, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। আপাততঃ শিল্পরীতির ব্যাখ্যা স্থগিত রেখে 'ঐক্যবিধি' কথাটির বাঞ্ছিত অর্থ আরো সুপরিস্ফুট করবার চেষ্টা করা যাক্।

প্রথমতঃ, গল্প ও উপন্যাসের 'ঐক্য' হলো মূলতঃ গল্পেরই বাঁধুনি। এই বাঁধুনি-ব্যাপারটি গল্পকারের বোধ-বুদ্ধি-কল্পনার দ্বারা শাসিত হয়ে থাকে। কবিরা যেমন এক-একটি মূল অভিজ্ঞতার স্পন্দন থেকে সম্পূর্ণ এক-একটি কবিতার শিল্পকর্ম নির্বাহ করে থাকেন, গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকরাও তেমনি আপন-আপন প্রবণতা অনুসারে ব্যাখ্যার অনধিগম্য এক-এক রকম মূল রসচেতনার তাগিদ থেকে তাঁদের গল্প-উপন্যাসের শিল্পকর্মের অভিমুখে, অর্থাৎ, রচনার আসল কাজে অগ্রসর হন। স্রষ্টার ব্যক্তিসত্তা এবং তাঁর পারিপার্শ্বিক যাবতীয় ব্যাপারের সমবায়ে এই সৃষ্টির সাধনা ধীরে ধীরে রূপ নেয়। সেই মূল তাগিদের বশে শিল্পী যখন বিশেষভাবে উপন্যাস-বাহনেই আত্মপ্রকাশের পথ বেছে নেন, তখন, প্রধানতঃ গল্পের মধ্য দিয়েই তাঁর স্পষ্ট ও অস্পষ্ট যাবতীয় মন্তব্য এবং ইঙ্গিত প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর অনুভূতি যা-কিছু দেয়, তাঁর মস্তিষ্ক যে

ঐক্য—বাঁধুনি।

সবই বিনা প্রতিবাদে, বিনা বিচারে গ্রহণ করে, তা নয়। শিল্পীর কলমে জেগে থাকেন সতর্ক এক প্রহরী। উপন্যাস-শিল্পীকে মনে রাখতে হয় যে, তিনি প্রধানতঃ গল্প বলতে বসেছেন। তাঁর সেই গূঢ় রসচেতনা প্রকাশিত হতে চায় গল্পের মধ্য দিয়ে। গল্প এলোমেলো ব্যাপার নয়। তাতে বাহ্যতঃ যতো শৈথিল্যই থাক্ না কেন, লেখকের মূল অভিপ্রায়ের অনুগামিতা করা ছাড়া তার কোনো অংশরই গত্যন্তর নেই। অতএব গল্পের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ভাবনার শাসন প্রবর্তিত হয়। এই শাসনপ্রকরণ অতঃপর আর ব্যাখ্যার অনধিগম্য বিষয় নয়; কারণ, এইখানে পৌঁছে শিল্পীর বোধ যুক্ত হয় বুদ্ধির সঙ্গে। বাস্তব সম্ভাব্যতার সংগতির আদর্শ মনে রেখে তাঁর কল্পনাকে তিনি কাজ করতে দেন। তিনি যা বলতে চাইছেন, সেটা সম্যক ভাবে বুদ্ধির আয়ত্ত করে নিয়ে,—অর্থাৎ তাঁর পরিচিত সমাজ-সংসারের প্রতিচ্ছবির মধ্যস্থতায় এবং সাধারণ সম্ভাব্যতা-বোধের আনুগত্য স্বীকার করে যথোচিত ভাষায় তা' ফুটিয়ে তুলতে হয়। এইভাবে লেখকের অন্তর্লীন এক কেন্দ্রীয় বোধ থেকে গল্পের কেন্দ্রীয় ঐক্য নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিশ্বের সাহিত্য-বিবর্তনের ধারায় অন্যান্য রূপের তুলনায় উপন্যাস হলো অপেক্ষাকৃত আধুনিক সৃষ্টি। বাংলায় উপন্যাসের শতবর্ষ অতিক্রান্ত হতে এখনো কয়েক বছর বাকি আছে। 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়,'—'আলালের ঘরের দুলাল,'—'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ইত্যাদি সমাজচিত্র রূপায়ণের পরে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উনিশের শতকের সপ্তম দশকে এই শিল্পরূপ প্রথম পরিণত রূপ লাভ করে। ইতোমধ্যে এই নতুন সাহিত্য-প্রকারের নির্মিতি সম্পর্কে বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকসমাজ বিশেষ কোনো গূঢ় কথা উদ্‌ঘাটন করেন নি। সমলোচকরা এর বিশ্লেষণ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁরা তো অপেক্ষাকৃত বারমহলের বাসিন্দা। স্রষ্টার নিজের স্বীকৃতি দুর্লভ। কিছুদিন আগে 'গল্প লেখার গল্প' [১৩৫৩] নামে বাংলায় যে বইখানি ছাপা হয়েছে, সেটি ফরমাসী লেখার সংগ্রহ হলেও উল্লেখযোগ্য। পূর্বগামীদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ কিছুই বলেন নি; রবীন্দ্রনাথ সামান্য কিছু-কিছু ইশারা দিয়েছেন; শরৎচন্দ্রই এঁদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি কথা জানিয়েছেন। তাই, উপন্যাসের শিল্পকর্ম সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের নিজের কথা জানতে হলে এখনো আমাদের বিদেশী স্রষ্টার দ্বারস্থ হতে হয়। ইংরেজি সাহিত্যের সমকালীন এক আলোচক বলেছেন—

"অন্যান্য শিল্পের মতো উপন্যাসসৃষ্টিতেও শিল্পীর চৈতন্যে দেখা দেয় 'অচঞ্চল বোধকেন্দ্র'। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার স্মৃতিময় সেই কেন্দ্রে নিমগ্ন এক-একটি ভাবকণিকার মধ্যেই তাঁর উপন্যাসের বীজ নিহিত থাকে।" ১

বাংলায় শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্রের মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে উপন্যাসের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে এমনি দু'একটি ইশারা পাওয়া যায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর তারিখের একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

"অনেক বড় জিনিস বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সংবরণ করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম অনেক লোভ দমন করতে হয়, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আঁকা হয়।"

[৭ই ভাদ্র, ১৩২৬]

অবশ্য, ঔপন্যাসিকের মনে তাঁর উপন্যাসের সংহত ধ্যানটি শুরুতেই বীজাকারে সম্পূর্ণভাবে থাকে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। তবে, বিদেশী সাহিত্যের নজির তুলে এবিষয়ে কিছু আলোচনা করা দুঃসাধ্য নয়। থ্যাকারে যখন তাঁর Waverley-কাহিনী লেখেন, তখন গল্পের কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাই তাঁর মনে ছিল না। ডিকেন্সের The Pickwick Papers সম্বন্ধেও একই কথা শোনা যায়। লেখা আরম্ভ করে লেখকরা ক্রমশ লিখতে-লিখতে নানা কথার সমাহারময় গল্পের পরিপূর্ণতায় এসে পৌছোন।

উপন্যাসের বীজ—শরৎচন্দ্র, ডিকেন্স, থ্যাকারে ইত্যাদির কথা।

শরৎচন্দ্রের আর একখানি চিঠিতে গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্যটি দেখা গেছে—"এই কথাটা বলতে চাই, আরম্ভটাই সকলের চেয়ে শক্ত, এইটার উপরেই প্রায় সমস্ত বইটা নির্ভর করে।" হয়তো, পূর্বোক্ত "মূল

১। There is a still centre for the novelist as for any other artist. ...Its [উপন্যাসের] genesis is the image, or isolated images which have become embedded in the mass of accumulated material in the author's 'centre'.—Fifty Years of English Literature [1900-1950]. By R. A. Scott James [1951] p. 180.

রসচেতনার” প্রথম প্রকাশচেষ্টার কথাই তিনি ভেবেছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই কথা ভেবেই তিনি একথা লিখেছিলেন। যথার্থ তাগিদের জন্য বিশেষ লগ্নের দরকার। স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র উপন্যাসসৃষ্টির ব্যাপারে প্রেরণা বা inspiration-এ বিশ্বাসী ছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিলের এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন—

> "একছত্র লেখা বার হয় না এ কি বিশ্রী দেশ। গত ৪।৫ দিন ক্রমাগত কলম নিয়ে বসি আর ঘণ্টা দুই চুপ করে থেকে উঠে পড়ি। এখন মনে হচ্ছে বুঝি বা আর কখনো লিখতেই পারবো না।"

অর্থাৎ সে সময়ে তাঁর প্রেরণায় ভাঁটা পড়েছিল। কিন্তু সে কথা যাক। স্রষ্টার কলমে গল্পের পরিপূর্ণ রূপ একটি পূর্ণ সংহত ধ্যান থেকেই সঞ্চারিত হোক্, আর পৃথক-পৃথক অবকাশে কল্পিত পরস্পরবিছিন্ন খণ্ড-খণ্ড রচনার সমাবেশ রূপেই উৎপন্ন হোক্, একথা সকল অবস্থাতেই স্বীকার্য যে, গল্পটি সু-আরব্ধ, সুপরিণত, সু-বিন্যস্ত এবং ঐক্যময় অখণ্ড সৃষ্টি হয়ে ওঠা চাই।

উপন্যাসে মনঃসমীক্ষা।

মনোবিকলন ও মনস্তত্ত্ব অনুশীলনের দিকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আমাদের আগ্রহ বাড়ার ফলে এবং তার আগেই চরিত্র রূপায়ণের দিকে লেখকদের মনোযোগ বেশি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে, চরিত্র-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিশ্লেষণের রেওয়াজ চালু হয়েছে একালের উপন্যাসে। মনের চেতন, অবচেতন, অচেতন প্রভৃতি স্তরভেদ বা স্তরবৈচিত্র্যের কথা আজকাল সকলেরই পরিচিত। সমকালীন পাঠকের এই বিশেষ আগ্রহের সামগ্রী মনোবিজ্ঞানের দিকে ঔপন্যাসিকের ঝোঁক পড়াটা খুবই স্বাভাবিক। এই ঘটনার সঙ্গে উপন্যাসের ঐক্যাদর্শগত পরিবর্তনের প্রসঙ্গটি জড়িত বলেই এখানে সে কথার উল্লেখ করতে হলো। বিশেষ কোনো চরিত্রের মনোবিশ্লেষণই যখন ঔপন্যাসিকের প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হয়, তখন বেশি লোকের ভিড় আর কোনোমতেই সহ্য করা চলে না। অবশ্য, বাংলা উপন্যাসে মনোবিশ্লেষণের ঠিক এরকম আত্যন্তিক ঝোঁক এখনো তেমন বেশি চোখে পড়ে না। মনোবিশ্লেষণের দিকে বেশি সজাগ থেকে গল্প লিখতে বসলে সে গল্পের মনোবিশ্লেষণমুখ্য ঐক্যাদর্শের খাতিরেই জীবনের বিস্তীর্ণতর অভিব্যক্তিসাধন সম্ভব নয়। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে বেশি লোকের,

—কিংবা অবান্তর ঘটনার জায়গা দেওয়া লেখকের সাধ্যের অতীত। কারণ, সেরকম ভিড় বাড়ালে তাঁর অভিপ্রেত বিশ্লেষণের কাজে বাধা পড়ে। যে মনের বা মনঃসমষ্টির ভাবধারা ফুটিয়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন, সেখান থেকে আরো ব্যাপকতর ক্ষেত্রে মনোযোগ ছড়িয়ে পড়লে উপন্যাসের 'ঐক্য' নষ্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

তথাকথিত বাস্তবতার দিকেও এযুগের সামাজিক উপন্যাসের লেখক-সম্প্রদায়ের নিষ্ঠা বেড়েছে। জীবনে যা-কিছু ঘটে, উপন্যাসে সকলেরই জায়গা আছে। অবাঞ্ছিত, অনিশ্চিত, অনিয়মিত, আপতিক ঘটনাও তো আমাদের জীবনে বিরল নয়। কার্যকারণের শৃঙ্খলা সব সময়েই যে আমরা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে পারি, তাও নয়। আগের যুগের লেখক-পাঠকসম্প্রদায়ই যে তা' পারতেন, তাও নয়। তবু, আগের যুগে পাপ-পুণ্যবোধ, ঈশ্বরের কল্যাণময়তার ধারণা ইত্যাদি বিষয়ে জনসাধারণের মধ্যে নির্দিষ্ট বিশ্বাস ছিল। ফলে, জীবনের বিচিত্রতার মধ্যেও সুসীম, সুষম রূপ-কল্পের [pattern] বোধ হারায়নি। বর্তমানে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অভিজ্ঞতার জগতে আদ্যন্তবিস্তারিত সুসামঞ্জস্য ও সৌষ্ঠবের বোধ সমানুপাতে কমেছে। জীবন সম্বন্ধে লেখকদের এই নতুন ধারণা প্রতি-ফলিত হচ্ছে একালের প্রকৃত 'আধুনিক' উপন্যাসে। এই শিথিল বিশ্বাসের ফলে গল্পের পূর্বাচরিত বাঁধুনিও বহু ক্ষেত্রে শিথিল হয়ে গেছে। 'ঐক্যবিধি'র প্রাক্তন আদর্শ থেকে সে হলো আর একরকম স্খলন। স্খলন বটে,—কিন্তু প্রকৃতি অন্যভাবে তার ক্ষতিপূরণ করেছেন। উপন্যাসের শিল্পবিবর্তনের ধারায় গ্রহণ ও বর্জন, স্ফুরণ ও বিলোপ নিত্যই ঘটেছে।

আধুনিক উপন্যাসে আধুনিক জীবনবোধের ছায়া ;—অনিশ্চয়তা ও সংশয়ের প্রতাপ।

একালে যেমন বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী প্রভৃতি সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসের রেওয়াজ দেখা যাচ্ছে, আঠারোর শতকে ইংরেজি সাহিত্যে তেমনি সামাজিক রীতি-নীতি বা আচার-ব্যবহারের ঈষৎ বিদ্রূপাত্মক সমালোচনাময় উপন্যাসের রেওয়াজ ঘটেছিল। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Fanny Burney-র লেখা Evelina বইখানি প্রকাশিত হয়। এই মহিলার অনুসৃত আদর্শে লেগেছিল পূর্বোক্ত যুগরুচির প্রভাব। পুরুষ-লেখকদের হাত

অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে 'কমেডি অব্ ম্যানাস্'।

থেকে মহিলাদের হাতে এইভাবে আচার-ব্যবহারের সমালোচনামূলক Comedy of Manners-এর ধারা সে দেশে হস্তান্তরিত হয়েছে। Jane Austin ছিলেন এই ধরনের মহিলা-ঔপন্যাসিকদের শীর্ষতমা। বাস্তব চরিত্রের বিশেষ বিশেষ অভ্যাস-আচরণের অসংগতি, হাস্যকর বিশেষত্ব ইত্যাদি লক্ষণের ওপর এঁরা রং ফলাবার ব্রত নিয়েছিলেন। এঁরা গল্পকে নিঃসৃত হতে দিতেন চরিত্রের চিন্তা-ভাবনা-কার্যকলাপের ফল হিসেবে। বিভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্রগত সংঘাতই ছিল এঁদের গল্পের 'ঐক্য'-নিয়ন্তা।

আমাদের উপন্যাসের আখ্যানগত ঐক্যের ভিৎ বা গল্পের বাঁধুনি এইভাবে বারবার বদলেছে। নতুন যুগের নতুন চিন্তা পুরোনো দিনের পরিচিত চিন্তার জায়গা দখল করেছে। কাহিনীর বাঁধুনি ঘটাবার জন্যে রাজনৈতিক বা সামাজিক সাধনার কোনো একটি পর্ব বা প্রসঙ্গ,—মনস্তত্ত্বের এক বা একাধিক বিশেষত্ব—বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত বা কল্পিত কোনো সত্য ইত্যাদি ব্যাপারের কেন্দ্রীয় প্রাধান্য-এ যুগে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে।

প্রথম যুগে ছিল অবিমিশ্র গল্পেরই আকর্ষণ,—দ্বিতীয় যুগে দেখা দিলো চরিত্রের প্রাধান্য,—বর্তমানে এসেছে মনোরহস্য বর্ণনার ঝোঁক, রাজনৈতিক আগ্রহ। এইসব উপাদান থেকে উপন্যাসের সংহতি বা ঐক্যের ধারণা নতুন রূপ নিচ্ছে। স্বাধীনতা লাভের পর গত সাত-আট বছরের মধ্যে বাংলায় কতো যে উপন্যাস ছাপা হয়েছে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই। মহাকালের সুনিশ্চিত সম্মার্জনীর আঘাতে মৌশুমী ফুলের মতো এইসব লেখার বেশির ভাগই যাবে বিস্মৃতিলোকে। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, এইসব নশ্বর দর্পণে সাম্প্রতিক বাঙালী জীবনের পরিদৃশ্যমান বর্তমান অল্প-বিস্তর প্রতিফলিত হচ্ছে। লেখকরা যথাসাধ্য নতুন চেতনার চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করছেন। মনস্তত্ত্ব এবং রাজনীতি,—প্রধানতঃ এই দুটি দিকে তাঁদের বেশি মনোযোগ দেখা যাচ্ছে। কাহিনীর ঐক্যবিধানে এঁরা নবতর রীতির পথ বেছে নিয়েছেন। নবযুগের কর্মচাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের পরিধি বেড়ে যাওয়ার ফলে, আমাদের নতুনতর উপন্যাসে কাহিনী-পরিকল্পনার কিছু কিছু নতুনত্ব যে ঘটবে, সে তো প্রত্যাশিত ব্যাপার। সে সব লক্ষণ যথা-স্থানে আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। এখন, এই পরিবর্তমান ঐক্যাদর্শ

আধুনিক উপন্যাসে রাজনীতির প্রভাব।

সম্বন্ধে একজন আধুনিক ইংরেজ সমালোচকের একটি কথা স্মরণ করে উপন্যাসের আনুষঙ্গিক অন্যান্য শিল্পরীতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু করা যেতে পারে। ইংরেজ সমালোচক যা লিখেছেন তার বঙ্গানুবাদ করলে এই রকম দাঁড়ায়—

> "আদর্শের দিক থেকে অনেক কম পরিমাণে হলেও কার্যতঃ বাঁধাধরা ছাঁদের ওপর বিশ্বাস বাতিল হয়েছে বহু পরিমাণে, তার ফলে [উপন্যাসে] এখন শক্ত কাঠামোর অভাব।
>
> ...ঐক্যবিধির প্রসঙ্গে ফিরে এসে বলতে হয় যে, এই আইন অমান্যের ফলে [জীবনের বাস্তবক্ষেত্রে এরকম ঐক্য নেই বলেই] কোনো ব্যাপক অরাজকতা দেখা দেয়নি। বরং পূর্ববিধির পরিবর্তে নতুন এক 'ঐক্য'-ধারা মেনে নেওয়া হয়েছে। কোথাও রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক, কোথাও-বা মনস্তাত্ত্বিক 'ঐক্য' দেখা দিচ্ছে। উভয় ক্ষেত্রেই চরিত্রের চেয়ে চরিত্রের পারিপার্শ্বিক অবস্থা-প্রভাবের দিকেই বেশি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।"[২]

সরস বর্ণনার সামর্থ্য হলো শিল্পীর সহজাত সম্পদ। অনুশীলন বা সাধনার দ্বারা এ শক্তি একেবারে কিছুই যে না পাওয়া যায়, তা নয়; কিন্তু কেবল চর্চার ওপর খুব বেশি আস্থা রেখে প্রকৃত সৃষ্টিসামর্থ্যহীন ব্যক্তির পক্ষে ঔপন্যাসিক-খ্যাতি অর্জনের উচ্চাশা পোষণ করাও নিষ্ফল। ঔপন্যাসিকের পক্ষে সাধনা নিষ্প্রোজন নয়। নিঃসন্দেহে সাধনা দরকার। জন্মগত দক্ষতা-টুকুই সব নয়, চূড়ান্ত নয়। বিশেষ বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করে নিতে হয় লেখককে। লেখক নিজে কতোটা বলবেন, আর, পাঠকের কল্পনার ওপরেই

২। "Belief in desiga has been largely discarded in practice, although much less in theory, and a result of this is the absence of a framework in the novel...

...Reverting to the canon of unity, we do not find that the discarding of this law, because it is untrue to life, has resulted in chaos. Instead a set of new 'unities' has been adopted. Here we find political or social unity : there we have psychological unity. In both cases the interest lies in the circumstances by which a character is conditioned rather than in the character.'—CONTEMPORARY LITERATURE 1880—1950 By Peter Westland : vol.vi, pp.16-17.

বা কতোটা নির্ভর করলে চলবে,—সে বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বোধ পেতে হয় অভিজ্ঞতা থেকে, অক্লান্ত চর্চা থেকে। গল্পটি কোন্ জায়গা থেকে শুরু করলে বর্ণনীয় কাহিনী গোড়া থেকেই কৌতূহলোদ্দীপক মনে হবে এবং ভূমিকা থেকে উপসংহার পর্যন্ত পাঠকের প্রতীক্ষার টান থাকবে অটুট, সে জ্ঞানও অনুশীলনসাপেক্ষ সামগ্রী। তাছাড়া, সংলাপের মাত্রা, বর্ণনার সীমা, মূল কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর সম্পর্কবোধ, গদ্যের রীতি ইত্যাদি আরো অনেক বিষয় আছে যা বিনা-চর্চায় ঠিক ঠিক আয়ত্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। উপন্যাসের এই সব কলাকৌশলের আলোচনা 'শিল্পরীতি' প্রসঙ্গের এলাকাভুক্ত। অবশ্য, শিল্পের ভাব-উপাদান এবং রীতি-উপাদান বলে পৃথক দুটি উপাদানের কথা তোলা সমীচীন নয়। 'শিল্প' কথাটির মধ্যেই একাধারে ভাব ও রীতির সমন্বয়বোধ নিহিত আছে। কিন্তু বিশ্লেষণ ছাড়া বুদ্ধির গত্যন্তর নেই। উপন্যাসের ক্ষেত্রেও গল্পের মূল বস্তু এবং তার পরিবেষণকৌশল,—দুটি সত্য পৃথকভাবে দেখা দরকার। এবং সেরকম পর্যবেক্ষণের কাজে অগ্রসর হলে প্রথমেই এই সত্যটি চোখে পড়ে যে, অন্যান্য সৃষ্টির মতো উপন্যাসসৃষ্টির ব্যাপারেও শিল্পরীতির প্রধান উদ্দেশ্য হলো পাঠকের মনে লেখকের বক্তব্য বিষয় তুলে দেবার সহায়তা করা। পাঠকের রুচি বুঝে লেখককে তাঁর কাজে নামতে হয়। সেই অভিপ্রায় থেকেই সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো উপন্যাসেরও কলাকৌশলের জন্ম।

ভাব ও রীতির সমন্বয়:—উপন্যাসের শিল্পরূপের অনুশীলন।

উপন্যাসের কলাকৌশলের আলোচনা প্রধানতঃ তিনটি বিষয়ে দৃষ্টি সংহত করবার পরামর্শ দেয়। প্রথমে আখ্যান বা 'প্লটের' কথা; দ্বিতীয়তঃ আখ্যানবস্তুর দেশকালগত অবস্থান ও পরিবর্তন, অর্থাৎ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় setting-এর এলাকা; তৃতীয়তঃ, চরিত্রের গঠন ও বিবর্তন, পরিণতি ও পরিব্যাপ্তির প্রসঙ্গ। প্রত্যেকটি চরিত্রের সঙ্গে মূল আখ্যানের যেমন সংগত যোগ থাকা দরকার, চরিত্রগুলির নিজেদের মধ্যেও তেমনি থাকা চাই অনিবার্য সম্পর্ক। কোনো কোনো রচনায় আখ্যানের মধ্যে আবার উপ-আখ্যানের জায়গা করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, মূল গল্পের পাশাপাশি বয়ে যায় উপ-গল্পের [under-plot] ধারা। কিন্তু একটি অন্যটির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়। উভয়েই পরস্পরের সম্পর্কিত।

প্লট [plot], সেটিং [setting], চরিত্র [character] ইত্যাদি উপন্যাসের নানা অঙ্গ।

এইভাবে সর্বাঙ্গ মিলিয়ে একখানি সার্থক উপন্যাসের মধ্যে যে আনন্দ ফুটে ওঠে, সেই আনন্দের উপাদান বা উপকরণের কথাসূত্রে এ-যুগের একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যশিল্পী বলেছেন যে, সব-সত্ত্বেও অদ্যাপি উপন্যাস হলো অপরিণত এক শিল্পরূপ [imperfect form]। এক উপন্যাসের সঙ্গে অন্য উপন্যাসের গুণভেদ নিয়ে যে কথা কাটাকাটি ঘটে থাকে, তার একটা বড় কারণ এই যে, সাহিত্যশিল্পের এ-বাহন আজও তার পূর্ণ পরিণতি পায়নি। এখনো তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেনি। অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের গল্প পড়বার সময় পাঠকের মনে কল্পনা এবং সমবেদনার যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা থাকা দরকার,—অর্থাৎ গল্পের লেখক যা বলবেন, গল্পের পাঠকও যে সেটা তাঁর আপন সমবেদনার গুণে আপন অন্তরে গ্রহণ করবেন, এতো খুবই স্বাভাবিক দাবী। শুধু তাই নয়, পাঠকের পক্ষেও পঠিত কাহিনীর সঙ্গে কিছু পরিমাণে 'আপন মনের মাধুরী' মেশানো দরকার।

> "Unless the reader is able to give some thing of himself he cannot get from a novel the best that it has to give."[৩]

এই সর্বগ্রাহ্য মন্তব্যের পরে তিনি একে-একে ভালো উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য কয়েকটি উপাদানের তালিকা দিয়েছেন। প্রথমতঃ চাই সর্বসাধারণের হৃদয়গ্রাহ্য মানবজীবনের গল্প। দ্বিতীয়তঃ সেই গল্পটি হওয়া চাই অসংগতিহীন; তার সূচনা চাই, পরিণতি চাই, উপসংহার চাই। সূচনা থেকে সিদ্ধান্ত পর্যন্ত সমস্ত পথটাই স্বাভাবিক সংগত নিমিত্তের টানে, কার্যকারণের ধারায় অব্যাহত ভাবে পাঠক যেন এগিয়ে যেতে পারেন, লেখক সেদিকে নিশ্চয় নজর রাখবেন। তৃতীয়তঃ উপ-গল্পের সংখ্যা এক বা একাধিক যাই হোক্ না কেন, সেগুলির কাজ হলো মূল গল্পকে পুষ্টি দেওয়া, পরিণতি দেওয়া; মূল গল্প থেকেই উপ-গল্পগুলি উদ্গত বা অঙ্কুরিত হওয়া চাই। চতুর্থতঃ উপন্যাসের মধ্যে যে চরিত্রগুলি জীবিত হয়ে উঠবে, তাদের প্রত্যেকের স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য থাকা আবশ্যক। মনে রাখতে হবে যে, তাদের পৃথক পৃথক আচরণ তাদের পৃথক পৃথক সত্তারই অভিব্যক্তি। পঞ্চম কথা,

আদর্শ উপন্যাসের কয়েকটি লক্ষণ।

৩ Ten Best Novels—Somerset Maugham.

পাত্রপাত্রীর উক্তি-প্রত্যুক্তি যেহেতু তাদের আচরণের মধ্যেই গণ্য, সুতরাং, অন্যান্য আচরণের মতো সংলাপও হবে বক্তার বিশিষ্ট সত্তার দান। ঔপন্যাসিকের নিজের ব্যক্তিগত ভাবনা, বিশ্বাস বা আবেগ নিষ্কাশনের উদ্দেশ্য এখানে অবান্তর। তার পরের কথা, বর্ণনাত্মক অংশগুলির উপযোগিতা স্বতঃস্ফূর্ত এবং সুস্পষ্ট হওয়া চাই। বিশেষ-বিশেষ ঘটনাসংস্থানে অবস্থিত বিশেষ-বিশেষ ব্যক্তির আচরণের ওপর আলোকপাত করবার জন্যই বর্ণনার চাহিদা। বর্ণনাকে এর বেশি বাড়তে দেওয়া মোটেই সংগত নয়। সপ্তম কথা হলো, লেখাটি আগাগোড়া মসৃণ হওয়া চাই। সারা গল্পটি যেন অব্যাহত পাঠের উপযোগী হয়। সাধারণ লেখাপড়া-জানা মানুষের পক্ষে তা যেন সুখপাঠ্য হয়। রচনাভঙ্গির কোনো কৌশলই যেন পাঠকের পক্ষে জটিলতা সৃষ্টি না করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার। এই সাতটি অপরিহার্য শর্তের কথা বলে তিনি শেষ কথায় যে অষ্টম শর্তটি উল্লেখ করেছেন, সেটি এইবার বিশেষ ভাবে স্মরণীয়—

> পরিশেষে, উপন্যাস অবশ্যই উপভোগ্য হওয়া উচিত। এই শর্তটি আমি সবশেষে উল্লেখ করেছি বটে, কিন্তু এটি না থাকলে অন্য কোনো গুণই সার্থক হয়না। বোধবুদ্ধিসম্পন্ন কোনো সুস্থ মানুষই উপদেশ-প্রাপ্তির আশা নিয়ে কিংবা নীতি-শিক্ষার আগ্রহে উপন্যাস পড়তে উদ্যোগী হন না।[৪]

জীবন যে সুন্দর, বিচিত্র এবং রহস্যময়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মাঝে মাঝে অবস্থার ফেরে কোনো কোনো ব্যক্তি বা জাতির মনে এই বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে আসে, বটে। মানুষের দীর্ঘ জাতিগত অভিব্যক্তির ইতিহাসে,—তার দেশকালব্যাপী—, অথচ, দেশকালের অতিশায়ী সুদীর্ঘ উত্থান-পতনের ধারায় এরকম সন্দেহ-সংশয়ের মনোভাব নিতান্তই ক্ষণিক ব্যাপার। নৈরাশ্য, দুর্যোগ, বিপত্তি, এসব তো আছেই, তবু জীবনের উপভোগ্যতার সত্যকে একটি সর্বজনীন সাধারণ সত্য বলেই মেনে নেওয়া দরকার। সে কথা সুবিদিত। সুখ-দুঃখের কথা, জয়-পরাজয়ের কাহিনী,—এমন কি জীবনের দুঃখ ও বেদনার কথা কিছু বেশি পরিমাণে বললেও সে সত্য ক্ষুণ্ণ হয় না। উপন্যাস উপভোগ্য

৪। "Finally, a novel should be entertaining. I have put this last, but it is the essential quality, without which no other quality is of any use. No one in his senses reads a novel for instruction or edification."

হওয়া চাই, এই দাবী মেটাতে গিয়ে জীবনের দুঃখকষ্টের দিকে পিঠ ফেরাবার কোনো প্রয়োজন নেই। মনে রাখতে হবে, সাধারণ মানুষের জন্যই উপন্যাসের চাহিদা। যথার্থ উপভোগ্য-উপন্যাসের লেখকের পক্ষে এই সাধারণ সত্যটি বিশেষ স্মরণীয়। এ কথা মনে রেখেই সাধারণ মানুষের মনের খবর রাখতে হয় তাঁকে ;—জানতে হয় তার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় কতোদুর, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকৃতি কী রকম। একথায় যদি ভিন্ন মতাবলম্বী কোনো সাধকের মনে সন্দেহ জাগে তাহলে বরং একটি ঐতিহাসিক নজির তুলেই তাঁর সন্দেহ ভঞ্জনের সহায়তা করা যেতে পারে। বিদেশের একজন সমালোচক রীতিমত পরিসংখ্যানের সাহায্যে জানিয়েছেন যে, উইল্কি কলিন্স্ বা থ্যাকারের সময়ে সাধারণতঃ এক-একখানা উপন্যাসের পরিমাপ ছিলো আড়াই-লাখ শব্দের বিস্তারে বাঁধা। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ছাপা এই আলোচনায় কৃতবিদ্য লেখক বলেছেন যে, আধুনিক কালে পুরোনো দিনের গণপাঠ্য উপন্যাসে সেই মাপটি ক্রমশঃ কমতে-কমতে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় আশি হাজার শব্দের সীমায়।[৫] এই লেখকই ইংরেজি উপন্যাসের রুচিবিবর্তনের কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, ভিক্টোরিয়ার আমলে বড়ো আয়তনের দামী বইগুলো ছিল জনসাধারণের গ্রন্থাগারের জিনিস। উঁচু দাম না দিলে সেগুলো মিল্‌তোনা বলেই সেসব বই পড়তে হলে মনোমত কোনো একটি গ্রন্থাগারে চাঁদা দিয়ে সভ্য হতে হতো। এইরকম এক-একটি গ্রন্থাগারে আবার পাঠক-পাঠিকাদের, —অর্থাৎ ভিক্টোরীয় যুগেরই, ভব্যতার আদর্শ মনে রেখে,—ভদ্র রুচি যাতে তিলমাত্র আঘাত না পায়, সেদিকে সতর্ক থেকে কর্তৃপক্ষ বইপত্তর কিনতেন। ফলে, উপন্যাস লিখে যাঁরা সাহিত্যের খ্যাতি কুড়োতে চাইতেন তাঁদেরও এই একই রুচির আনুগত্য করতে হতো। তারপর যখন সেকালের তিন-তরঙ্গের দীর্ঘ এবং দামী উপন্যাসের রেওয়াজ বদলে গিয়ে এক-খণ্ডের কম-দামী উপন্যাস চালু হলো, তখন, শিল্পরীতির দিক থেকেও কিছু নতুনত্বের সম্ভাবনা দেখা দিলো। শুধু তাই নয়। শিল্পরীতি পরিবর্তনের আরো কিছু কিছু বাহ্য কারণ আছে। বাংলায় বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্র যখন উপন্যাস লিখেছেন তখনো পাশ্চাত্য উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের লেখকদের খুব বেশি যোগাযোগ ঘটেনি। প্রধান-প্রধান লেখকদের কথা বাদ দিলে অন্যদের

বর্তমান যুগে অতিকায় উপন্যাসের ক্রমবিলুপ্তি।

৫। Contemporary Literature—Vol-vi—Peter Westland.

সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাঁরা মুখ্যতঃ দেশীয় উপন্যাসের সংকীর্ণ ধারাটুকুই কেবল মেনে নিয়েছিলেন। তখনো বিদেশী বইয়ের চলন ছিলো বটে, কিন্তু লেখকরা সজ্ঞানে বিদেশী ঢং বা কায়দা আমদানী করতে ইতস্ততঃ করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের যুগে ইংরেজি-উপন্যাসও আজকের মতো বিভিন্ন রীতিময় হয়ে ওঠেনি। ১৮৮০ থেকে ১৮৯০-এর মধ্যে সেখানে নতুন হাওয়া শুরু হয়েছিল। শতাব্দীর শেষ দুই দশকের মধ্যে Henry Vizetelly নামে এক ভদ্রলোক রুশ-ফরাসী প্রভৃতি বিদেশী গল্প-উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর দেখাদেখি আরো বহু লেখক একাজে হাত দিয়েছিলেন। রুশ আদর্শের সঙ্গে এইভাবে পরিচয় ঘটার ফলে ইংরেজিতে উপন্যাসের 'চরিত্র'রূপায়ণে মনোরহস্যের দিকে লেখকরা সেযুগে বেশি মন দিয়েছিলেন। ফরাসী আদর্শের প্রভাবে দেখা দিয়েছিল বাস্তব-সত্যবোধের প্রতি অনুরাগ।

শিল্পরূপের বিবর্তনে যুগ-সংস্কার ও যুগরুচির প্রভাব।

এই দুটি প্রসঙ্গ থেকে এই সত্যই স্পষ্ট বোধগম্য হয় যে, যুগের রুচি বা বিশ্বাস বা আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো উপন্যাস-শাখাতেও অল্প-বিস্তর রীতিগত পরিবর্তন ঘটতে পারে। শুধু ব্যক্তির অভিরুচিতেই নয়, যুগের প্রভাবেও রীতির বদল হয়। শিল্পরীতির আলোচনায় একদিকে এই যুগরুচি বা যুগসংস্কারের প্রভাব,—অন্যদিকে লেখকদের পৃথক পৃথক ব্যক্তিত্বের বোধ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বিশেষত্ব, এই দুটি প্রসঙ্গই ধর্তব্য। পুরো লেখাটির ভাবেও যেমন, প্রকাশেও তেমনি লেখকের আপন মননস্বভাবের চিহ্ন পড়ে থাকে। বাইরের নানা ঘটনাময় লোকাচারের জগৎ থেকে গল্পের বিষয়, বাস্তবতার আদর্শ ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী আহরণের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিককে ভাবতে হয় যে কোন্ ধারায়, কোন্ ভঙ্গিতে তিনি তাঁর রচনার সাজসজ্জা তৈরি করবেন। শিল্পের এই ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয় শিল্পীর অধ্যয়ন ও বোধের সামর্থ্যক্রমে। সৃষ্টিকৌশল স্রষ্টার-ই অভিব্যক্তি। দীনবন্ধু মিত্রের বিষয়ে আলোচনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—

> "কবির প্রধান গুণ সৃষ্টিকৌশল। ঈশ্বরগুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল। তাঁহার প্রণীত জলধর, জগদম্বা, মল্লিকা, নিমচাঁদ দত্ত প্রভৃতি এই

সকল কথার উজ্জ্বল উদাহরণ। তবে যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, তাঁহার মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন বিপর্য্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিতমাত্রেরও অধীন।"

উপন্যাসের শিল্পরীতির আলোচনায় দীনবন্ধু সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি আপাতদৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ অবান্তর মনে হতে পারে। সুতরাং কথাটি স্ফুটতর করে নেওয়া যাক। উদ্ধৃত মন্তব্যের লক্ষ্য এই যে, দীনবন্ধু তৎকালীন বাঙালী সমাজের বিশেষ এক স্তরের মানুষকেই অপেক্ষাকৃত বেশি দেখেছিলেন এবং চিনেছিলেন। তিনি ছিলেন পরদুঃখকাতর মানুষ। "তাঁহার সহানুভূতি তাঁহার অধীন নহে, তিনি নিজেই সহানুভূতির অধীন।" বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায়, 'দুর্দমনীয়া সহানুভূতি'র ফলেই দীনবন্ধুর লেখায় কিছু কিছু রুচির দোষ ঢুকেছিল। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি আরো বলেছিলেন—

উপন্যাসিকের সহানুভূতি ;—দীনবন্ধু সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য।

"সহানুভূতি তাঁহাকে বলিত, 'আমার হুকুম-সবটুকু লইতে হইবে—মায় ভাষা। দেখিতেছ না যে তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরাপের রাগ আর তোরাপের রাগের মত থাকে না; আদুরীর ভাষা ছাড়িলে, আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না; নিমচাঁদের ভাষা ছাড়িলে, নিমচাঁদের মাতলামি আর নিমচাঁদের মাতলামির মত থাকে না।' দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে বলেন, 'না, তা হবে না।' তাই আমরা একটি আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ-রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।"

দীনবন্ধুর এই বিশেষত্বকেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, রুচির দোষ। তাঁর সহানুভূতির তারিফ করেও এই দোষের কথা তিনি দোষ বলেই অভিহিত

করেছেন। 'গুণেও দোষ জন্মে,'—এই হলো তাঁর, সপ্রশংস, সান্ত্বনাময় অভিনন্দনের ভাষা।

সেকালের ভদ্র রুচিকে সমীহ না করে, অর্থাৎ, 'রুচির' খাতিরে শিল্পকে বিকৃত না করে দীনবন্ধু এই ভাবেই তাঁর অভিনবত্ব দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম বিশেষত্ব থেকেই যুগের নিষেধ অস্বীকার করবার জোর পেয়েছিলেন তিনি। সেকালের স্থূল সামাজিক সত্য থেকে সেকালের জনপ্রিয় সাহিত্য গড়ে উঠেছিল এইভাবে। মধুসূদনের প্রহসন দু'খানির মধ্যেও অনুরূপ ব্যাপার চোখে পড়ে।

ভাষা, ভঙ্গি, সংলাপের রীতি, বর্ণনার বিষয় ইত্যাদি কলাকৌশলগত অর্থাৎ শিল্পপ্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় ব্যাপারই লেখকদের স্বভাবগত সহানুভূতির উৎস থেকে নির্গত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর বিষয়ে যা বলেছেন মধুসূদন সম্বন্ধেও সেকথা খাটে। ব্যক্তিগত স্বভাবও আবার যুগের ভাবনা-চিন্তার দ্বারা কতকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং উপন্যাসের শিল্পবিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও লেখকের নিজের এবং তাঁর দেশকালের ধ্যান-ধারণার কথা ওঠা স্বাভাবিক। গল্পবস্তুর আকর্ষণকেই যাঁরা উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ বলে স্বীকার করেন, তাঁদের কথা মেনে নিয়েও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, যুগধর্ম ও যুগরুচির সঙ্গে তাল রেখে গল্পের প্রবাহ অব্যাহত ভাবে বয়ে চলুক, এইটেই কাম্য। গল্পের প্রসঙ্গ আর প্রযুক্তি, দুদিকেই লাগে যুগের হাওয়া। উপন্যাসের শিল্পরূপ এ-হাওয়া এড়িয়ে চলতে পারে না।

উপন্যাসের কাহিনী এবং কলাকৌশল দুইই যুগরুচির প্রভাবাধীন; —শরৎচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি।

এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের কথা উল্লেখ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান শতকের চতুর্থ দশকে একবার লিখেছিলেন—"উপন্যাস সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।" শরৎচন্দ্র সে কথার ওপর মন্তব্য করেছিলেন—"উপন্যাস সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।"[৬] তাহলে উপন্যাসের শিল্পরূপের উজ্জ্বলতায়,—তার দ্যুতিতে-দীপ্তিতে যুগের ভাবনা-

৬। ১৩৪০ সালে শ্রীঅতুলানন্দ রায়কে লিখিত শরৎচন্দ্রের পত্রের অংশ।

চিন্তার দানটা অমূলক নয়। সমস্যামূলক উপন্যাসও সাহিত্য হিসেবে অপাংক্তেয় নয়। শরৎচন্দ্র এই সমস্যার কথাসূত্রে বলেছিলেন—

> "উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক,—আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এই গ্রন্থিই সব চেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমার-সম্ভবের প্রব্লেম, উত্তর-কাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্‌স-হাউসের নোরার প্রব্লেম অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম এক জাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন বিচিত্রায় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিলেন আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্দ্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ্‌-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জান্‌তো সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন এক মুহূর্তে এসে।"[৭]

এ অবশ্য শুধু কলাকৌশলের প্রসঙ্গ নয়। চিন্তাশীল, দক্ষ লেখকের হাতে কাহিনীর গ্রন্থি কী ভাবে উন্মোচিত হয়, এখানে সেই বিস্ময়কর অভিজ্ঞতারই স্বীকৃতি ফুটেছে। কিন্তু এই গ্রন্থি উন্মোচনের ব্যাপারটিও তো শিল্পরহস্যেরই অন্তর্ভুক্ত। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর প্রথম অভ্যুদয়ের পর্বে ফণীন্দ্রনাথ পালকে শরৎচন্দ্র জানিয়েছিলেন—"টলষ্টয়ের রিস্যারেক্‌শন্‌ তাহারা একবার যদি পড়ে তাহা হইলে চরিত্রহীন সম্বন্ধে কিছুই বলিবার থাকিবে না।" তাঁর এ ধরনের আরো মন্তব্য আছে। এসব কথার শিক্ষা হলো এই যে, উপন্যাসের শিল্পকৌশলের সঙ্গেও লেখকের যুগের হাওয়া এবং তাঁর নিজের পড়াশোনা ও মতি-বুদ্ধির সম্পর্ক আছে। শিল্পকৌশলের সাধনার কথা ভেবে দেখতে হলে ঔপন্যাসিকের সমকালীন বড়ো বড়ো চিন্তা ও তত্ত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হতে হয়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় যে, বেন্থাম, মিল্‌ এবং কোঁৎ এই তিনজনের ভাবনা-চিন্তার মূলকথা না জেনে নিলে বঙ্কিমের লেখার যেসব জায়গায় এঁদের প্রভাব পড়েছে সেসব অংশের বিশ্লেষণ চলতে পারে না। রুশোর কথা না জানলে যেমন রোম্যাণ্টিক লেখকদের শিল্পপ্রয়াসের ব্যাখ্যান অচল। রুশোর মতের পাল্টা ঢেউ দেখা গিয়েছিল কোঁতের নিশ্চয়বাদে [positivism]। সমাজের শৃঙ্খলার মধ্যে

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন যুগচিন্তা।

৭। সাহিত্য সাধক চরিতমালা—৫২; পৃঃ ১১৩

কোঁৎ মানবচিন্তার ক্রমাবদ্ধ তিনটি স্তর লক্ষ্য করেছিলেন—প্রথমে আধিদৈবিক [theological], তারপর আধ্যাত্মিক [metaphysical] এবং পরিশেষে বৈজ্ঞানিক [scientific],—এই তিন স্তরের মধ্য দিয়ে মানুষের মন এগিয়ে চলেছে বিবর্তনের ধারায়,—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। হৃদয় এবং মস্তিষ্ক, মানুষের এই উভয় সম্পদের কথা মনে রেখে তিনি নতুন কালের সে নবধর্ম প্রচার করতে চেয়েছিলেন, তার নাম দেওয়া যায় 'মানবধর্ম'। কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান—এ সবই মানুষের সমাজ-শৃঙ্খলার চেতনা পুষ্ট করবার কাজে নিযুক্ত রয়েছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল,—তাঁর পিতা জেম্‌স্ মিল—এবং বেন্থাম এঁরা তিনজনে মিলে সমাজের পুরোনো কাঠামোর সংস্কারে নেমেছিলেন। ডিকেন্সের Hard Times-এ বেন্থামীয় হিতবাদের [utilitarianism] বিরুদ্ধে বলা হয়েছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল্ অবশ্য পুরোপুরি বেন্থামের হিতবাদ মেনে নিতে পারেননি। তাঁর Liberty-তে ব্যক্তির ওপর সমাজের অবাঞ্ছিত প্রভুত্বের বিষয়ে অভিযোগ আছে। উনিশের শতকে এসব কথা নিয়ে য়ুরোপে কতো যে আলোচনা হয়েছে সে-আর লিখে শেষ করা যায়না। ম্যাল্‌থাস-এর 'Principle of Population' [১৭৯৮], হার্বার্ট স্পেন্সারের [১৮২০—১৯০৩] 'The Principles of Psychology' [১৮৫৫], চার্লস ডারুইনের [১৮০৯-৮২] 'The Origin of Species' [১৮৫৯], ইত্যাদি বইয়ের ছোঁয়াচ লেগেছিল সেযুগের ঔপন্যাসিকদের মননে এবং কৌশলে। ডারুইনের সমর্থনে উচ্চকণ্ঠ Thomas Henry Huxley-র [১৮২৫-৯৫] কথাও মনে পড়া সংগত। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরই প্রসাদে পাওয়া গেল 'agnosticism'-শব্দটি। উপন্যাসের শিল্পরূপের আলোচনায় এসব ইতিহাসও অবান্তর নয়।[৮] উপন্যাস যিনি লেখেন, তিনি চারদিকের নানা

৮। In any case its [T. H. Huxley-র মতবাদের] effects spread wide and lasted at least into the opening years of the next century [অর্থাৎ বিশের শতকের] : 'realism' in art took shape in the fostering environment of the scientific reawakening. Abroad, Zola studied heredity in a series of novels ; at home...Thomas Hardy built his art on a philosophic foundation for the laying of which Darwin, Spencer and Huxley provided material ; and John Stuart Mill was another influential figure in his background,

—A Hundred Years of English Literature By Sherard Vines : [Gerald Duckworth & Co, Ltd, 3, Henrietta Street. London, W. C. 2 : 1950] p. 76,

হাওয়ার সংস্পর্শে এবং সংবেদনে বিদ্যমান থেকেই তা রচনা করেন। সুতরাং এসব কথা ঔপন্যাসিকের বোধ-বুদ্ধি-বিশ্বাসের সূত্রেই নয়,—উপন্যাসের রচনার ভঙ্গি, সংলাপের প্রকৃতি, ঘটনা-সমাবেশের বিশেষত্ব ইত্যাদি অন্যতর সূত্রেও স্মরণীয়। একটি সর্বজনবোধ্য দৃষ্টান্ত নিলে বক্তব্য বিষয়টি আরো সহজ মনে হবে। ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি সাহিত্যের উপন্যাস-লেখকরা প্রধানতঃ চরিত্রসৃষ্টির উপর জোর দিয়েছিলেন। স্যাম ওয়েলার, মিকবার, নিকোলাস নিকলবি. বেকি শার্প প্রভৃতি চরিত্রের কথা ভোলবার নয়। মুখ্য হোক্, গৌণ হোক্,—সকল চরিত্রেরই অল্পবিস্তর পরিচয় দেবার রীতি ছিল সেকালে। লেখকরা তাতে কার্পণ্য করেন নি। ডিকেন্স যাতে তদানীন্তন ইংলণ্ডের ভদ্রসমাজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে কিছু কিছু মন্তব্য জানাতে পারেন, সেজন্যে 'চরিত্র' এসে তাঁর প্রয়োজন মিটিয়েছে। 'Our Mutual Friend'-এর Podsnap এই ধরনের চরিত্র। ১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শনে' চন্দ্রনাথ বসু নভেল বা কথা-গ্রন্থের উদ্দেশ্য' সম্পর্কে লিখতে গিয়ে এ বিশেষত্বের ইশারা দিয়ে গেছেন—যদিও এতো স্পষ্টভাবে ঠিক এই কথাই তিনি বলেননি। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য' বইখানিতে উপন্যাস সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর এই লেখাটি এবং 'নভেলের শিল্প বা কবিত্ব' নামে দেবেন্দ্র-বিজয় বসুর আর একটি লেখা সংকলিত হয়েছে। শেষেরটি ১২৯২ সালের 'নব্য-ভারত' পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল। চন্দ্রনাথ তাতে লিখেছিলেন—

যুগপ্রভাবের আরও দৃষ্টান্ত। ভিক্টোরীয় যুগের ইংরেজি উপন্যাসে 'চরিত্র'প্রাধান্য।

> "ডিকেন্সের প্রত্যেক নভেলে অন্ততঃ একজন কঠোরহৃদয় অর্থপিশাচ আছে। ইহারা সকলেই নানারূপ কষ্টে পড়িয়া শেষ দশায় অত্যন্ত যাতনা পাইয়া, সকল লোকের নিকট অবমানিত হইয়া কেহ বা আত্মহত্যা করিয়া কেহ বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। এইরূপ চরিত্র বর্ণনার উদ্দেশ্য এই যে, মনুষ্য কঠোরহৃদয়তার এই সকল ফল দেখিতে পাইয়া আর কঠোরহৃদয় হইতে চাহিবে না।"

দেবেন্দ্রবিজয়ের প্রবন্ধটির নামের সঙ্গে তাঁর আসল আলোচনার বিশেষ কোনো সঙ্গতি নেই। নভেলের শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করে তিনি কেবলই

সাহিত্যের ব্যাপক শিল্পকলার প্রয়োজনীয়তার কথা বার বার বলে গেছেন। সে সময়ে Taine-এর লেখা ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস বইখানি বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। দেবেন্দ্রবাবু সেই বই থেকে প্রায়ই উদ্ধৃতি তুলেছেন; মাঝে মাঝে Carlyle-এর কথা আছে; কিন্তু তাতে তাঁর প্রস্তাবিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত ঘটেনি। তিনি থ্যাকারে এবং ডিকেন্সের উপন্যাসে 'ব্যঙ্গ ও নীতি'-র বাড়াবাড়ি দেখে তৃপ্তি হারিয়েছেন,—ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু'-তে "থেকারের অনুকরণে অনেকটা ব্যঙ্গের অবতারণা" লক্ষ্য করেছেন, আর বলেছেন—

> "যাঁহারা সৎ অসৎ দেখাইতে যান, নভেলের মধ্যে গ্রন্থকারের আমিত্ব প্রবেশ করাইয়া দিয়া—পাঠকবর্গকে ভালমন্দ বাছিয়া দেন—পাঠকদের উপদেশ দেন, সৎ চরিত্রের উপর সহানুভূতি, মন্দ চরিত্রের উপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ করিতে বসেন, তাঁহারা শিল্পকে নষ্ট করেন।......
>
> এইজন্য বঙ্কিমবাবুর আধুনিক নভেলগুলি শিল্পাংশে বড় সুন্দর হইতেছে না। আনন্দমঠ সুন্দর উদ্দেশ্যমূলক নভেল হইলেও তাহাতে প্রকৃত শিল্পের আভাস থাকিলেও তাহাতে নীতি ও উদ্দেশ্য এত অধিক পরিমাণে মিশাইয়াছেন, art-এর সহিত এত artificial মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে শিল্প বড়ই বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।"

বলা বাহুল্য, এই ধরনের মন্তব্য সতর্ক বিবেচনার ফল নয়। এতে সত্য-মিথ্যা দুইই মিশে আছে। লেখাটির শেষ দু'এক অনুচ্ছেদে লেখক শিল্পসৃষ্টির রুচি সম্বন্ধে কিছু বলেছেন। উপন্যাসের শিল্পাদর্শ-বা শিল্পবিবর্তন সম্বন্ধে সে মন্তব্যেরও খুব ঘনিষ্ঠ যোগ নেই।

দেবেন্দ্রবিজয় বা চন্দ্রনাথ যখন এইসব প্রবন্ধ লিখেছেন তখনো আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের চর্চা ঠিক একালের মতো ব্যাপক ও বিভিন্নমুখী হয়ে ওঠেনি। উপন্যাসের শিল্পরূপের আলোচনা সুশৃঙ্খল হবার সুযোগ পায়নি তখনো। চন্দ্রনাথ তবু যে ডিকেন্সের চরিত্রসৃষ্টির কথাপ্রসঙ্গে একটি প্রণিধানযোগ্য কথা বলেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রতিফলিত প্রেম, নরনারীর সম্পর্ক, সতীত্বের ধারণা—এবং, আমাদের দেশে

এসবের ভিন্ন ধারণা, ভিন্ন বিশ্বাস সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ আরো কিছু বলেছিলেন ঐ প্রবন্ধে। কিন্তু এখন সেসব তর্কও থাক্। ডিকেন্সের বিষয়ে তিনি যা বলেছিলেন,—বিশেষতঃ এখানে তাঁর উক্তির যে অংশটুকু তুলে দেওয়া হয়েছে,—উপন্যাসের শিল্পগত রহস্যের বিচারে-ব্যাখ্যানে সে মন্তব্যটি তুচ্ছ নয়। ডিকেন্স যে-সমাজের মানুষ ছিলেন, যে-যুগচিন্তার মধ্যে তিনি জীবনযাপন করে গেছেন, সেই সমাজ এবং সেই যুগচিন্তাই 'চরিত্র'-প্রধান উপন্যাসের যুগে তাঁকে বিশেষ শ্রেণীর 'চরিত্র'-রূপায়ণের তাগিদ দিয়েছে। এবং ঠিক সেই অনুপাতেই তাঁর উপন্যাসের শিল্পগত প্রক্রিয়া, কৌশল বা ভঙ্গি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' বইখানির 'বাবুরাম', 'মতিলাল', 'বাঞ্ছারাম', 'বক্রেশ্বর' ইত্যাদি লোকের 'বিশেষ ও সুস্পষ্ট ব্যক্তিত্ব', আকৃতি, 'কথোপকথনের বিশেষ ভঙ্গি' প্রভৃতি স্মরণ করে Dickens-এর সঙ্গে সেসবের সাদৃশ্যের সত্য মনে করিয়ে দিয়েছেন। সে সময়ে বাংলা উপন্যাস প্রধানতঃ ইংরেজির ছায়ায়-ছায়ায় বেড়ে উঠেছে বলেই এ-সাদৃশ্য এভাবে ব্যাখ্যা করা খুব অসংগত নয়। নীতি প্রচারের বাড়াবাড়িটা যে দোষের বিষয়,—Goldsmith-এর Vicar of Wakefield যে সেই দোষেই নিন্দনীয়, প্যারীচাঁদের চরিত্র-সৃষ্টির কথা বলে শ্রীকুমার বাবুও সে সত্য উল্লেখ করেছেন। হয়তো আরো কিছু বলা দরকার,—শুধু Dickens-এর আদর্শ অনুসরণের কথাটাই যথেষ্ট নয়। ডিকেন্স কি কারণে,—স্বভাবের কোন্ বিশেষ তাগিদে ঐ জাতীয় 'চরিত্র' সৃষ্টি করেছেন? গোল্ড্স্মিথ কেন নেমেছিলেন নীতিপ্রচারের বিড়ম্বনায়? বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কুন্দনন্দিনী কেন দুঃখ পায়?—রোহিণী কেন মরে? শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' শুধু উপকাহিনী আর প্রাসঙ্গিক চরিত্রের চমক দিয়ে পাঠকের মনে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের মূল গল্পটার সম্বন্ধে কেন এক অনস্বীকার্য ক্লান্তি ছড়িয়ে দেয়? রূঢ় ভাষায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'-র শেষ দিকটা গোঁজামিল বলা ছাড়া গত্যন্তর নেই বটে, কিন্তু কেন এমন হলো? শিল্পরূপের এইসব দোষত্রুটি, সীমা এবং সংকোচের রহস্য খুঁজে দেখতে হলে শিল্পীর স্বদেশ, স্বকাল ও স্ব-সমাজের চিন্তা অনিবার্য।

যুগের চিন্তা এবং দেশের রুচি ঔপন্যাসিকের সাধনাকে বহুভাবেই যে প্রভাবিত করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেবল ব্যক্তিবিশেষকেই নয়,—

যুগধর্মের নিয়ন্ত্রণীশক্তি ব্যাপকভাবে মানুষের সমস্ত ভাবনাকেই অল্প-বিস্তর-তার অনুগামী করে নেয়। তাই, একালের উপন্যাসের পর্যালোচনায় নামলে শুধু আখ্যান বা প্লটের প্রকৃতি, ঐক্য বা unity-র আদর্শ, চরিত্রের বিশেষত্ব, অন্তরের বিশ্লেষণ, সংলাপের দোষগুণ, ইত্যাদি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারমাত্র যথেষ্ট নয়। শিল্পীর আত্মবোধ ও বিশ্ববোধের ক্রমবিকাশে পরিবর্তনশীল যুগপ্রভাবের বিচিত্রতার কথাও বিবেচ্য।

নভেল বা উপন্যাসের পূর্ববর্তী অন্যান্য সমধর্মী সাহিত্যশাখাগুলির মধ্যে 'এপিক', 'রোম্যান্স,' 'সাগা,' 'ব্যালাড্' ইত্যাদি পাশ্চাত্য নামগুলি সমসূত্রে গ্রথিত। দেশকালের ভিন্ন ভিন্ন স্ফুরণ-সন্ধিতে পর্যায়ক্রমে এদের অভ্যুদয় এবং পরিণতি ঘটেছে। উপন্যাসের আখ্যানপ্রকৃতির সঙ্গে রোম্যান্সের মিল নেই বটে, কিন্তু দুই রূপের মধ্যেই আছে গল্প বর্ণনার সাধারণ লক্ষণ,—'এপিকে', 'সাগা'-তে 'ব্যালাডে'-ও তাই। বাংলাতে সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ চলিত ছিল; রূপকথায়, নাথগীতিকায়, মঙ্গলকাব্যে, পূর্ববঙ্গগীতিকায় গল্পের চর্চা কিছু কম হয়নি। তবু, বাংলা উপন্যাস ঠিক এইসব পুরোনো প্রথারই অনুবর্তনমাত্র নয়। 'নভেল'-এর বাংলা নামান্তর হিসেবেই 'উপন্যাসের' খ্যাতি। খ্রীষ্টাব্দের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে ইটালিতে প্রচলিত এক জাতের ছোট-ছোট গল্পকে বলা হতো 'novelle'। ইংলণ্ডে 'history' 'memoir' প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হতো গল্পপ্রধান সাহিত্যের শ্রেণীগত সংজ্ঞা হিসেবে। রোম্যান্সের যুগ শেষ হয়ে তখন অপেক্ষাকৃত লৌকিক ও সাধারণ জীবনের গল্পের রেওয়াজ শুরু হয়েছে। সেদেশে Richardson-এর 'Pamela' [১৭৪২ খ্রীঃ] ছাপা হবার আগে প্রায় দুশো বছর কেটেছে বিশৃঙ্খল গদ্যচর্চায়। তারপর আঠারোর শতকে দেখা দিল শৃঙ্খলার পূর্বাভাস। Steele [১৬৭২-১৭২৯]-এর লেখাতে—'Our amours can't furnish out a Romance; they 'll make a very pretty Novel'.—এই উক্তিটিতে 'রোম্যান্স' এবং 'নভেলের' আধার ও আধেয় সম্পর্কে তৎকালীন ধারণার ইশারা পাওয়া যায়। দুটি পৃথক শব্দের অর্থগত পার্থক্যের কথা তখন আর

উপন্যাসের সঙ্গে এপিক, সাগা, রোমান্স, ব্যালাড ইত্যাদি সাহিত্যপ্রকারের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য।

ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম সূত্রপাত; রোম্যান্স ও নভেল।

অস্পষ্ট বা অপরিচিত ছিল না। সপ্তদশ শতকের শেষদিকে সে-দেশে Congreve-এর [১৬৭০-১৭২৯] লেখাতেও এই দুটি নামের অর্থভেদের স্বীকৃতি আছে।

ডক্টর সুকুমার সেন বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে ['ইতিহাস' পত্রিকায় প্রকাশিত ও পরে 'বিচিত্র সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত] দেখিয়েছেন যে, আমাদের দেশেও উনিশের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত 'ইতিহাস' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে গল্প বা কাহিনী অর্থে। সে যাই হোক্, য়ুরোপে সমকালীন সমাজচিন্তা, বস্তুসংসর্গের পরিচয়, মানুষের প্রাত্যহিক ব্যবহারিক জগতের বিচিত্র কথা 'নভেলে'র বাহনে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আর, অতিপ্রাকৃত এবং অপ্রত্যাশিত বীরত্ব-বিস্ময়-প্রেমের কাহিনী জায়গা পেয়েছে 'রোম্যান্সে'। 'রোম্যান্স' দূরের মহিমার এবং 'নভেল' কাছের সত্যের বাহন হয়ে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সে-যুগে। রোম্যান্সের ঐতিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকারা 'এপিকের' প্রথা পরিত্যাগ করে কতকটা অন্তর্ধর্মী হয়ে উঠলেন। এপিকের বিস্ময় রইলো বটে, কিন্তু ভাগ্যের পুতুল হয়ে দিন কাটাবার দিনান্ত হলো। মানুষের বিস্ময়কর অভিযান, সাহসিকতা, প্রেম ও উদ্দীপনার ছবি ফুটলো রোম্যান্সে। এইভাবে অর্থারের বীরত্বের [chivalry] অনেক কাহিনী প্রচারিত হয়েছে। প্রথমে পদ্যে,—পরে গদ্যে প্রবাহিত হলো রোম্যান্সের ধারা। প্রধানতঃ ফ্রান্সে, এবং তাছাড়া প্রায় সমস্ত য়ুরোপে এ জিনিষের চর্চা ছিল। এদিকে স্পেনের খ্যাতিও তুচ্ছ নয়। খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে, রেনেশাঁসের উদ্দীপনায়, —গ্রীক ও রোমক সাহিত্যের প্রভাবে এবং সমুদ্রপারের নতুন-নতুন দেশ আবিষ্কারের আনন্দের নেশায় ইংলণ্ডে 'রোম্যান্সের' সুবর্ণযুগ এসেছিল। পঞ্চদশ শতকে Sir Thomas Malory-র Morte d' Arthur-এ কেবল যে উল্লেখযোগ্য গদ্যের বাহনেই রোমান্সের প্রচার ঘটলো, তা' নয়। রাজা আর্থারেয় বহুশ্রুত, বিচ্ছিন্ন গল্পগুলিকে তিনি একসূত্রে বাঁধলেন। ম্যালরির আগে ইংলণ্ডে গল্প-প্রধান সাহিত্য সৃষ্টি করে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন চসার [১৩৪০-১৪০০]। একটি জীবন্ত সমাজের খুঁটিনাটি সব কিছু পর্যবেক্ষণের আনন্দ ছিল তাঁর রচনায়। চরিত্রের বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য তাঁর সৃষ্টিতে বিরল নয়। দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাশিও ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ইটালীয় সাহিত্যিকের লেখার সঙ্গে

তাঁর পরিচয় ছিল। তবে তাঁর হাতে ইংরেজি সাহিত্যের গদ্যবাহিত-গল্পের ধারা শুরু হয়নি। চসারের পরে ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে বইছাপার কাজ শুরু করলেন ক্যাক্সটন [১৪২১-৯১]। তখনো সাহিত্যিক গল্পের উদ্ভব হয়নি। ক্যাক্সটনের ছাপাখানাতেই ম্যালরির বই ছাপা হলো। তারপর একে-একে দেখা দিলো টমাস মুরের Utopia [১৫১৬ খ্রীঃ], জন লাইলির Euphues [১৫৮০ খ্রীঃ], স্যার ফিলিপ সিডনির Arcadia [১৫৮৫-এর আগে লেখা], ন্যাসের The Unfortunate Traveller [১৫৯৪ খ্রীঃ], বুনিয়ানের Pilgrim's Progress [১৬৭৮ খ্রীঃ]। এই বইগুলিও ঠিক বস্তুধর্মী কথা-সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে না। তাছাড়া এই তালিকার সব বই মূলে ইংরেজি-তেই যে লেখা হয়েছিল, তাও নয়। 'য়ুটোপিয়া' প্রথমে লেখা হয় ল্যাটিন ভাষায়। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তার ইংরেজি অনুবাদ বের হয়। এই সব রচনায় গল্পের ক্ষীণ সুতোয় নীতিকথা, আদর্শের চিন্তা, দুঃসাহস ও প্রেমের উন্মাদনা ইত্যাদি ব্যাপার জড়িয়ে আছে। গ্রাম্য মেষ-পালকদের বর্ণনার মধ্যে সিড্‌নি রেখে গেছেন তাঁর বস্তুদৃষ্টির [realism] নমুনা,—ইউফুয়িসের কাহিনীতে লাইলি ফুটিয়েছেন 'চরিত্রে'র কথঞ্চিৎ মৌলিকতা।

আধুনিক 'নভেল'-শিল্পরূপের ইতিহাসে এসব গ্রন্থের উল্লেখ অপরিহার্য নয়। তবু 'এপিক' থেকে 'রোম্যান্স'—'রোম্যান্স' থেকে 'নভেলের' বিবর্তনের ধারায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্মরণীয় কয়েকখানি বইয়ের মধ্যে এদেরও সম্মান আছে। এইসব গল্পধর্মী গদ্য-পদ্য বিচিত্র লেখা তো বটেই, এগুলি ছাড়া কোনো-কোনো প্রবন্ধের কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা দরকার।

পণ্ডিতরা পাশ্চাত্য 'এপিক'-কাব্যের রচনাকালের নাম দিয়েছেন, 'heroic age';—এই 'heroic age'-এর শেষ পর্বে 'রোম্যান্স' লেখা হয়েছে। কেউ কেউ সে যুগকে বলেছেন,—'age of chivalry'। 'এপিকে' পাওয়া যায় গাম্ভীর্য, গুরুত্ব, সৌষ্ঠব; রোম্যান্সে মোহাবেশ। এপিকে বর্ণনার সঙ্গে নাটকীয় গুণের সমাবেশ,—সেখানে চরিত্র জীবন্ত; জীবন সর্বমুখী। 'এপিকে'র পরে 'রোম্যান্স',—রোম্যান্সের পরে 'নভেল'। নভেলের সঙ্গে রোম্যান্সের পার্থক্য দেখাতে গিয়ে একজন লিখেছেন—

'বীর-যুগের' রচনা

সমকালীন সমাজের বিষয়ে সহানুভূতি নিয়ে এবং প্রীতি ও প্রেমই যেহেতু মানুষের সামাজিক সম্পর্কের প্রধান বাঁধন,

সেজন্যে প্রেমকেই মানুষের বিশেষ চালনী শক্তিরূপে স্বীকার করে নিয়ে উপন্যাসে জীবনের আলেখ্য চিত্রিত হয়।

প্রাচীনতর রোম্যান্সে যে দূরায়নী [রোম্যান্টিক] বিস্ময় ফুটতো তার প্রধান অবলম্বন ছিল জীবনের অস্বাভাবিক, অসাধারণ, রহস্যময় দিকগুলি,—তাতে চোখে দেখা প্রকৃত ব্যাপারের চেয়ে অন্তরের স্বপ্নে বা কল্পনায় কল্পিত উপাদানই প্রাধান্য পেয়েছে।[১]

প্রাচীন 'বীর-যুগে' [heroic age] য়ুরোপের সমাজে ছিল আভিজাত্যের গরিমা। কিন্তু গণ্য-মান্য চূড়ামণিদের সঙ্গে সমাজের নীচের তলার জনসাধারণের আচারব্যবহারের তখনো তেমন দুস্তর ব্যবধান দেখা দেয়নি। নীচুতলার বাসিন্দারা ওপরের ভাগ্যবানদের খুব বেশি ঈর্ষার পাত্র মনে করতেননা। ওপরের গোষ্ঠীও নীচের মানুষদের অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করেন নি। সকলের সুপরিচিত কাজে যিনি সর্বাধিক দক্ষ, তাঁকেই লোকে বলতো খ্যাতিমান। সমাজের মাথা বলে যাঁদের খ্যাতি ছিল, তাঁরা জনসাধারণের মতোই পশুপালনে, নৌচালনায় পটু ছিলেন। জীবিকা এবং বৃত্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবধানের ফলে মানুষে-মানুষে সমবেদনা বা সহানুভূতির যে অভাব দেখা দেয়, প্রাচীন 'বীর-যুগে' সে অভাবের বালাই ছিলো না। অন্তত, এ-কালের মতো মর্মান্তিক হয়ে ওঠেনি মানুষের বৃত্তিভেদ। ফলে, ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এবং সমষ্টির আত্মীয়তা, দুইয়েরই আদর ছিল,—আবেদন ছিল। পরবর্তী পর্বে, অর্থাৎ, রোম্যান্সের যুগেও ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই নিকট সম্পর্ক সম্পূর্ণ ক্ষুণ্ণ হয়নি। ভাবাদর্শের দিকে অপেক্ষাকৃত কম ব্যবধান সত্ত্বেও চরিত্র-রূপায়ণের উপলব্ধিতে 'রোম্যান্স' এবং 'এপিকে'র মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। একজন পর্যালোচক লিখেছেন—

এপিক ও রোম্যান্স

১। "It [উপন্যাস] means a study of contemporary society with an implied sympathetic interest, and it may be added, with special reference to love as a motor force, simply because love it is which binds together human beings in their social relation...

...The elder romance finds its romantic effect. as a rule in the unusual. the strange and abnormal aspects of life, not so much seen of the eye as imagined of the mind or fancy."—Masters of the English Novel By Richard Burton [1932] p. 10,

চরিত্রবর্ণনার মধ্যে নাটকীয়তার অভাব ঘটলে 'এপিক' বা মহাকাব্য তার আসল স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্টতা হারিয়ে 'ইতিহাস' এবং 'রোম্যান্সে'র সামিল হয়ে পড়ে। পাত্রপাত্রীর প্রতিটি সংঘাতে-প্রতিঘাতে যে নাট্যরস উদ্ভিন্ন হয়ে ওঠে, তাইতেই মহাকাব্যের প্রাণের পুষ্টি ও বৈচিত্র্যের উদ্ভব হয়ে থাকে।[১০]

এই নাটকীয় ভঙ্গির বিশেষত্ব 'এপিক' থেকে 'নভেলে'র রাজ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। 'এপিকে' যেমন জীবনের সব কথা, সব ভাব, সব আনন্দ-বেদনার জায়গা ছিল, 'নভেল' বা উপন্যাসেও তেমনি ধারণী সামর্থ্যের এই বিশেষত্ব চোখে পড়ে। উপন্যাসকে একালের 'মহাকাব্য' নামে অভিহিত করবার অভ্যাসটি যুক্তিহীন নয়। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' শুধু বিচ্ছিন্ন কয়েকটি চরিত্রেরই সমাবেশে সমৃদ্ধ নয়, একটি পরিপূর্ণ জগৎকে ধরবার চেষ্টা আছে সেই বইখানির আয়োজনে। তেমনি একালের অন্যান্য উপন্যাসে।

'এপিকে'র বাস্তবতার কথাও এই সূত্রে স্মরণীয়। সে বাস্তবতার সম্যক আলোচনা অবশ্য অল্প কথায় শেষ হবার নয়।

ব্যালাড্ বা পাশ্চাত্য গাথাকাব্য।

'এপিক' ও 'রোম্যান্সের' পরে 'ব্যালাড্'-শাখার কথাও উল্লেখ করা দরকার। মধ্যযুগে স্পেনে, স্ক্যান্ডিনেভিয়া-অঞ্চলে এবং য়ুরোপের অন্যান্য প্রদেশেও 'ব্যালাড্' বা গাথা-কাব্যের প্রচলন ছিল। নৃত্য-গীত-সংবলিত এই কাব্যশাখার প্রকৃতি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে—

সাধারণতঃ 'গাথাকাব্য' বলতে যে কাব্যশাখার কথা বোঝায় সারল্য হলো তার অন্যতম লক্ষণ এবং সেইসঙ্গে উঁচুদরের কবিত্বের উচ্চাশা তাতে অনুপস্থিত। 'গাথাকাব্য' ছিল বাজারে গান করবার জিনিস, গ্রাম্য মানুষের একক বা মিলিত সংগীতের বিষয়।[১১]

১০। "Without dramatic representation of the characters, epic is mere history or romance ; the variety and life of epic are to be found in the drama that springs up at every encounter of the persenages,"

১১। "Ballad, as the term is commonly used, implies a certain degree of simplicity, and an absence of high poetical ambition, Ballads are for the market-place and the 'blind crowder' or for the rustic chorus that sings the ballad burden..."

খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত হাজার বছরের পর্বটিকেই সাধারণতঃ 'মধ্যযুগ' নামে অভিহিত করা হয়। এই হাজার বছরের সাহিত্য-চর্চার ইতিহাসে য়ুরোপে ভাষাগোষ্ঠীর বিভাগ অনুসারে জার্মান, কেলটিক, ফরাসী, স্পেনীয় এবং ইটালীয় এই পাঁচটি পরস্পর-প্রভাবিত সাহিত্য-মহাদেশের প্রত্যেকটিতেই লৌকিক মানবজীবনের গল্পচর্চার ধারা বয়ে গেছে। প্রেম এবং দুঃসাহসিক অভিযানের কথাই ছিলো এই পর্বের প্রধান কথা। আলেকজাণ্ডার, সীজার, শার্লামাং, আর্থার ইত্যাদি বীরের মহিমা বর্ণনাতেই ছিল গল্পকারদের ঐকান্তিক নিষ্ঠা। দৈত্যের দৌরাত্ম্য থেকে সুন্দরীর পরিত্রাণ ঘটানোই ছিল সেইসব বীরের রোমাঞ্চকর কৃত্য। সপ্তদশ শতকে Cervantes-এর Don Quixote-এ এই সহস্র মহিমময় বীর নায়কদের পৌনঃপুনিক শৌর্যপ্রদর্শনের বিলাস অবশেষে ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে নবজাগ্রত বিচারবুদ্ধির পরাক্রমে পিষ্ট হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে ইংরেজি সাহিত্যে নভেলের অভ্যুদয় এক আকস্মিক ব্যাপার। রিচার্ডসনের এক বইয়ের দোকান ছিল। জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে সাহিত্য রচনার কোনো ইচ্ছাই তাঁর মনে জাগেনি। একখানি 'আদর্শ- পত্রাবলী' লেখবার ফরমাস পেয়ে পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি ইংলণ্ডের প্রথম 'নভেল' Pamela লিখে ফেললেন। 'পামেলা'-র গল্প খুবই সাধাসিধা। কিন্তু অতি সাধারণ মানুষের নিতান্ত স্বাভাবিক অভিজ্ঞতাও যে চিত্তাকর্ষক গল্পের সামগ্রী হতে পারে, এ আবিষ্কারের কৃতিত্ব দেখালেন রিচার্ডসন। Fielding [১৭০৭-১৭৫৪] তাঁর বইয়ের ব্যঙ্গানুকরণ লিখলেন বটে, কিন্তু শেষে নিজেই ঔপন্যাসিক হয়ে উঠলেন। তাঁর সমকালীন ছিলেন Smolett [১৭২১-১৭৭১]। এঁদের প্রত্যেকের লেখাতেই যথাস্থিত সমাজের রূপ, গুণ, স্বভাব, অভ্যাস বর্ণনাই হয়ে উঠলো বিশিষ্ট আকর্ষণ।

ইংরেজি সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব যে অবস্থার ফলে সম্ভব হয়েছিল, বাংলায় ঠিক সেরকম কোনো ব্যাপার ঘটেনি। উনিশের শতকের তৃতীয় দশকে গদ্যে লেখা কিছু কিছু সামাজিক নক্‌শা জাতীয় রচনার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে বটে,—কিন্তু উপন্যাসের পরিণত আদর্শ থেকে সে সব লেখা ছিল বহু দূরবর্তী। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাংলার অনুবাদক-সমাজের প্রচেষ্টায় বহু ইংরেজি উপাখ্যানের অনুবাদ শুরু হলো। রামনারায়ণ বিদ্যা-

রক্ষ, মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি লেখকের নাম এই সূত্রে স্মরণীয়। এঁদের পরে,—শতাব্দীর অষ্টম দশকে রেনলড্‌সের 'লণ্ডন-রহস্যের' প্রথম অনুবাদক হিসেবে খ্যাতি পেয়েছিলেন হরিচরণ রায়। 'হরিদাসের গুপ্তকথা' লিখে দেশে জনপ্রিয় হয়েছিলেন ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব। এ সবই বঙ্কিমচন্দ্রের আমলের ঘটনা। বস্তুতঃ, শতাব্দীর সপ্তম-অষ্টম দশকে সুলভ মুদ্রণের প্রসাদে বহু লেখকের অসংখ্য অমার্জিত গল্পের বই ছাপা হয়েছে। বটতলার গল্প নামে এই সব রচনা সে যুগে একটি জনপ্রিয় বৃহৎ সাহিত্যশাখার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। 'বিশ্বভারতী' পত্রিকায় [সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা] ডক্টর সুকুমার সেন 'বটতলার বেসাতি' নামে একটি প্রবন্ধে এই বটতলার কথা কতকটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। কৌতূহলী পাঠক সেটি পড়ে দেখলে উপকৃত হবেন। শতাব্দীর তৃতীয় দশকে শোভাবাজারে এই 'বটতলা-ছাপাখানার' প্রথম সূত্রপাত হয়। আনুমানিক হিসেবে ১৮২০ থেকে ১৯১০-১১ পর্যন্ত বটতলার জনপ্রিয়তা পূর্ণমাত্রায় বজায় ছিল। নাটক, নকশা, গল্প, উপন্যাস ছাড়া, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, সত্যনারায়ণের কথা ইত্যাদি বইও বটতলার প্রধান পণ্যের মধ্যে গণ্য হতো। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে প্রচলিত বটতলার গল্প-উপন্যাসের মধ্যে প্রধানতঃ এই চারটি শ্রেণী দেখা গেছে—[১] 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুকরণে লেখা চমকপ্রদ প্রণয় ও বীরত্বের কাহিনী; [২] 'হরিদাসের গুপ্তকথা' ও তদনুরূপ অন্যান্য কাহিনী; [৩] বিলিতী গোয়েন্দা কাহিনীর অনুবাদ ও অনুকরণ; [৪] 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' জাতীয় রচনা।

বটতলার গল্প-উপন্যাস।

'বটতলা'র প্রথম সূত্রপাত কিছু আগে ঘটলেও বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতির যুগেই বটতলার 'সুবর্ণযুগ' চিহ্নিত করা ভুল হবেনা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস [১৮৫৭] তার আগের রচনা। কন্‌টারের 'রোমান্স অব্ হিষ্টরি—ইণ্ডিয়া' থেকে ভূদেব তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' দুটি পৃথক কাহিনী সংকলন করেছিলেন। আওরংজেবের মেয়ে রোসিনরো শিবাজীর হাতে বন্দী হয়ে উভয়ে উভয়ের প্রণয়াসক্ত হলেও সামাজিক বাধার ফলে তাঁদের মিলন ব্যাহত হলো। ভূদেবের 'অঙ্গুরী-বিনিময়ের' এই হলো গল্প-বস্তু। তাঁর পূর্বোক্ত দুটি গল্পের মধ্যে প্রথমটি ['সফল স্বপ্ন'] নিছক মূলের

পুনর্লিখন বটে, কিন্তু দ্বিতীয়টি সেরকম নয়। 'অঙ্গুরী বিনিময়' ভূদেবের মৌলিক কল্পনার ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনীর' নায়িকার অঙ্গুরীয়ের সঙ্গে কাহিনীর যেমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, ভূদেবের এই গল্পটিতেও অনুরূপ ব্যাপার দেখে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেবের আদর্শেই তাঁর প্রথম বাংলা বইখানি লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র আয়েষা ও অভিরাম-স্বামী যথাক্রমে 'অঙ্গুরী বিনিময়ে'র রোসিনারা ও রামদাসস্বামীর আদর্শে কল্পিত। রামগতি ন্যায়রত্ন লিখেছেন—

> "যৎকালে এই অঙ্গুরীবিনিময় রচিত হয়, তখন 'পদ্মিনী-উপাখ্যান' বল, 'কর্ম্মদেবী' বল, 'দুর্গেশনন্দিনী'ই বা বল, ঐতিহাসিক উপন্যাস নামক কোন গ্রন্থ বাঙ্গালায় রচিত হয় নাই; অতএব ঐ বিষয়ে যে, বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের দৃষ্টি পড়িয়াছে ও প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, ভূদেববাবুই তাহার মূল। এক্ষণে ঐরূপ প্রকৃতির গ্রন্থরচয়িতারা যে, সকলেই সকল বিষয়ে ভূদেববাবুর অনুকরণ করিয়াছেন, এ কথা আমরা বলিনা, কিন্তু সকলেই যে, ভূদেববাবু হইতেই ইহার প্রথম স্বাদ গ্রহণ করিয়াছেন, এ কথা অবশ্য বলিব।"

বাংলা উপন্যাসের পথিকৃৎদের মধ্যে ভূদেবের নাম এই কারণে স্মরণীয় হলেও 'উপন্যাস' নামটি কিন্তু তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়। কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-কাব্যে গৌতমী ও শার্ঙ্গরবের সঙ্গে শকুন্তলার রাজসভায় আগমনের দৃশ্যে দুষ্মন্তের সবিস্ময় উক্তির মধ্যে শোনা গিয়েছিল—'অয়ে কিমিদমুপন্যস্তম্'। —'কী সব উপন্যস্ত হইল।' বাংলায় ইংরেজি 'নভেলে'র অনুকরণে প্রবর্তিত এই গদ্য-সাহিত্যশাখার এই নামটি হয়তো কালিদাসের রচনা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশের অভিধানে বাংলায় বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত 'উপন্যাস' শব্দের অর্থ দেওয়া হয়েছে—'কাল্পনিক উপাখ্যান; উপকথা; কল্পিত গদ্যকাব্য। কাদম্বরী, বাসবদত্তা, দশকুমারচরিত ইত্যাদি কথাগ্রন্থকে উপন্যাস বলা যায়। অধুনা ইংরেজি নভেল বুঝাইতে উপন্যাস শব্দ ব্যবহৃত হয়। সুতরাং উপন্যাস অর্থে প্রকৃত জীবনের দৃশ্যাত্মক কাল্পনিক-কাহিনী সম্বলিত গদ্য গ্রন্থ'; ইত্যাদি। কালিদাসের শকুন্তলা-কাব্যে দুষ্মন্তের আংটির

'উপন্যাস' নামের ইতিহাস।

ব্যাপারটি তুচ্ছ নয়। দুষ্মন্তের উপহারপ্রদান,—দুর্বাসার অভিশাপ ও অনসূয়া কর্তৃক তোষণ,—শচীতীর্থের জলে অঙ্গুরীয়স্খলন, শক্রাবতারে ধীবরের অদৃষ্ট-ক্রমে রোহিতগর্ভস্থ অঙ্গুরীয়ের পুনরুদ্ধার এবং তার ফলে দুষ্মন্তের অপরিসীম প্রীতিলাভ ইত্যাদি বর্ণনার মধ্য দিয়ে ঘটনাধারার চমকপ্রদ আবর্তন দেখা গেছে সে বইখানিতে। 'উপন্যাস' নামটির উৎস হিসেবে তো বটেই এমন-কি 'অঙ্গুরী বিনিময়' [১৮৫৭] এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'—বাংলার এই প্রথম পর্বের দুখানি উপন্যাসের অঙ্গুরীপ্রসঙ্গের প্রেরণাস্থল হিসেবেও কালিদাসের কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' 'বিজ্ঞাপন' অংশে লিখেছিলেন—"গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে।" জীবনের বাস্তব সত্যের সাদৃশ্যে গল্প সৃষ্টি করাই হলো পরিণত উপন্যাসের প্রকৃত স্বধর্ম। এবং সেই সৃষ্টির গুণেই সার্থক উপন্যাসে দেশে-কালে পরিব্যাপ্ত মানুষের সন্ধান-সাফল্যের, হাসি-কান্নার রহস্যময় তাৎপর্য দ্যোতিত হয়ে থাকে। নীতির প্রতি মানুষমাত্রেরই কোনো-না-কোনো রকম আস্থা আছে। বাস্তব খণ্ড-সত্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে সব মানুষই মনে মনে এক-এক রকম আদর্শের শ্রেয়ত্ব মেনে নেন। জনে-জনে, অন্তরে-অন্তরে এই নীতি ও আদর্শের স্বরূপ সম্বন্ধে পৃথক বোধ-বিশ্বাস থাকা অসম্ভব নয়। তবে, ইহসংসারে যিনি যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো আদর্শের দিকে পৌঁছতে চান। ভূদেব মুখোপাধ্যায়-কথিত 'হিতোপদেশ শিক্ষা' ব্যাপারটি একরকম আদর্শের চেতনাই সূচিত করেছে। সে কেবল শিল্পজ্ঞানহীন নীতিবাগীশের উক্তি মনে করা সংগত নয়।

ভূদেব ও প্যারীচাঁদের উপন্যাসে নীতির প্রচার।

ভূদেবের এই বই সম্পর্কে ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, 'ভূদেব বাবুর ঐতিহাসিক উপন্যাস বাঙ্গালীর ইংরেজিওয়ালার লিখিত প্রথম উপন্যাস।' রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়' বলেছিলেন—

> "শ্রীযুক্ত প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙ্গালা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু তাহা হাস্য-রসের উপন্যাস। পাইকপাড়ার রাজাদিগকে স্ব-

সম্পর্কীয় গোপীমোহন ঘোষ প্রকৃত বাংলা উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা। তাঁহার লেখনী হইতে প্রথম বাংলা উপন্যাস বিনিঃসৃত হয়, সেই প্রথম উপন্যাসের নাম 'বিজয়বল্লভ', কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের সৃষ্টিকর্তা আমাদের পরম বিজ্ঞ বান্ধব শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়।"

'অঙ্গুরী বিনিময়'-এ ভূদেব যেমন কল্পনার মৌলিকতা দেখিয়েছিলেন, তাঁর 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস'-গ্রন্থেও তেমনি বিশিষ্ট মৌলিকতা দেখা গেছে। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাশক্তির যদি জয় হতো তাহলে ঐক্যের মন্ত্রে ভারতের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবন কেমন গৌরবময় হয়ে উঠতো, 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে' তিনি সেই ছবিই আঁকবার চেষ্টা করেছেন। 'এডুকেশন গেজেট' পত্রিকায় তাঁর এই লেখাটি ১২৮২ সালের কার্তিক থেকে প্রতি সপ্তাহে এক-এক পরিচ্ছেদ করে ছাপা হয় এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পরে গ্রন্থাকারে তা প্রথম প্রকাশিত হয়।

মৌলিক কল্পনার বিলাস এবং ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের জ্ঞান,—এই দুই সামর্থ্যের যোগে ইতিহাস থেকে কাহিনী নিয়ে ভূদেব যখন বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম দৃষ্টান্ত গড়তে ব্যস্ত ছিলেন, প্যারীচাঁদ মিত্র তখন পূর্বগামী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির প্রদর্শিত আদর্শে আমাদের সামাজিক দোষত্রুটির ব্যঙ্গচিত্র এঁকে আর একরকম শিক্ষাপ্রদ আখ্যান পরিবেষণে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম বিশেষ স্মরণীয়। কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র অনুকরণ করেছিলেন ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বহু লেখক। ভূদেব এবং প্যারীচাঁদের আদর্শে যথাক্রমে ঐতিহাসিক এবং সামাজিক আখ্যান চর্চার পথ খুলে গিয়েছিল সে-যুগে। আখ্যানবস্তুর শিল্পানুশীলনের সঙ্গে-সঙ্গে ভাষার উপযুক্ত মসৃণতা সাধনের চেষ্টা চলছিল। এই শেষের বিচারে, বাংলা উপন্যাসের এই গঠনপর্বে যাঁরা প্রধানতঃ কিংবা আদৌ উপন্যাস লেখেননি, সে রকম কোনো-কোনো লেখকের অন্ততর দানের কথাও বিচার্য। কালীপ্রসন্নের ভাষাগত বৈচিত্র্যের কথা সুপরিচিত। তাঁর 'মহাভারতে'র অনুবাদ আর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' একই ভাষারীতির দৃষ্টান্ত নয়। প্যারী-চাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি

উপায়' এবং 'অভেদী' তিনখানি বই অল্পবিস্তর পৃথক-পৃথক ভাষারীতির সাক্ষ্য দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম যুগের লেখাতে বিদ্যাসাগরের ভাষারই আধিপত্য। 'বঙ্গদর্শন'-এর সময় থেকে,—অর্থাৎ ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পরে তাঁর স্বকীয় ভাষার বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আখ্যানের জনপ্রিয়তা,—সংস্কৃত, ইংরেজি, আরবী, ফার্শি নানা কাহিনীর চর্চা,—সমাজের খুঁটিনাটি বহু ভাবনার প্রকাশ, —ভাষার দিকে লেখকদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ ইত্যাদি বহু ব্যাপারের যৌগ-পত্তে এইভাবে উনিশের শতকে বাংলা উপন্যাসের প্রবর্তন ঘটলো। 'এপিক, 'রোম্যান্স,' 'সাগা', 'ব্যালাড্' প্রভৃতি পাশ্চাত্য রীতির বিচিত্র সাহিত্য,—মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক,—উনিশের শতকের নবোদ্ভিন্ন বাংলা গদ্যে প্রচারিত দেশ-বিদেশের ইতিহাস, পুরাকথা, খোস-গল্প,—দান্তে, বোকাশিও, চসার, ম্যালরি ইত্যাদি প্রাচীনতর শক্তির প্রভাব তো বটেই, তাছাড়া, অপেক্ষাকৃত আধুনিকতর বিদেশী লেখকদের আদর্শও সেকালে বাংলা উপন্যাসের ধারা নিয়ন্ত্রণে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গেছে। জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টির পার্থক্য,—নানা যুগের নানা রুচি,—রাজনীতির ভাবনা, মনঃসমীক্ষার রেওয়াজ, দেশপ্রেম থেকে বিশ্ব-ঐক্যের দিকে মানুষের আগ্রহের প্রসার ইত্যাদি ব্যাপারের ফলে, শিল্পীর নিরলস মনের লালনে বাংলা উপন্যাসের রূপ বদলেছে। অন্যান্য প্রসঙ্গে তো বটেই,—এমনকি কেবল আয়তনের আদর্শে নজর রাখলেও একথার সারবত্তা বোঝা যায়। আধুনিক ইংরেজি উপন্যাসের অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব আয়তনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রাচীনতর আদর্শ যে অন্যরকম ছিল, তাও বলা হয়েছে। এইসূত্রে বাংলা উপন্যাসের কলেবরপুষ্টির ইতিহাসে তৎকালীন পাশ্চাত্য উপন্যাসের আয়তনের প্রভাবের কথা বিবেচ্য। বাংলায় সেকালে বড়ো আয়তনের উপন্যাসের অভাব লক্ষ্য করে অনেকে অনেক কথা বলেছেন। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবন অবলম্বনে লেখা প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'ই [প্রথম খণ্ড, ১৮৬৯; দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮৮৪] বাংলা সাহিত্যের প্রথম বৃহদায়তন উপন্যাস। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকায় 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র প্রথম খণ্ডের সমালোচনা ছাপা

মোট কথা

হয়। প্রসঙ্গতঃ 'আলালের ঘরের দুলাল', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' প্রভৃতির উল্লেখ করে সমালোচক এইসব উপন্যাসের হ্রস্বতার তুলনায় 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে'র দৈর্ঘ্য লক্ষ্য করে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'কেই সে যুগের শ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্যাস হিসেবে সমাদরণীয় মনে করেছিলেন ["decidedly the best and the greatest novel yet written in the language."]। বাংলা উপন্যাসের সার্থকতর দৃষ্টান্ত দেখা দিয়েছিল নানামুখী এই সব প্রয়াসের ঘাত-প্রতিঘাতে। দেশীয় এবং পাশ্চাত্য আখ্যানের প্রভাব,—বিভিন্ন লেখকের অক্লান্ত অনুশীলন—সমালোচকদের বিচিত্র কথা,—পাঠকসমাজের রুচির চাহিদা,—ঐতিহাসিক, সামাজিক, গার্হস্থ্য ইত্যাদি বিভিন্ন প্রসঙ্গের আকর্ষণের মধ্য দিয়ে আমাদের সাহিত্যে উপন্যাসের পথ এইভাবে অগ্রসর হয়েছে। অপেক্ষাকৃত খ্যাতিমান নেতৃস্থানীয় লেখকদের কেন্দ্রে রেখে অনুকরণপন্থী ভিন্ন-ভিন্ন দল গড়ে উঠেছে। সে প্রসঙ্গের বিশ্লেষণ অল্পকথায় শেষ হবার নয়। অতঃপর মোটামুটি দুদিক থেকে বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার—এক হলো তার উৎপত্তি ও ক্রমপরিণতির দিক,—অন্যটি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্বরূপচিন্তা। এখন, বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসের ধারাটি মোটামুটি এই কয়েকটি স্তরে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়া চলে—

[১] অংশতঃ মধ্যযুগের পদ্যে-লেখা, জনপ্রিয়, সমাজচিত্রময় মানব-জীবনের গল্প যেমন—রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, মুসলমানী গল্প ইত্যাদির স্মৃতি নিয়ে এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রথম যুগের গদ্যলেখকদের অনূদিত দেশ-বিদেশের ইতিহাস, পুরাণ, খোসগল্প প্রভৃতির নবসঞ্চয়ে আকৃষ্ট হয়ে উনিশের শতকের দ্বিতীয় দশকে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যঙ্গসমর্থ লেখক তদানীন্তন বাঙালী সমাজের এক ধরনের ব্যঙ্গচিত্র চালু করলেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর দশকের মধ্যে এই প্রবর্তনার কালপর্ব ধরে নিলে ভুল হয় না।

[২] সাময়িক পত্রিকা এবং সংবাদপত্রের যুগ তখন শুরু হয়েছে। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ 'বটতলার' সস্তা ছাপাখানার দৌলতে গল্পধর্মী গদ্য-পদ্য বহুবিধ রচনা ছড়িয়ে পড়ার ফলে লিখিত ও মুদ্রিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষের গল্প শোনার সহজাত আগ্রহ যুগোচিত উৎসাহ পেয়েছিল।

'রাজাবলী', 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্', 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র',

'ইতিহাসমালা', 'হিতোপদেশ', 'বত্রিশ সিংহাসন', 'পুরুষপরীক্ষা' ইত্যাদি তৎকালপ্রচলিত ইতিহাস ও নীতিমূলক গল্পের ধারা—এবং 'কলিকাতা কমলালয়', 'নববাবুবিলাস', প্রভৃতি সমাজচিত্র-সংবলিত ব্যঙ্গকাহিনীর ধারা —এই দুই গদ্য-গল্পপ্রবাহের পরিণততর, 'আধুনিকতর' উত্তরাধিকারী হলো যথাক্রমে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' [১৮৫৭] এবং প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' [১৮৫৭]।

[৩] ইতিমধ্যে রিচার্ডসন [১৬৮৯-১৭৬১], ফীল্ডিং [১৭০৭-'৫৪], স্মলেট্ [১৭২১-'৭১], স্কট [১৭৭১-১৮৩২], থ্যাকারে [১৮১১-'৬৩], ডিকেন্স [১৮১২-'৭০] প্রভৃতি ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের লেখার সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীর অল্পবিস্তর পরিচয় ঘটেছে। উপন্যাস যে গদ্যে লেখা 'কমিক'-মহাকাব্য, ফীল্ডিং-এর এই ধারণা বাঙালী পাঠকের না হোক্, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী লেখকদের মনে স্বীকৃতি পেয়েছে। ডিকেন্সের পরবর্তী ঔপন্যাসিক জর্জ মেরিডিথ [১৮২৮-১৯০৯] তাঁর 'Diana of the Crossways'-বইখানির মধ্যে উপন্যাসের যে সংজ্ঞা দিয়েছিলেন,—মানুষের ভিতর এবং বাহির দুই মিলিয়ে যে বাস্তব জীবন, উপন্যাস যে তারই সারসংক্ষেপ,—সে ধারণা হয়তো ধীরে-ধীরে বাংলার উপন্যাস-শিল্পের অগ্রণী সাধকসমাজের মনে উদিত হয়েছে। বাংলায় আধুনিক রীতির নাটকের পূর্বাভাস পাওয়া গেছে এই সময়ের মধ্যেই। পঞ্চাশের দশকে প্যারীচাঁদ ও ভূদেবের উপন্যাস প্রকাশের কাছাকাছি সময়েই যোগেন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস', তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন', হরচন্দ্র ঘোষের ভানুমতী চিত্তবিলাস' [শেক্সপীয়রের Merchant of Venice-এর মর্মানুবাদ], রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক' ইত্যাদি ছাপা হয়েছে। তার আগে থেকেই ইংরেজি নাটকের টুক্‌রো-টুক্‌রো অনুবাদের রেওয়াজ দেখা দিয়েছিল। নাট্যরচনার প্রযুক্তিতে সংলাপের মধ্য দিয়ে চরিত্র-রূপায়ণের যে আদর্শ সে সময়ে সাহিত্যানুরাগী বিদ্বজ্জনের চোখের সামনে নতুন উৎসাহে চিহ্নিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল,—আত্মকেন্দ্রিকতার পরিধি উত্তীর্ণ হয়ে জীবনকে বস্তুলীন, নৈরাত্ম দৃষ্টিতে দেখবার যে দৃগভঙ্গি নাটকের বিশিষ্ট দান, সেকালের উপন্যাস-লেখকদের মনে সে-সবের প্রভাব পড়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যনিবন্ধমালায় সমাজ-সমালোচনার উৎসাহ ছড়িয়েছিল।

সেকথাও মনে রাখা দরকার। তা'ছাড়া শেক্সপীয়র তখন বাংলার বিদ্যালয়ে-বিদ্যালয়ে প্রচারিত। ফলে, শুধু গল্প নয়, শুধু নাম-ধাম-দোষ গুণের বিবরণ নয়,—জীবনের ব্যাখ্যান ও বিশ্লেষণের দিকে ধীরে ধীরে একরকম যুক্তিবাদী মননের অঙ্কুর উদ্‌গত হতে আরম্ভ করেছে। কবিতার ক্ষেত্রে মধুসূদনের মহাকাব্যে যে দৃগভঙ্গির মৌলিকতা দেখা দিয়েছিল, গদ্যের ক্ষেত্রে কতকটা তেমনি অভিনব ব্যাপার দেখা গিয়েছিল বঙ্কিমের চিত্তাকর্ষক গল্পে উপন্যাসে।[১২]

[৪] তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, স্বর্ণকুমারী দেবী, দামোদর মুখোপাধ্যায়,—বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,—সেকালের অন্যতম খ্যাতিমান লেখক প্রতাপচন্দ্র ঘোষ,—বঙ্কিমের অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা-পর্বের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে এঁদের নাম স্মরণীয়। শিবনাথ শাস্ত্রী শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন বঙ্কিমযুগের দোষগুণে বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। রমেশচন্দ্র দত্ত বা প্রতাপচন্দ্র ঘোষ যেমন প্রধানতঃ বঙ্কিম-যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারাক্রমে স্মরণীয়, এঁরা তেমনি সেকালের সমাজচিত্র পরিবেষক-দের সূত্রে। আবার নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, অম্বিকা-চরণ গুপ্ত ছিলেন শিল্পগত অভিনবত্বের উৎসাহী।

[৫] ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাস,—'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'কপালকুণ্ডলা'র মতো 'রোম্যান্স'-শ্রেণীর রচনা,—'আলালের ঘরের দুলালে'র মতো সমাজচিত্র,—'মডেলভগিনী'-র মতো ব্যঙ্গচিত্র—'হরিদাসের গুপ্ত কথা', 'লণ্ডন-রহস্য' ইত্যাদি কুৎসা-উত্তেজনা-অসংযমের গল্প—পাঁচকড়ি দে, প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শরচ্চন্দ্র সরকার, মণীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির গোয়েন্দা-কাহিনী,—এই সবই ছিলো বঙ্কিম-যুগের বহুপ্রচলিত উপন্যাসধর্মী রচনার নিদর্শন।

১২। বাংলা উপন্যাসের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অন্যত্র [পৃঃ ১২৫—দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে—"এইসব গল্পধর্মী···স্মরণ করা দরকার] 'কোনো কোনো প্রবন্ধের' কথা স্মরণ করার আবশ্যিকতা স্বীকার করা হয়েছে। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত', 'লোকরহস্য' প্রভৃতি প্রবন্ধমালায় উপন্যাসোচিত চরিত্রসৃষ্টির প্রসঙ্গ স্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রসঙ্গে আরো একটি কথা স্মরণীয়। ১৩৪৫ সালে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানির ভূমিকায় লিখেছিলেন—'বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক'। আজ ১৩৬৩ সালেও সেকথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, এমন সুধী ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়।

[৬] বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ বলতে ১৮৬৫ থেকে ['দুর্গেশনন্দিনীর' প্রকাশকাল] শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের দীর্ঘ পর্বটি বুঝতে হবে। বিশের শতকের অদ্যাবধি তাঁর গল্প-উপন্যাসের আকর্ষণ ফুরোয়নি। অন্যান্য নানা শ্রেণীর রচনা লিখলেও প্রধানতঃ তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক। ভবানীচরণ, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি সমাজচিত্রণনিষ্ঠ গল্পকাররা জীবনের প্রত্যক্ষ বহির্ঘটনাপ্রবাহের রূপ ফুটিয়েছেন মাত্র, আর, বঙ্কিম উপলব্ধি করেছিলেন প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের সমন্বয়। অলৌকিক ও অস্বাভাবিকের সমাবেশ তাঁর লেখার উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব, সন্দেহ নেই। কিন্তু তার মানে দিবাস্বপ্নের প্রবণতা নয়। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত নিপুণ বিশ্লেষণের পথ ধরে 'দুর্গেশনন্দিনী'র বিশৃঙ্খল ঘটনাসমাবেশ থেকে শুরু করে উত্তরোত্তর অগ্রসর হয়ে এইকথাই প্রমাণ করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র 'বিশ্বের বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্যের আবিষ্কার' করতে চেয়েছিলেন এবং প্রত্যক্ষ জগতে রূপের যে প্রকাশ হয়, তার খণ্ডতা, সংকীর্ণতা, অস্পষ্টতা অতিক্রম করে তিনি অব্যক্ত, উন্নত ভাবের রূপ দিতে চেষ্টা' করেছিলেন। 'উত্তর-চরিতে'র সমালোচনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছিলেন—"যাহা, স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি।" 'দুর্গেশনন্দিনী' [১৮৬৫], 'কপালকুণ্ডলা' [১৮৬৬], 'মৃণালিনী' [১৮৬৯], 'বিষবৃক্ষ' [১৮৭৩] —এই চারখানি তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাস। 'চন্দ্রশেখর' [১৮৭৫], 'রজনী' [১৮৭৭], 'কৃষ্ণকান্তের উইল' [১৮৭৮] ও 'রাজসিংহ' [১৮৯৩], 'রাজসিংহ' [১৮৮৮-তে 'ক্ষুদ্র কথা' আকারে লিখিত, ১৮৯৩-খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে পরিবর্ধিত]—এই চারখানিতে তাঁর উপন্যাসের দ্বিতীয় যুগ শেষ হয়েছে। তারপর, 'আনন্দমঠ' [১৮৮২], 'দেবীচৌধুরাণী' [১৮৮৪] ও 'সীতারাম' [১৮৮৭]—এই তিনখানিতে তৃতীয় ও শেষ যুগ সীমিত। প্রথম যুগের শেষ বই 'বিষবৃক্ষ'-তে বঙ্কিমের উপন্যাস-শিল্পের পরিণত রূপ দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় যুগের প্রথম বই 'চন্দ্রশেখর' সম্বন্ধে ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন—

> " 'চন্দ্রশেখর' এক হিসাবে বঙ্কিমের নভেলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারে। কেবল এইখানেই বঙ্কিম নারী-চরিত্রের উন্মেষ হইতে পরিণতি পর্যন্ত সমগ্র রূপটি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।"

'রজনী'-তে তাঁর শিল্পকৌশলের নানা দক্ষতার নিদর্শন আছে। প্রথম যুগের 'বিষবৃক্ষের' সঙ্গে দ্বিতীয় যুগের 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র বিষয়বস্তুগত কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। "দুইটি উপন্যাসেরই মর্মকথা বিধবা নারীর সহিত জীবৎপত্নীক পুরুষের প্রেম এবং সেই প্রেমের অকল্যাণ পরিণাম।" প্রথম যুগের উপন্যাসে নিয়তির প্রাধান্য,—দ্বিতীয় যুগে নীতির। তৃতীয় যুগে তিনি শাস্ত্রজ্ঞানী, কর্মযোগী,—অনুশীলনতত্ত্বের প্রচারক, হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ['সীতারাম' স্মরণীয়]! 'আনন্দমঠ' থেকেই তাঁর উপন্যাসে শিল্প-দক্ষতার অবসান শুরু হয়েছে।

অতিশয় সংক্ষেপে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসশিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি এই পরিচয়টুকু জেনে রাখা দরকার। কাহিনী কল্পনার দিক থেকে ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বিচার করে দেখিয়েছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে জটিল আখ্যায়িকার পক্ষপাতী ছিলেন, পরে সরল, অমিশ্র কাহিনীর দিকে তাঁর চোখ পড়ে। বলা বাহুল্য, এসব কথার পুনর্বিচার আবশ্যক। তবে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবীচৌধুরাণী'—এই তিনটি কাহিনী যে তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় 'সরল ও অমিশ্র', সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' পুনরায় জটিলতার দিকে ঝুঁকেছে। তবে, 'সীতারাম' যে উঁচুদরের উপন্যাস হয়নি, সে বিষয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতানৈক্য নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ক'খানির মধ্যে একমাত্র 'রাজসিংহ'-কেই যথার্থ 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বলা হয়। এই বইখানির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তারই এক জায়গায় এই মন্তব্যটি দেখা গেছে—

> "সাধারণ ইতিহাসের একটা গৌরব আছে। কিন্তু স্বতন্ত্র মানবজীবনের মহিমাও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। ইতিহাসের উচ্চচূড় রথ চলিয়াছে, বিস্মিত হইয়া দেখো, সমবেত হইয়া মাতিয়া উঠ, কিন্তু সেই রথচক্রতলে যদি একটি মানবহৃদয় পিষ্ট হইয়া ক্রন্দন করিয়া মরিয়া যায় তবে তাহার সেই মর্মান্তিক আর্তধ্বনিও—রথের চূড়া যে গগনতল স্পর্শ করিতে স্পর্ধা করিতেছে সেই গগনপথে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, হয়তো সেই রথচূড়াকেও ছাড়াইয়া চলিয়া যায়।

বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।"

সামাজিক ও গার্হস্থ্য পরিবেশে,—কোথাও বা ঐতিহাসিক তথ্য ও কবিকল্পনার সমবায়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের প্রথম বিচিত্রকর্মা পথিকৃৎ-এর সামর্থ্য দেখালেন বঙ্কিমচন্দ্র। ১৮৬৫ থেকে শতাব্দীর শেষ অবধি তাঁর অনুকরণকারী লেখকদের উৎসাহ দেখা গেছে ভালোমন্দ অজস্র রচনায়। সেই উদ্দীপনাময় প্রাচুর্যের যুগেই উপন্যাসলেখক রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়।

সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করার আগে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে আর একটি কথা স্মরণ করা আবশ্যক। বিশের শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলার সাহিত্যসমালোচক-মহলে একটি রব উঠেছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস আর্টের দিক দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। শরৎচন্দ্র নিজে বঙ্কিমবিরোধী কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করার ফলে জনপ্রিয় শরৎচন্দ্রের সমকালীন পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে এই ধরনের একটি মতবাদ চালু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী প্রসিদ্ধ কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার তাঁর স্বাভাবিক তিরস্কারবচনের তীব্রতা দিয়ে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন—

> "বঙ্কিম-প্রতিভা ও শরৎ-প্রতিভা—পুরুষ ও নারী চরিত্রের মতো বিপরীত; অতএব ভাবের ক্ষেত্রে, বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রতি শরৎ-চিত্তের একটা আদিম বিতৃষ্ণা বা natural antipathy থাকাই স্বাভাবিক।

অবশ্য, শরৎচন্দ্রের বঙ্কিমবিরোধী মন্তব্য পুরোপুরি গ্রাহ্য নয়। কিন্তু মোহিতলালের প্রতিবাদও ঠিক মূল অভিযোগের জবাব নয়। কারণ, তিনি বলেছেন—

> "সকল কাব্যসৃষ্টির মত উপন্যাসেও বাস্তব-অবাস্তব ভেদ নেই—জীবন ও জগতের একটা রসরূপ উদ্ভাবন করাই তাহার মূলীভূত প্রেরণা।"

এ কথার পরে আর বাদ-প্রতিবাদ চলে না। মোহিতলালের বইয়ের নাম 'বঙ্কিম বরণ'। বঙ্কিম যে বাংলার আদি ঔপন্যাসিক, জীবনের নিপুণ সমালোচক এবং রসিক স্রষ্টা হিসেবে নিঃসন্দেহে বরণীয়, সে বিষয়ে সন্দেহের

অবকাশ নেই। মোহিতলাল তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন উচ্ছ্বাসিত ভাষায়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে আর্টের ব্যর্থতা সম্বন্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল সে বিষয়ে তাঁর কথা হলো এই যে, জীবনে বাস্তবতার কোনো স্থায়ী, সর্বজনীন মাপকাঠি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যদি কোথাও বাস্তবতার আদর্শ উপেক্ষা করে থাকেন তাহলে তা করেছেন শেক্‌সপীয়রের মতো রসদৃষ্টির তাগিদে,—গিরিশ ঘোষের মতো অক্ষমতার অন্ধতায় নয়।

[৭] ১৮৭৭-'৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দ্বিতীয় যুগে, 'ভারতী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের প্রথম উপন্যাস 'করুণা' ছাপা হয়। তাঁর এ রচনা বই হয়ে বেরোয়নি। সাতাশ পরিচ্ছেদে বাঁধা এই অসমাপ্ত উপন্যাসের বিষয়ে সমালোচক লিখেছেন—

> "বিষয়বস্তু কিশোর-কবির কাব্যগুলির অনুরূপ,—নিষ্ঠুরের হস্তে প্রণয়ভীরু কিশোরীর নিপীড়ন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই অপরিণত লেখাটির মূল্য যে একেবারে নাই তাহা নয়। মোহিনী-মহেন্দ্রর গৌণ কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণকান্তের উইলের ছায়া সত্ত্বেও চোখের-বালির পূর্বাভাস পাই। করুণার মহেন্দ্র ও রজনী চোখের-বালির মহেন্দ্র ও আশাতে পরিণত হইয়াছে।"

'করুণা'-র প্রায় বছর চারেক পরে 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের পরিণততর প্রথম উপন্যাস 'বৌঠাকুরাণীর হাট' প্রকাশিত হতে থাকে। 'স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের ক্ষীণ কাহিনীসূত্র' ধরে তিনি এই উপন্যাসখানি এবং কিশোরপাঠ্য গল্প 'মুকুট' ও দ্বিতীয় উপন্যাস 'রাজর্ষি' লিখেছিলেন। গ্রন্থাকারে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ছাপা হয় ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এবং 'রাজর্ষি' তার প্রায় চার বছর পরে ১৮৮৭-র ফেব্রুয়ারি-তে। পরে, ১৮৯০-এ 'রাজর্ষি'-র প্রথমাংশের ওপর নির্ভর করে 'বিসর্জন' লেখা হয়; আবার ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' থেকেই 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের জন্ম হয়।

'রাজর্ষি'র অনেককাল পরে নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর তৃতীয় উপন্যাস 'চোখের বালি' ছাপা হয়ে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। 'করুণা', 'বৌঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি', এই তিনখানিতেই তাঁর উপন্যাসের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয় এবং 'চোখের বালি' থেকে দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত ঘটে। 'চোখের বালি'র পরে লেখা হলেও 'নৌকাডুবি'-র তুলনায়

'চোখের বালি' যেন পরিণততর মনন ও কল্পনার গুণে সমৃদ্ধ মনে হয়। অনেকদিন আগে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর শরৎচন্দ্র বইখানির এক জায়গায় লিখেছিলেন যে, শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের প্রবর্তিত প্রকাশরীতি অবলম্বন করেননি। "চোখের বালি, গোরা প্রভৃতির মধ্যে যে বিস্তৃত বিশ্লেষণের চিত্র পাই তাহাই বিস্তৃততর ও সূক্ষ্মতর হইয়াছে শরৎচন্দ্রের রচনায়।" এই উক্তির সঙ্গে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

> "বিনোদিনীকে দেখিয়া মনে হয়, সে যেন শরৎচন্দ্রের কোনো অলিখিত উপন্যাসের নায়িকা। কিম্বা বলা উচিত যে,—যেহেতু চোখের বালির আগে শরৎচন্দ্রের কোনো উপন্যাস লিখিত হয় নাই—শরৎচন্দ্রের অনেক নারীচরিত্রই বিনোদিনীর ধাতুতে গঠিত।"

'চোখের বালির' এই বিশেষত্বের কথা স্মরণীয়। পরবর্তী রচনা 'নৌকাডুবি' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯০৬-এর সেপ্টেম্বরে। তারপর ১৩১৪ থেকে ১৩১৬ সালের মধ্যে 'প্রবাসী'তে পর্যায়ক্রমে ছাপা হয়ে ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর বিস্তৃততম উপন্যাস 'গোরা' গ্রন্থাকারে দেখা দিলো। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক এবং 'গোরা' উপন্যাস, দু'খানি বইয়ের মধ্যেই গান্ধীজীর আত্মিক শক্তি-সাধনার পূর্বাভাস ধরা পড়েছে। একই সময়ে, ১৩১৬ সালের পৌষ সংখ্যার 'প্রবাসী'তে তাঁর 'তপোবন' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। শতাব্দীর তৃতীয় দশকের প্রারম্ভে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্মজীবনে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। 'গোরা' তার বহু পূর্ববর্তী বই। ভূয়োদর্শী কবির মন যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দর্পণ, রবীন্দ্রনাথের এইসব রচনাতে সে সত্যের সংশয়াতীত সমর্থন পাওয়া গেল। আয়তনে বিশাল,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চরিত্রের রূপায়ণেও প্রযত্নময়,—সমাজ-চিন্তায় সমৃদ্ধ,—ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাময় 'গোরা'-র পর্যালোচনকালে টলস্টয়ের War and Peace বইখানির সাদৃশ্য মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতায়' কিংবা যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী'তে ব্রাহ্মসমাজের এক ধরনের সমালোচনা দেখা গিয়েছিল, এই প্রবন্ধের অন্যত্র সেকথা বলা হয়েছে। কিন্তু 'গোরা'-তে ব্রাহ্মসমাজের দোষ-গুণ দেখা হয়েছে

সুস্থতর মানবহিতৈষীর ভঙ্গিতে। দেহ-মনের অপূর্বকল্পিত অপরিসীম শক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে গোরা ; বুদ্ধিতে-আনন্দে, দেশপ্রেমে-বিশ্বাত্মবোধে বাংলা উপন্যাসের সংখ্যাতীত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে সে হলো স্মরণীয়তম একজন। পরেশবাবু, আনন্দময়ী, বিনয়, সুচরিতা, ললিতা, পানুবাবু, বরদাসুন্দরী, কৃষ্ণদয়াল, হরিমোহিনী ইত্যাদি ভালোমন্দ অজস্র মানুষ এই কাহিনীর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, বক্তৃতা, বিতর্ক কতো যে বিচিত্র ব্যাপার এখানে জায়গা পেয়েছে! গ্রাম, নগর,—শিক্ষিত অশিক্ষিত,—স্ত্রী, পুরুষ সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ একটি জগতের প্রসার আছে এই উপন্যাসে। কেউ কেউ এ বইয়ের চরিত্র রূপায়ণের খুঁৎ ধরেছেন। গোরাকে কেউ কেউ অতিরিক্ত তার্কিক, অতিরিক্ত যোদ্ধা মনে করে পীড়া বোধ করেছেন। 'নৌকাডুবি', 'চোখের বালি', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি উপন্যাসের জননী-চরিত্রের তুলনায় 'গোরা'র আনন্দময়ী অনেক বেশি স্মরণীয়। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী 'অবিচলিত সত্যাকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত' গান্ধারী চরিত্রের সঙ্গে আনন্দময়ীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন।[১৩] বিশেষ ভাবে এই বইখানির ওপরেই নজর রেখে চরিত্র, তত্ত্বকথা, সংলাপ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন দিক নিয়ে অনেক মন্তব্য, অনেক উদ্ধৃতি পরিবেষণ করা চলে! কিন্তু অনাবশ্যক বাগবিস্তারের প্রয়োজন নেই। মূলতঃ তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে 'গোরার' স্বভাবগত বৈসাদৃশ্য নেই। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত একবার ছোটো একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> "ঔপন্যাসিকের মধ্যে কেহ বা কথারস, কেহ বা ভাবরসকে বিশেষভাবে আশ্রয় করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রধান রস ভাবরস। তিনি যে কয়খানি উপন্যাস লিখিয়াছেন, প্রত্যেকটিই কেবলমাত্র কাহিনী হিসাবে সুন্দর—কিন্তু তার উপাখ্যান যাহা তাহা অতি সংক্ষেপে বলা যায়।"[১৪]

অবশ্য 'গোরার' গল্পটুকুও সংক্ষেপে বলা দুঃসাধ্য—কারণ, সে গল্প তার তত্ত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ সম্পর্কে জড়িত ; এবং সে তত্ত্বময় গল্প একটি ঝড়ের সঙ্গে তুলনীয়। বুদ্ধদেব বসু সরাসরি সেই কথাই স্বীকার করেছেন—

১৩। বাংলা সাহিত্যের নরনারী—প্রমথনাথ বিশী।

১৪। উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ['জয়ন্তী-উৎসর্গ' দ্রষ্টব্য]—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

"কিশোর বয়সে 'গোরা' উপন্যাসটি প্রথম যখন পড়েছিলাম মনে হয়েছিলো আমার উপর দিয়ে প্রবল একটা ঝড় বয়ে গেলো।...

...বহু চরিত্র ও ঘটনার বৈচিত্র্য নিয়ে জীবনের কোনো-এক রকম সমগ্রতার রূপসৃষ্টি উপন্যাসের যে বিভাগের চরিত্রলক্ষণ, তার মধ্যে 'গোরা' একটি উজ্জ্বল আসন অধিকার করে আছে। বিশেষ একটি দেশের বিশেষ একটি যুগের সম্পূর্ণ মর্মকথা এই গ্রন্থে প্রকাশিত।"[১৫]

'গোরার' পরে ১৩২১ সালের 'সবুজপত্রে 'চতুরঙ্গ' ছাপা হয়েছিল। 'সবুজপত্রে'-ই ১৩২২-এ ছাপা হয় 'ঘরে বাইরে'। গ্রন্থাকারে এই দু'খানি বইয়েরই প্রকাশকাল হলো ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ। নানা কারণে, এই দুটি বই সম্বন্ধে মিতবচন রক্ষা করা দুঃসাধ্য। কথকতার অভিনবত্বে, পদ্ধতির চমকে, ভাষারীতির বিশিষ্টতায় ['চতুরঙ্গ' সাধুরীতির শেষ বই, 'ঘরে বাইরে' চলিত রীতির প্রথম] এ বই দুখানি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-পাঠকের বিশেষ মনোযোগ দাবী করে। তবে, কোনো কোনো সমালোচক 'চতুরঙ্গ'-কে আদৌ উপন্যাস বলে স্বীকার করতে রাজী হননি। আয়তনের কথা তুলে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী দেখিয়েছেন যে 'শেষের কবিতা'-ই রবীন্দ্রনাথের হ্রস্বতম উপন্যাস এবং 'দুই বোন' [১৯৩৩], 'মালঞ্চ' [১৯৩৪] ও 'চার অধ্যায়' [১৯'৪], শেষ দিকের এই তিনখানি বই আকৃতিতে 'ছোট গল্পের মাপের' এবং 'উপন্যাসের ছাঁচে ঢালাই' হয়েছে বটে, তবে 'পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের গৌরব' এরা দাবী করতে পারে না। তাই 'অন্য নামের অভাবে' এগুলিকে তিনি 'খণ্ডোপন্যাস' বলেছেন। 'চতুরঙ্গ'কে কিন্তু 'খণ্ডোপন্যাস' নামেও চিহ্নিত করা হয় নি; তাঁর কথা হলো—"ও বইখানা পুরা উপন্যাসও নয়, আবার রীতিমতো ছোট গল্পও নয়; উপন্যাস ও ছোটগল্পের গাঁটছড়া বাঁধিয়া ওখানা রচিত, উহাকে বর্তমান হিসাবের মধ্যে ধরিলে চলিবে না।"[১৬]

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যেমন, শিল্পসৌন্দর্যের দিকেও তেমনি 'চতুরঙ্গ' সূক্ষ্ম কারুকৃতির নিদর্শন। ডক্টর সুকুমার সেনের একটি কথাতেই পূর্ণ

১৫। রবীন্দ্রনাথ: কথা সাহিত্য—বুদ্ধদেব বসু।
১৬। রবীন্দ্র-বিচিত্রা—প্রমথনাথ বিশী।

পরিচয়ের ইশারা ফুটেছে—"রসসাধনার...রসাল দিকটার বিপদ যে কত গভীর তাহা রবীন্দ্রনাথ চতুরঙ্গে দেখাইয়াছেন।" 'ঘরে বাইরে'-তে 'গোরা'র ভাবপ্রকৃতির অনুবৃত্তি বা পুনরালোচনা লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন—"গোরায় যাহার অস্পষ্ট আভাস, ঘরে-বাইরেয় সেই আসন্ন নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলনেরই ভবিষ্যৎ কথা ও ফলশ্রুতি। ঘরে-বাইরে বাঙ্গালার অনতি-অতীত স্বদেশী-বিপ্লব প্রচেষ্টার ভাষ্য এবং ভারতবর্ষের অচিরগামী নন্‌-কোঅপারেশন আন্দোলনের উপোদ্‌ঘাত।"

এই দুখানি বইয়ের পারস্পরিক আরো একরকম দূরত্বের কথা চিন্তনীয়। বুদ্ধদেব বসুর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সে চিন্তার আভাস দেখা গেছে—"'চতুরঙ্গ' যেমন সংহতির, তেমনি তার বিপরীত গুণ উচ্ছলতার উদাহরণ 'ঘরে-বাইরে'।" এ মন্তব্য শুধু এই বই দুখানির বহিরঙ্গ সম্বন্ধেই যে প্রযোজ্য, তা নয়। এর লক্ষ্য গভীরতর।

'ঘরে বাইরে'র পরে ১৩৩৪-৩৫ সালের 'বিচিত্রা'-য় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়ে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো 'যোগাযোগ'। তাঁর 'শেষের কবিতা'ও এই বছরেই ছাপা হয়। অতঃপর পূর্বোক্ত 'খণ্ডোপন্যাস'-এর কাল। 'শেষের কবিতা' যখন লেখা হয় তখন 'কল্লোল' পত্রিকার ধ্বজাধারী তথাকথিত আধুনিক দৃষ্টির লেখকরা আসরে উপস্থিত হয়েছেন। এই দলের প্রসিদ্ধ এক প্রতিনিধি লিখেছেন—

> "আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছুটেছে তীক্ষ্ণতার দিকে, তীব্রতার দিকে, তার প্রভাবে তখন রবীন্দ্রনাথের রচনাকে বড্ড বেশি মৃদু বলে ঘোষণা করতে আমরা কুণ্ঠিত হইনি। ঠিক এই রকম সময়ে রবীন্দ্রনাথের দুটি নতুন উপন্যাস বিভিন্ন মাসিকপত্রে পর পর দেখা দিলো। কোনো গম্ভীর রাগিণীর আলাপের মতো 'যোগাযোগের' আরম্ভ, তাতে সাড়া দিতে একটু দেরি হলো আমাদের; কিন্তু 'শেষের কবিতার' প্রথম কিস্তি বেরোনোমাত্র বিকিয়ে যেতে হলো।"

১৯২৯-এর পরে তাঁর যেসব 'খণ্ডোপন্যাস' বের হয়েছে, সেগুলি প্রধানতঃ ভাবৈশ্বর্যময় কবিপ্রাণের শিল্পপ্রয়াসের বাহন। উপন্যাসের বিস্তার কমে গিয়ে গীতিকাব্যোপম অল্পায়তন সুগভীরতার প্রাধান্য ঘটেছে এই স্তরে এবং সেই

সঙ্গে নতুন কালের নতুন লেখকসমাজের উপস্থিতির চিন্তা,—ভাবার তীব্রতা, তীক্ষ্ণতা,—চমকপ্রদ অভিনবত্বের দিকে ভাষাজাদুকরের অতিরিক্ত আগ্রহ, উজ্জ্বল—সংলাপের মোহ,—অ-সাধারণ, অ-সামান্য চরিত্র নির্বাচনের পক্ষপাত এই পর্বের অবশ্য-উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্যের কারণ জুগিয়েছে।

[৮] অতঃপর শরৎচন্দ্রের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম সমৃদ্ধি বিস্তারের সমকালীন মানুষ। বাংলা সাহিত্যের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সেকালের বাঙ্গালী লেখকদের মধ্যে সন্দেহের অন্ত ছিল না। ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী সে সময়ে বাংলা পড়তে বিমুখতা বোধ করতেন। বঙ্কিমের পিতা যাদবচন্দ্র নিজে চাকরিতে 'ডেপুটি কালেক্টর' পদ পর্যন্ত উঠেছিলেন। তাঁদের পরিবারে সুখ-শান্তির একটা স্থিতিভাব ছিল। শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করলে এ-কথার অভিপ্রেত অর্থ বোঝা যাবে। শরৎচন্দ্র নিজে তাঁর পিতার 'অস্থির স্বভাবের' কথা বলেছেন। তাছাড়া যে পরিবারে শরৎচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকিল হতে।"[১৭] পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত পরিবেশের বিচারে বঙ্কিমের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পার্থক্য বহুবিস্তীর্ণ, বহুবিচিত্র। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম যখন খুলনায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি তাঁর প্রথম উপন্যাস Rajmohon's Wife ইংরেজিতে লেখা শুরু করেন। কিন্তু ১৮৫৮ সালে যশোহরে দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, ১৮৬০-এ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রকাশ ইত্যাদি ব্যাপার হয়তো মাতৃভাষার দিকে তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। ১৮৬১-তে পাদ্রী লংসাহেবের কারাদণ্ড এবং মরেলগঞ্জে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার দমনে বঙ্কিমচন্দ্রের সক্রিয় অংশ-গ্রহণ,—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, মধুসূদন দত্ত ইত্যাদি সমকালীন সুধী ব্যক্তির শুভ ব্যক্তিত্বের প্রভাব হয়তো বঙ্কিমমানসের অভিমুখিতার পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'বঙ্কিম-মানস' গ্রন্থে সেসব কথা আলোচনা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবকালের প্রকৃতি অন্যরকম। বঙ্কিমের উপন্যাস পড়েই তিনি উপন্যাসের প্রেমে পড়েছিলেন। 'জয়ন্তী উৎসর্গে' সংকলিত তাঁর পূর্বোক্ত অভিভাষণের মধ্যে তিনি নিজে বলে গেছেন—

১৭। ১৩৩৮ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী সভায় সভাপতির অভিভাষণ—শরৎচন্দ্র

"এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধ হয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তার পরে এল বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনার ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও পারিবারিক পরিবেশের দিক থেকে, অর্থ-প্রতিপত্তির দিক থেকে, অনেক পার্থক্য ছিলো, সন্দেহ নেই। কিন্তু শরৎচন্দ্র একেবারে ভিন্ন ভূমিকায় অবস্থিত। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে 'শ্রীকান্তে'র যে ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়, তার ভূমিকাতে শরৎচন্দ্রের যে ইংরেজি বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছিল তা থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, দারিদ্র্যের জন্যই শরৎচন্দ্রের শৈশব ও বাল্যজীবন নানাভাবে ব্যাহত হয়েছে। ১৮৭৬-এর-১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মতারিখ। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভাগলপুরে এবং দেবানন্দপুর গ্রামে কেটেছে। ১৮৮৭-তে তিনি ভাগলপুরে ইস্কুলে ভর্তি হন। ১৮৯৩-খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় হুগলিতে ভর্তি হয়ে, পরে আবার ভাগলপুরে ফিরে ১৮৯৪ সালে আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫-৯৬ সালে তিনি ভাগলপুর কলেজে এফ-এ পড়েছিলেন। ১৮৯৫ সালেই তাঁর জননী ভুবনমোহিনী দেবীর মৃত্যু হয়। অতঃপর তাঁর জীবনের স্রোত বয়েছে অতিশয় এলোমেলো হাওয়ার ধাক্কায়। ১৯০০ থেকে ১৯০২ তাঁর নিরুদ্দেশ জীবন। এই সময়ে তিনি কিছুদিন মজঃফরপুরে ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। তারপর ভাগলপুরে ফিরে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই চাকরির সন্ধানে কলকাতায় আসেন। ১৯০৩-এর জানুয়ারি মাসে তিনি ব্রহ্মদেশ অভিমুখে সমুদ্রপাড়ি দিয়েছিলেন।

বাংলা ১৩১০ সালে শরৎচন্দ্রের প্রথম ছাপা লেখা 'মন্দির' বেরিয়েছিল। তার বছর চারেক পরে 'ভারতী'তে তাঁর 'বড়দিদি' লেখাটি ছাপা হয়। অতঃপর ১৩১৯ সালের 'যমুনা' পত্রিকায় তাঁর 'বোঝা' গল্পটি আত্মপ্রকাশ করে। 'যমুনা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ফণীন্দ্রনাথ পাল। ১৩১৯ সালে সেকালের প্রসিদ্ধ 'সাহিত্যের' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির আগ্রহে এবং শরৎচন্দ্রের মাতুল উপেন্দ্রনাথের আনুকূল্যে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি লেখা 'সাহিত্য' পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল।

'যমুনা'-তে 'রামের সুমতি', 'পথনির্দেশ' এবং 'বিন্দুর ছেলে' পর-পর ছাপা হতে দেখে ১৯১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলার সাহিত্যপাঠক-মহলে বিস্ময়ের অন্ত ছিলনা। ১৯১৩-তে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকা বের হলে সে কাগজে শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ' ছাপা হলো। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশকেরা শরৎচন্দ্রের বই ছাপতে শুরু করলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রকাশালয় থেকে তাঁর 'বিরাজ বৌ' আর 'বিন্দুর ছেলে' এবং বর্তমান এম-সি-সরকার কোম্পানী থেকে তাঁর 'পরিণীতা' এবং 'পণ্ডিতমশাই' বের হলো।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্ব এবং 'চরিত্রহীন' ১৯১৭-তে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে ঐ বছরেই তাঁর আরো ক'খানি বই বেরিয়েছিল। ১৯১৮-তে তেমনি একই সঙ্গে 'দত্তা', 'শ্রীকান্তের' দ্বিতীয় পর্ব এবং আরো কিছু লেখা বের হয়। সাহিত্য সৃষ্টির পথ বেছে নিয়েই পূর্ণ উদ্যমে তিনি কাজে নেমেছিলেন।

বাংলা ১৩২০ সালে,—অর্থাৎ, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর প্রথম প্রবেশের প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই 'যমুনা' পত্রিকায় 'শ্রীমতী অনিলা দেবী' ছদ্মনামে তিনি 'নারীর মূল্য' নামে কতকগুলি প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। সে ঘটনার প্রায় ন' বছর পরে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় তিনি 'পথের দাবী' নামে একখানি উপন্যাস লেখা শুরু করেন। সে উপন্যাসের বিষয়বস্তু দেশের তৎকালীন রাষ্ট্রচিন্তার সঙ্গে জড়িত। ১৯২৯-এর বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর সভাপতি হিসেবে তিনি যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেটি 'তরুণের বিদ্রোহ' নামে ছাপা হয়েছিল। তার বছর তিনেক পরে তাঁর 'স্বদেশ ও সাহিত্য' গ্রন্থাকারে ছাপা হয়। শিক্ষা, সমাজ

রাজনীতি, নারীজীবন, সাহিত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের চিন্তামূলক প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছিল এই বইখানির মধ্যে।

পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে তিনি জীবনের সত্য লাভ করেছিলেন। আন্তরিক সাধনার বলে তিনি তাঁর সমকালীন বাংলা দেশের সাহিত্য-মানসের সমাদর অর্জন করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের তারিখ ১৯৪১-এর ৭ই আগষ্ট। তার বছর তিনেক আগে ১৯৩৮-এর ১৬ই জানুয়ারি তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলার সাহিত্যকর্মীদের একটি বিশেষ সমৃদ্ধির যুগে,—রবীন্দ্রনাথের আয়ুষ্কালের মধ্যে, বাংলার জনপ্রিয় গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব হয়েছিল। প্রকাশ্যভাবে তাঁর সাধনার কাল প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর—১৯০৩ থেকে ১৯৩৮। পঁয়ত্রিশ বছরের অক্লান্ত শ্রমে এবং আন্তরিক সমবেদনার গুণে আমাদের গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্র তিনি নানাভাবে প্রসারিত করে দিয়ে গেছেন। সূক্ষ্ম ভাবনা-চিন্তার কাজ তিনি অনেক দেখিয়েছেন, মানুষের অসহায় অবস্থার কারুণ্য ফুটেছে তাঁর অনেক পাত্র-পাত্রীয় মধ্যে, সমাজের দোষক্রটির কথাও তিনি অনেক বলেছেন। এসব সামগ্রীর দাম কম নয়। তবু মনে হয়, আমরা তাঁর হাত থেকে আরো বড়ো, আরো প্রত্যক্ষ একটি উপহার পেয়েছি—বিদ্যা-বিত্ত-নারী-পুরুষ-ধর্ম-সংস্কার নিরপেক্ষভাবে সাধারণ, সামান্য মানুষের প্রতিদিনের জীবনের পাথেয়রূপে মানুষকে ভালবাসবার অসামান্য আদর্শ তিনি পুনরাবিষ্কার করেছিলেন। সেই আবিষ্কৃতিই তাঁর সাহিত্যের চমৎকৃতি। বুদ্ধির চেয়ে বোধিতে তাঁর সহজ আশ্রয় ছিলো। তাই শরৎচন্দ্রের আবেদন সরল,—সরল এবং ব্যাপক।

প্রথম যুগের বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের রীতি ছিল গল্পপ্রধান, মহামানবচিত্রণনিষ্ঠ, অধিক বিশ্লেষণে বিমুখ। রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ কয়েকটি চরিত্র অবলম্বন করে তাদের মনোগহনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তরঙ্গসংঘাত উদ্ঘাটন করলেন। তাঁর অপূর্ব ভাষার গুণে তাঁর বিশ্লেষণ-রীতি সমঝদারের প্রশংসা পেলো। কিন্তু দেশে যেহেতু উচ্চ সংস্কৃতি-শোধিত মনের সংখ্যা বেশি নয়, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের প্রকৃত ভক্তসংখ্যা সেই কারণেই খুব বেশি নয়। শরৎচন্দ্র অনুভূতির পথেই রবীন্দ্রনাথের অনুসরণকারী হলেন। তিনি

তাঁর উপন্যাসে সাধারণ মানুষের জীবনের কথা ফুটিয়ে তুললেন। সমাজের আচারের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি সাধারণের বোধগম্য বিদ্রোহের রব তুললেন। রবীন্দ্রনাথ সে কাজ আগেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম ভাবরস যেন আরো বস্তুমিশ্রিত হয়ে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে জনসাধারণের পক্ষে বেশি বোধগম্য হলো। একদিকে ভালোবাসার সহজাত শক্তি,—অন্যদিকে, সমাজের আচার এবং সংস্কারের শক্ত বাঁধন,—এই দু'য়ের বিপুল চাপে আমাদের মেয়েদের মন ক্ষত-বিক্ষত। শরৎচন্দ্রের নারীমানসের এইটিই মুখ্য পরিচয়। তাঁদের সেবা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণের কথায় শরৎচন্দ্রের যেন ক্লান্তি ছিলনা। বাংলাদেশে শরৎচন্দ্রের আয়ুষ্কালের প্রায় শেষ পর্ব অবধি মেয়েদের সঙ্গে পুরুষের সমাজের পার্থক্য ছিলো। তিনি সেই পৃথক অবস্থার কথাই প্রধানতঃ বলে গেছেন। এবং তথাকথিত সতীত্বের ধারণা তাঁর নতুন দৃষ্টিতে সমালোচিত হয়েছে। আর, পুরুষকে তিনি প্রধানতঃ নারীচরিত্র-মহিমার সহায়ক হিসেবে দেখেছেন।

শরৎচন্দ্রের গল্পে-উপন্যাসে বাংলার সাহিত্যামোদী পাঠকসমাজ যখন বিশেষ আনন্দে মগ্ন ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের মিলিত প্রতিভার সেই শুভ প্রভাবের মধ্যেই দেশের সমাজজীবনে ধীরে-ধীরে পটপরিবর্তন হচ্ছিলো। তারপর চারুচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, সৌরেন্দ্রমোহন, অনুরূপা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্যকুমার-প্রবোধকুমার-বুদ্ধদেব-অন্নদাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, বনফুল, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এবং আরো অনেকের আবির্ভাব দেখা গেছে। এঁদের পরে বাংলার নবীনতর সমকালীন ঔপন্যাসিকদল উপন্যাসের কলাকৌশলে এবং বিষয়বস্তুতে আরো বৈচিত্র্য এনেছেন।

বাংলার সাহিত্য-বিবেক

বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার ধারা

আধুনিক কালে সম্পাদকের দায়িত্ব

বাহাত্তর বছর আগেকার কথা। 'সাবিত্রী' লাইব্রেরি'র পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে [১১ই চৈত্র, ১২৯০] 'অকাল কুষ্মাণ্ড' নামে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তখনকার বাংলা দেশের সাময়িক সাহিত্যের প্রাচুর্য সম্বন্ধে কটাক্ষ এবং তিরস্কার করেছিলেন। এই ঘটনার বছর তিনেক আগে ১২৮৭ সালের অধিবেশনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বঙ্গদর্শন' [বঙ্কিমচন্দ্র], 'আর্যদর্শন' [যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ], 'বান্ধব' [কালীপ্রসন্ন ঘোষ] ও 'ভারতী' [দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর],—এই ক'খানি পত্রিকার বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন এবং 'পঞ্চানন্দ নামক রহস্যপূর্ণ সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক" ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাও উল্লেখ করেছিলেন। প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি লিখেছিলেন—"চিহ্নিত সিবিল সার্বাণ্ট হইতে সামান্য স্কুল-মাষ্টার পর্যন্ত বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।...এখনও একটি কথা বাকি আছে। যে কেহ বাঙ্গালা সাহিত্য লিখিতেছেন তাঁহারই অন্য ব্যবসায় আছে,...কিন্তু সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি করিতে হইলে, সাহিত্য একটি ব্যবসায় হওয়া চাই, আজিও তাহা দাঁড়ায় নাই। ...আমার বোধ হয়, বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত ও বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ভিন্ন আর কেহই শুদ্ধ সাহিত্যের উপর জীবিকার জন্য নির্ভর করেন না। কিন্তু এরূপ অবস্থা অধিক দিন থাকা বাঞ্ছনীয় নহে।" এই দুরবস্থা সত্ত্বেও শাস্ত্রী মহাশয় নৈরাশ্য স্বীকার করেননি। তাঁর সেদিনের মন্তব্য যেন সত্যদ্রষ্টার ভবিষ্যদ্বাণী —"আমরা দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গীয় সাহিত্যের পরিণাম অতি শুভকর, বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি অনন্ত ও উন্নতিকাল সমাগত।" 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তৎকালীন বাংলা সাময়িক সাহিত্যের এই আশা-ভরসার দিকটিতে বেশি জোর দেননি। তিনি দেখেছিলেন এর বিপরীত দিক। সাময়িক পত্রিকার অতিরিক্ত প্রাচুর্য দেশের যথার্থ সাহিত্য-পিপাসার ফল নয়, বরং এক রকম অস্বাস্থ্যেরই লক্ষণ, এই ছিলো তাঁর প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়। বাংলা ১২৯০ সালের [ইং ১৮৮৩] কাছাকাছি সময়ে য়ুরোপের চিন্তাশীল

ব্যক্তিরা ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রে নিষ্প্রাণ, অল্পমূল্য কথার বাড়াবাড়ি দেখে আক্ষেপ করেছিলেন। ইংরেজিতে এই ধরনের বাচালতার নাম 'ক্যাণ্ট'। রবীন্দ্রনাথ সে কথার উল্লেখ করেছিলেন—"ভাব যখন স্বাধীনতা হারায়, দোকানদারেরা যখন খরিদ্দারের আবশ্যকতা বিবেচনা করিয়া তাহাকে শৃঙ্খলিত করিয়া হাটে বিক্রয় করে, তখন তাহাই 'ক্যাণ্ট' হইয়া পড়ে। য়ুরোপের বুদ্ধি ও ধর্মরাজ্যের সকল বিভাগেই 'ক্যাণ্ট' নামক একদল ভাবের শূদ্রজাতি সৃজিত হইতেছে।"

সুদূর ১২৯০ থেকে আমাদের বর্তমান কাল অবধি এই সত্তর বছরের প্রসার বেশ দীর্ঘ সন্দেহ নেই। দেশের অবস্থা বদলেছে ইতিমধ্যে। সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং গুণগরিমাও বেড়েছে বৈকি। আজকাল প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক ইত্যাদি সবরকম বাংলা লেখার জন্যেই কিছু-কিছু পারিশ্রমিকও পাওয়া যায়। সাহিত্যকর্মের এই ব্যাপক উৎসাহের দিনে রবীন্দ্রনাথের সুদূর অতীতের সেই 'অকাল কুষ্মাণ্ড' প্রবন্ধটির কথা তবুও অবান্তর নয়। কারণ, রবীন্দ্রনাথ তাতে সম্পাদক ও সমালোচকের দায়িত্বের কথা তুলেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

> "প্রতি দিন, প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে শতকরা কত কত ভাব হৃদয়হীন কলমের আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হইয়া ও কপট কৃত্রিম রসনাশয্যার উপরে হাত পা খিঁচাইয়া ধনুষ্টঙ্কার হইয়া মরিতেছে তাহার একটা তালিকা কে প্রস্তুত করিতে পারে! এমনতর দারুণ মড়কের সময় অবিশ্রাম চুলা জ্বালাইয়া এই শত সহস্র মৃত সাহিত্যের অগ্নিসংকার করিতে কোন্ সমালোচক পারিয়া ওঠে!"

বাংলা, পত্র-পত্রিকার ক্রমবর্ধমান ভিড় তিনি তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যেই দেখে গেছেন। কিন্তু এই ধরনের তীব্র তিরস্কার আর দ্বিতীয়বার উচ্চারণ করেননি।

এতো তীব্র না হলেও, কিছু-কিছু মৃদু ভর্ৎসনা এই ঘটনার পরেও কয়েকবার শোনা গেছে। সে-রকম একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করলে অবান্তর হবে না। ১৩৩৮ সালের শ্রাবণে ত্রৈমাসিক 'পরিচয়' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যাতে পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে

লিখেছিলেন,—"প্রধান উদ্দেশ্য, প্রাচীন ও আধুনিক সমস্ত ভাবগঙ্গার ধারা বাংলা ভাষার ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বহাইয়া দেওয়া। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন ভাষার বিশিষ্ট দানগুলিকে 'পরিচয়' বাঙালী পাঠককে উপহার দিতে অভিলাষী।" তার পরের সংখ্যার [কার্তিক] 'পত্রিকা' শিরোনামে রবীন্দ্রনাথের যে চিঠিখানি ['শ্রীমান সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কল্যাণীয়েষু'] ছাপা হয়, তাতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'প্রদীপ' ও 'প্রবাসী'র প্রশংসা ছিল এবং সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত লঘু ও গম্ভীর দুটি দিকেরই অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লেখক-পাঠক-সম্পাদকসমাজকে তিনি অবহিত হতে বলেছিলেন। সাময়িক পত্রের সম্পাদনা এবং পরিচালনা সম্বন্ধে অন্যান্য কয়েকটি কথার পরে ঐ চিঠিতে মন্তব্য ছিল :—"আমার বলবার কথা এই, সাধারণের মন না-রেখে সাহিত্যের বিশিষ্টতা রাখবার দায়িত্ব কোনো-না-কোনো জায়গায় থাকা চাই। নইলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাহিত্য অন্ত্যজ বর্ণের রূপ ধরবেই।" মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় যখন 'বিশিষ্ট সাহিত্যকে অবলম্বন করে একটি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাব নিয়ে' তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ মণিলালকে বলেছিলেন—"তুমি যে কাগজ বের করবে তাতে পাঠকদের দেবার বরাদ্দটাই বড়ো কথা নয়, লেখকদের উপর দাবীর কথাটা তার চেয়েও বড়ো কথা। দাবী অর্থযোগে বা শব্দযোগে প্রবন্ধ চাওয়া নয়,—কাগজের চরিত্রের মধ্যেই সে দাবী থাকবে। সে চরিত্র অলক্ষিতে লেখককে উদ্বুদ্ধ করে, সাবধান করে, লেখায় অপরিচ্ছন্নতা, শৈথিল্য, চিন্তার দৈন্য আপনিই সংকুচিত হয় ; অন্তত আপন উত্তরীয়টাকে ধোপ দিয়ে না আনলে মান রক্ষা হয় না। তোমার পত্রিকার একটা চরিত্রবৈশিষ্ট্য থাকা চাই—অর্থাৎ অন্যের প্রতি নিজের ব্যবহারেও তার তপস্যা থাকবে, নিজের প্রতি অন্যের ব্যবহারকেও সে সৃষ্টি করে তুলবে।"

'সবুজ পত্রের' সম্পাদনায় এই তপস্যা ও সৃষ্টির যাথার্থ্য লক্ষ্য করে তিনি খুসি হয়েছিলেন। বিশেষভাবে প্রমথ চৌধুরী এবং অতুলচন্দ্র গুপ্তের এই সামর্থ্যের কথা তিনি বার-বার স্মরণ করেছেন।

ছাপা-সাহিত্যের ইতিহাসে সকল যুগেই সমকালীন পত্র-পত্রিকার দ্বারা লঘু ও গম্ভীর উভয় শ্রেণীর রচনাদর্শ ই কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যের উনিশের শতক থেকে অদ্যাবধি সাহিত্যের সঙ্গে সাময়িক

পত্রিকার সম্পাদকের এই অবশ্যস্বীকার্য সম্পর্কটি বার-বার অনুভব করা গেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারিচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র—তারপর, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ও উত্তর-বর্তী নানা গণ্যমান্য সম্পাদক সাহিত্যের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় আপন-আপন ব্যক্তিত্বের নিয়ন্ত্রণী প্রভাব রেখে গেছেন। সেই সঙ্গে লেখার জন্য কিছু মূল্য দেবার সামর্থ্যের কথাটিও অবশ্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আজ থেকে প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে সেকালের সম্পাদক-সমাজকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইকথাই মনে করিয়ে দিয়েছিলেন—'আজিও গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে যাইবামাত্র অন্তত: ৭৫ কি ১০০ টাকা [একজন ভাল গ্রাজুয়েট] পাইতে পারেন। যতদিন সাহিত্য-ব্যবসায় প্রথম হইতেই ইহা অপেক্ষা অধিক লাভ না দেখাইতে পারে, ততদিন উৎকৃষ্ট শিক্ষিত লোক সাহিত্য-ব্যবসায়ে সর্বপ্রযত্নে পরিশ্রম করিতে চাহিবে না।'

সেকালের এই উক্তির পরেও এরকম আরো অনেক উক্তি বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগীদের পক্ষ থেকে উচ্চারিত হয়েছে। ১৯১৩ সালে ফণীন্দ্রনাথ পালের কাছে লেখা শরৎচন্দ্রের একাধিক চিঠিতে 'যমুনা'-র তো বটেই, তাছাড়া 'সাহিত্য', 'বঙ্গবাণী', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার উল্লেখ দেখা যায়। তিনি ফণীন্দ্রনাথকে 'বিষয়বুদ্ধি' উপেক্ষা না করে 'প্রবাসী'র আদর্শ মনে রেখে 'যমুনা'র উন্নয়ন-সাধনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। 'যমুনা'তে ভালো সমালোচনা চালু করবার কথা তাঁর মনে জেগেছিল। Herbert Spencer সম্পর্কে তিনি নিজে আলোচনা করবার কথা ভেবে-ছিলেন। অনুযোগের সুরে বলেছিলেন,—"আমাদের দেশের পত্রিকায় কেবল নিজেদের সাংখ্য আর বেদান্ত ছাড়া দ্বৈত আর অদ্বৈত ছাড়া আর কোন রকমের আলোচনাই থাকে না।" বলা বাহুল্য, এ অনুযোগ ঠিক ঐতিহাসিক সত্যের স্বীকৃতি নয়। কারণ, সেকালে নানা প্রসঙ্গের পরিবেষণভার একাধিক সম্পাদক স্বীকার করে নিয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' তো বটেই—তারপর 'ভারতী'-তেও সে দায়িত্ব পালিত হতে দেখা গেছে। শরৎচন্দ্র তাঁর নিজের কালের সেই বিশেষ পর্বের পত্র-পত্রিকার উদ্দেশ্য বা সামর্থ্য সম্পর্কে তাঁর সংগত আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মাত্র। মূলত গল্প-উপন্যাসের লেখক হয়েও প্রবন্ধের দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 'সাহিত্য' পত্রিকার

সঙ্গে তাঁর অপ্রীতিকর সম্পর্কের কথা সকলেই জানেন। তবু সে-কাগজের শুধু সাহিত্যমূলক প্রবন্ধই নয়, তা'ছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধও তিনি খুঁটিয়ে পড়তেন। ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা উড়িষ্যার খোন্দজাতি সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়ে তিনি সে-লেখার তথ্যগত ত্রুটিবিচ্যুতি দেখে চিন্তিত হয়েছিলেন। 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হবার অল্পকাল আগে ১৩১৯ সালের চৈত্র মাসে লেখা আর একখানি চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন—"দ্বিজুবাবুকে সম্পাদক করিয়া grand ভাবে হরিদাস-বাবু কাগজ বাহির করিতেছেন। ভালই। তাঁরা টাকা দিবেন কাজেই ভাল লেখাও পাইবেন।"

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের আমলে বাংলার সাধারণ সাহিত্যিক এবং সাহিত্য-পাঠকের মধ্যে যে নিছক এক তরফা দাক্ষিণ্যের সম্পর্ক ছিল, এখন সে-অবস্থার অবসান ঘটেছে। অবশ্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-অবস্থা ঘটিয়ে তোলবার পরামর্শ দিয়েছিলেন সে-অবস্থা এখনো ঘটেনি। চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী-দের বদান্যতার ফলে গল্পকার এবং ঔপন্যাসিকদের মধ্যে কিছু উৎসাহ ছড়িয়েছে বটে, কিন্তু বিশিষ্ট সাহিত্যের চর্চায় সে বদান্যতার প্রতিক্রিয়া এখনো বিতর্কসাপেক্ষ। কবিতার মর্যাদা বেড়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। কিন্তু প্রবন্ধ ?—বিশিষ্ট সাহিত্যগুণান্বিত প্রবন্ধ ?

প্রবন্ধের বিষয়ের বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে বটে, তথ্য এবং তত্ত্বের উদ্ঘাটনে-পর্যালোচনায় অনেকেই এগিয়ে এসেছেন। বিশুদ্ধ গবেষণার দিকেও ঝোঁক বেড়েছে। আবার এর বিপরীত প্রবণতারও ব্যাপক প্রতিষ্ঠা ঘটেছে তথা-কথিত রম্য-রচনার জনপ্রিয়তায়। কিন্তু জনপ্রিয় 'রম্য-রচনার' অতি-শৈথিল্য পরিহার করে, পণ্ডিতপ্রকীর্তিত, গবেষণামুখ্য রচনার নীরসতা এড়িয়ে সাহিত্য-গুণসমৃদ্ধ প্রবন্ধের মর্যাদা বাড়াবার দায়িত্ব রয়েছে একালের বাংলা সাহিত্যের পত্র-পত্রিকার পরিচালক সাহিত্যনিয়ন্তাদের সবলা সুবিবেচনার প্রতীক্ষায়। একজন বিদেশী সমালোচক এ-কালের বিচিত্র ধরনের ইংরেজি প্রবন্ধের বই সম্পর্কে লিখছেন—

> "The greater part of this literature is not literature at all in the aesthetic sense of the term.... Some of it deals with subjects which may be treated didactically, primarily with a

view to giving information, as in historical or sociological text-books; such books may be elevated into literature by the vision of the writer."

এযুগের বাংলা সাহিত্যের লেখক-সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিশেষ vision-এর প্রেরণা সঞ্চার করবার এবং পাঠকসমাজের এই রুচি জাগিয়ে তোল্‌বার উপযুক্ত অবস্থা সৃষ্টির দায়িত্ব গ্রহণ করবার লগ্ন এসে গেছে। সে লগ্ন সার্থক করে তোলবার সামর্থ্য অবশ্য কেবলমাত্র লেখকের নয়,—কেবলমাত্র সম্পাদকেরও নয়। লেখক-পাঠক-সম্পাদকের সম্মিলিত সহযোগিতা চাই। সাহিত্যের বিশেষ-বিশেষ রুচি সৃষ্টির ব্যাপারে এই তিন পক্ষের অনস্বীকার্য সহযোগিতার দান সকলেরই সুবিদিত সত্য। অলৌকিক প্রতিভার কথা উহ্য রাখলে পাঠকের চাহিদা নিয়ন্ত্রণের কাজে লেখকের তুলনায় সাধারণতঃ সম্পাদক-সমাজই হলেন সমর্থতর যন্ত্র।

এ হলো একালের কথা। এইবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক্।

আমাদের প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য-বিবেক

সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের সুদীর্ঘ এবং সুবিপুল ঐতিহ্য বাঙালী লেখকদের তেমন কোনো স্বাধীন সাহিত্যবিবেক গড়ে তুলতে উৎসাহ দেয়নি। সে কোনো অভিযোগের কথা নয়। বহু পণ্ডিতের দীর্ঘ তপস্যার ফলে সংস্কৃতের মধ্যে যে বিশ্লেষণ-ক্ষমতা এবং অধ্যাত্মবোধ পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে, তার আকর্ষণ সামান্য নয়।

বাংলাদেশে মধ্যযুগে যে সাহিত্য লেখা হয়েছে, তার আয়তন বা পরিমাণ কম নয় বটে, কিন্তু তাতে বৈচিত্র্যের সম্ভাবনা কম ছিল। মধ্যযুগের একটি প্রধান সাহিত্যশাখা হিসেবে মঙ্গলকাব্যের মর্যাদা সর্বস্বীকৃত সত্য। সেই মঙ্গলকাব্যও গতানুগতিক প্রথাতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস'-প্রণেতা অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—

> "খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব কল্পনা করা গেলেও খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত মঙ্গলকাব্যগুলি বিশিষ্ট একটা রূপ লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতাব্দী হইতেই

মঙ্গলকাব্যগুলি একটা বিশেষ গতানুগতিক রচনা-প্রথার অনুকরণ আরম্ভ করে। তখন বিষয়বস্তুর পরিকল্পনার দিক হইতে এই জাতীয় কাব্য সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যবর্জিত হইয়া পড়ে।"[১]

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা' [১৩৬১] গ্রন্থে এই পর্যায়ক্রমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের যুগ বিভাগ করেছেন—

[ক] আদি পর্যায়—প্রাক্‌তুর্কী আক্রমণ-কাল
আনুমানিক ৯০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ।

[খ] মধ্য পর্যায়—তুর্কী আক্রমণের পরবর্তী কাল
আনুমানিক ১২০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ।

[গ] আধুনিক পর্যায়—য়ুরোপ-প্রভাবিত কাল
১৮০০ থেকে বর্তমান কাল।

অধ্যাপক চৌধুরী তাঁর আলোচনায় মধ্য-পর্যায়কে আবার দুটি উপপর্যায়-ক্রমে ভাগ করেছেন—চৈতন্য-পূর্ববর্তী 'আদি-মধ্য-পর্য্যায়' [১২০০ থেকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ]; এবং চৈতন্য-প্রভাবিত ও তৎপরবর্তী 'পরমধ্য-পর্যায় [১৫০০ থেকে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ]।

সেকালের বাংলা সাহিত্যে প্রধানতঃ হিন্দু, বৌদ্ধ এবং ইসলামী ধর্মপ্রসঙ্গের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের লেখক দীনেশচন্দ্র সেন আমাদের প্রাচীনতর সাহিত্যপর্বের নাম দিয়েছিলেন 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ'। রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকের মতামত স্মরণ করে অধ্যাপক চৌধুরী সেকালের বাঙালীর ধর্মগত সহনশীলতার বৃত্তান্ত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য প্রাচীনতর চর্যাপদের কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সিদ্ধাচার্যদের কোনো-কোনো উক্তিতে আত্মসম্প্রদায়নিষ্ঠার ওপরে একটু বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। পরের যুগে মঙ্গলকাব্যের মধ্যেও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিচয় আছে। শৈবধর্মে প্রতিষ্ঠিত থেকে যাঁরা লৌকিক মনসা-পূজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, চাঁদ সদাগর ছিলেন সেই দলের নেতা। শেষে তাঁকে মনসাঠাকুরের আধিপত্য মেনে নিতে হয়েছিল। আবার শৈব ধনপতি লৌকিক চণ্ডী-ঠাকুরের ঘটে লাথি মেরেছিলেন। তাঁকে অকূল সমুদ্রে

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস [দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫৭] পৃঃ ২৮।

পেয়ে চণ্ডী সে অপমানের প্রতিশোধ তুলেছিলেন। বাংলা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে সে-সব কথা বলা হয়েছে।

এই সব বিবরণ থেকে মনে হয়, দেশের ব্যাপক জনজীবনে যাই থাক্, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সম্প্রদায়গত বিরোধের নমুনা কিছু কম ছিল না। কিন্তু ভেদ-বিরোধের মধ্য দিয়ে যে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি জেগে ওঠা খুবই সম্ভব বলে মনে হতে পারে, সেকালে বাংলা সাহিত্যের গুণগ্রাহীদের মধ্যে সে রকম কোনো স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ঘটেনি। সংস্কৃতের আশ্রয় ব্যতিরেকে প্রাকৃত-জনের প্রাকৃত-ভাষার যথার্থ প্রাকৃত-সাহিত্যের স্বাধীন স্ফুরণ ঘট্তে কিছু বিলম্ব ঘটেছে। সাহিত্যের 'স্বাধীন বিবেক' বল্লে সর্বসম্পর্কত্যাগী কোনো অহংসর্বস্ব চিন্তাধারার কথা সূচিত হয় না। ঐতিহ্য ছেড়ে আমাদের দিন চলে না। অতীতকে পরিহার করবার কোনো উন্মাদ প্রস্তাব নয়। কিন্তু স্বাধীনতা কি সম্পর্ক ত্যাগ করবার কথাই বলে? স্বাধীন হওয়ার মধ্যে যে আত্মাবিষ্কারের আনন্দ আছে, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সে-আনন্দ বড়োই বিরল ছিল। সে-অঞ্চলে স্বাধীনতার পরিচয় শুধু কাহিনী-আহরণের বিশেষত্বেই বিদ্যমান। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় নানা গবেষণার সাহায্যে অনুমান করেছেন যে, চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী "কোন বাঙ্গালী কবির স্বকপোলকল্পিত বলিয়া মনে হয়।"[২] আবার, মনসা-মঙ্গলের কাহিনী সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন—"দুইটি স্বতন্ত্র লৌকিক কাহিনীর ধারা আসিয়া এক সঙ্গে মিলিত হইয়াছে একটি শঙ্কর গারড়ী-নেতার কাহিনী ও অপরটি চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনী। প্রথম কাহিনীটি প্রাচীনতর, এবং ইহার সঙ্গেই আসিয়া পরবর্তী কালে চাঁদ সদাগর-বেহুলার কাহিনীটি যুক্ত হইয়াছে। মনে হয়, লৌকিক রামায়ণের কাহিনী এই শঙ্কর গারড়ীর কাহিনীর দ্বারাই প্রভাবিত হইয়াছে।"

সেকালের সাহিত্যে দু'একজন কবি হয়তো ছন্দে বা শব্দে বা উপমা প্রভৃতি অলঙ্কারের প্রয়োগে কিঞ্চিৎ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কিন্তু সেখানে স্বাধীনতার লক্ষণ খুঁজতে যাওয়া পণ্ডশ্রম। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বিজয়গুপ্তের খুব প্রশংসা করেছেন। তাঁর অনেক কথার মধ্যে এইটুকু এখানে উল্লেখ করা চলে—

২। পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩৪৩
৩। ঐ পৃঃ ১৫৭

"কাহিনীর মধ্যে এত অবকাশ থাকা সত্বেও সরস লাচারীতে গতানুগতিক বিলাপোক্তি তাঁহার রচনায় প্রায় স্থান পায় নাই বলিলেই হয়। মধ্যে মধ্যে দুই একটি মাত্র পদে গভীর বেদনার অনুভূতি ফুটিয়া উঠে।...

...বিজয়গুপ্তের রচনাতেই বাংলা কাব্যসাহিত্যে সর্বপ্রথম বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পয়ার ও লাচারী ভিন্ন সেই যুগে অন্য কোন ছন্দের অস্তিত্ব ছিল না; ..

...তাঁহার কাব্যে গতানুগতিক অলঙ্কার-শাস্ত্রানুমোদিত উপমার কোন স্থান নাই, প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বস্তু সম্বন্ধে তাঁহার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান হইতেই সেগুলি নিজের রসবোধ দ্বারা সৃষ্ট।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ও পরে ভারতচন্দ্র রায় যে তাঁহাদের রচনায় ব্যাজস্তুতিঅলঙ্কার ব্যবহার করিয়াছিলেন বিজয়গুপ্তের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যে তাহার সর্বপ্রথম প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।"[৪]

এইসব গুণপনার কথা সূত্রে আলোচক আরো জানিয়েছেন—

"সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য বিজয়গুপ্তের পাণ্ডিত্য সুগভীর ছিল। তাঁহার মনসা-মঙ্গলকাব্যের প্রথমাংশে মনসাদেবীর উৎপত্তির যে বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা তাঁহার সংস্কৃত পৌরাণিক সাহিত্য পূর্ণ আয়ত্তের ফল বলিতে হইবে। অবশ্য এই বিষয়ে তিনি হরিদত্তকেও কতক পরিমাণে আদর্শরূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।[৫]

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই শেষ মন্তব্যটির ওপরেই বাংলা সাহিত্যের সমালোচনাবিধির গবেষককে বিশেষ জোর দিতে হয়। কারণ, ইতিহাসের সাক্ষ্য সেই পক্ষেই। পূর্বকবিকে নিন্দাসূত্রে বা স্তুতিসূত্রে একবার স্মরণ করা, অভ্যস্ত পূর্বাদর্শ বজায় রেখে একই প্রসঙ্গ নিয়ে পুনরায় নতুন কাব্য লেখা—এই ছিল প্রাচীন কালের লেখকদের প্রথা।

৪। ঐ পৃঃ ২০৯-২১১
৫। ঐ পৃঃ ২১০

এই বৈশিষ্ট্যের কথাসূত্রে দীনেশচন্দ্র সেন বলে গেছেন—

> "এই পুচ্ছগ্রাহিতা বাঙ্গালার জাতীয় জীবনের সূত্র। নূতন পথে লেখনী প্রবর্তিত করিবার অধিকার আছে, প্রাচীন কবিগণ, বোধ হয় একথা স্বীকার করিতেন না।...ধর্মের বন্ধনীর মধ্যে [তাঁহাদের] আবদ্ধগতি কল্পনা অন্য জগতের পুষ্পপল্লব লক্ষ্যে ধাবিত হইতে পারে নাই।[৬]

বহু দৃষ্টান্তের যোগে এই প্রসঙ্গটি বিস্তারিত করে দীনেশচন্দ্র লিখেছিলেন—

> "আমরা এই প্রবন্ধাংশে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, কতক গুলি ধর্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পর্যন্ত কোন একখানি কাব্যের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইয়াছে, সে পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্ফুট করিয়াছেন। কিন্তু বিকাশই সর্বত্র প্রকৃতির নিয়ম নহে। ... কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রীধর্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাব্যগুলির পার্শ্বে সত্যনারায়ণের পাঁচালী, শনির পাঁচালী, ধান্য পূর্ণিমা, ব্রতগীতি প্রভৃতি অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সেগুলিতে উদ্গম আছে, বিকাশ নাই।"

বৈষ্ণব কবিদের কতকটা মৌলিকতা ছিল বটে। দীনেশচন্দ্র বিদ্যাপতির "শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষীর বা, বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ার না",—পরিচিত সংসারের নিকট সম্পর্কময় সাদৃশ্যচিন্তার এই অভিনবত্বের কথা বলেছেন। বিদ্যাপতি অবশ্য মৈথিল কবি। পরের যুগের বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে বলরাম দাস, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি কবিদের কোনো-কোনো উক্তিতে এরকম মৌলিক কল্পনার অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। কিন্তু অনুকরণের মেঘে ধীরে ধীরে মৌলিকতা ঢাকা পড়ে যায়। তারও দৃষ্টান্ত আছে।

বিজয়গুপ্তের মনসাদেবী চণ্ডীর কাছে নিজের দুর্ভাগ্যের কথা এইভাবে বলেছেন—

> "শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
> পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥"

৬। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'—ষষ্ঠ সংস্করণ পৃঃ ১০৯

বিজয়গুপ্তকে খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকের লেখক বলে ধরে নেওয়া যায়। নারায়ণ দেবকে তাঁর সমকালীন মনে করা যেতে পারে। শুধু বিজয় গুপ্ত বা নারায়ণ দেবের কথা নয়,—সেকালের সব লেখকদের মধ্যেই এই স্বভাব দেখা যায়। চৈতন্যের আয়ুষ্কালের [১৪৮৬—১৫৩৩] সমসাময়িক অথবা তৎপূর্ববর্তী কবিদের অনেকের রচনার মধ্যেই এই ধরনের সাদৃশ্য-চিন্তার নমুনা আছে। সংসারের দুঃখদুর্দশার উত্তাপ দূর করবার ভাবনাতে, কিংবা ব্যক্তিগত কোনো চিত্তদাহের জ্বালা নিবারণের প্রচেষ্টায় অনেক কবিই 'শীতল' বস্তুর স্পর্শ কামনা করেছেন। চণ্ডীদাস বলেছেন—

'শীতল বলিয়া শরণ লইলাম ও দুটি কমল্ পায়।'

নিজের অসহায়, কাতর অবস্থার কথা চণ্ডীদাসের রাধিকা বরং আরো মৌলিক রীতিতে বলে গেছেন—

"ক্ষুরের উপরে রাধার বসতি নড়িতে কাটিএ দে"।

এবং

"শঙ্খ-বণিকের করাত যেমন দুদিগে কাটিয়া যায়
তেমনি আমার গুরুজনা কাটে দ্বিজ চণ্ডীদাসে গায়॥"

এই ধরনের সাদৃশ্যের ভাবনা বিজয়গুপ্তের ঠিক কতো আগে বা কতো পরে ঘটেছে, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের বা প্রাচীন যুগের লেখকদের অভ্রান্ত বা ধ্রুব নির্ভরযোগ্য সন-তারিখের পঞ্জিকা নেই। দু'একশ' বছরের ব্যবধানেও আসল কথাটির ভিৎ নড়বে না। সেই প্রধান বক্তব্যটি এই যে, সেকালের সাহিত্য থেকে শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কারের নতুনত্ব খুঁজে লাভ নেই। সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব কাটিয়ে লৌকিক কবিরাও সত্যিকার নতুন কোন ভাবজগৎ আবিষ্কার করতে পারেননি। সংস্কৃত মহাকাব্য থেকে রিক্থ নিয়ে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতি কবিদের খ্যাতি-বিস্তার হয়েছে,—সংস্কৃত পুরাণের আভিজাত্য-আরোপের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়ে লৌকিক মঙ্গলকাব্যকে দাঁড়াতে হয়েছে,—হয়তো, কালিদাসের 'ঋতু সংহার' থেকেই মধ্যযুগের 'বারমাস্যা' দেখা দিয়েছে, এবং চৈতন্যের পূর্ববর্তী বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যও ঠিক মানবজীবনের সর্বস্বীকৃতিমূলক সাহিত্য নয়।

পদাবলী ভক্তিমূলক গান; প্রসঙ্গতঃ তাতে লৌকিক জীবনের প্রাকৃত কথা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। দীনেশচন্দ্র বলেছিলেন বটে—"সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্পবাসের ন্যায় বৈষ্ণব-গীতিরাশি, একটি স্বাধীন মুগ্ধকর ভাবজাত। সেই ভাবটির নাম প্রেম।"—তিনি পূর্ববর্তী সাহিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণব গীতির উপমাদি প্রয়োগের প্রভেদ উল্লেখ করে এও বলেছিলেন যে, "বৈষ্ণব পদে স্বাধীনতার বায়ু খেলা করিতেছে"—কিন্তু, তাঁর সেকথা মাত্র আংশিক সত্য। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম যুগের স্বাধীনতা পরের যুগের পদকর্তাদের কাছে প্রথা-তে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবের অনুচরেরা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের পূর্ব-সূরীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বৈষ্ণব-'সাহিত্যে'র সূত্র-ভাষ্য-বিশ্লেষণাদি লিখে গেছেন।[৭] রূপ গোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি', নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' এবং অন্যান্য বৈষ্ণব পণ্ডিতের এবম্বিধ অন্যান্য গ্রন্থে সংস্কৃতের ঐতিহ্যই বাহিত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ প্রান্তের প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্রও ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের সংস্কৃত পণ্ডিত ভানুদত্তের 'রস-মঞ্জরী' অনুসরণ করে তাঁর বাংলা 'রসমঞ্জরী' লিখেছিলেন। ভানু দত্ত আবার ধনঞ্জয়ের 'দশরূপকে'র কাছে ঋণী। বহুকালের বহু রসনায় উচ্চারিত হতে-হতে সংস্কৃতের 'রস' কথাটি যখন তার প্রথম প্রয়োগ-কালের স্বাদ হারিয়ে,—সাহিত্যের উচ্চ মান বা আদর্শ নির্দেশের সামর্থ্য হারিয়ে,—কাব্যতত্ত্বের ছাত্রমহলের একটি মুদ্রাদোষে পর্যবসিত হতে বসেছিল, সেই সময়ে ভারতচন্দ্র পুনরায় ঐ 'রস' কথাটিই ব্যবহার করে বলেছিলেন—

> "প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে
> যে হোক্ সে হোক্ ভাষা কাব্য রস লয়ে॥"

ভারতচন্দ্রের রসবাদ থেকে রঙ্গলালের প্রস্তাব অভিমুখে

ডক্টর সুশীলকুমার দে জানিয়েছেন যে, ১৭৬০ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কবিগানের ঐশ্বর্যযুগ গেছে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দেই ভারত-চন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল উভয়েই কবিওয়ালাদের

৭। বর্তমান লেখকের 'সাহিত্য পাঠকের ডায়েরি'-তে [দ্বিতীয় পর্বার] 'প্রাক্-রবীন্দ্র বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

ঐতিহ্যে লালিত হয়েছিলেন, নিজেরাও সে অঞ্চলের অনুরাগী ছিলেন। তবু দু'জনেই নিজেদের রচনার মধ্যে বিশিষ্ট 'আধুনিকতার' স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত যে খাঁটি বাঙালী ছিলেন, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকে অদ্যাবধি অনেকেই বার-বার বলেছেন। রঙ্গলালও দেশপ্রেমিক ছিলেন কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের মতো সমকালীন সমাজের সমালোচনাময় কবিতা তিনি লিখতে চাননি বা পারেন নি। তবে, বাংলার সাহিত্য-বিবেক সম্বন্ধে আলোচনায় রঙ্গলালের নাম ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে বেশি গৌরবময় বলে মনে হয়। ঈশ্বর গুপ্ত যেন কিঞ্চিৎ শিথিল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি নিতান্তই ঝোঁকে পড়ে আধ্যাত্মিক কবিতাবলী লিখেছিলেন—সত্যিকার আধ্যাত্মিক চিন্তা তাঁর ধাতে ছিলনা। তাঁর ছিল স্বভাবকবিত্ব! রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের প্রভাব এড়াতে পারেন নি,—সংস্কৃত কাব্যের তিনি ভক্ত ছিলেন,—ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর সাগ্রহ বিচরণের অনেক নজির আছে। আমাদের কবিদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম নাগরিক কবি;—আর রঙ্গলালই প্রথম একাধারে ইংরেজিনবীশ,—সংস্কৃতের ভক্ত,—এবং পরিশ্রমী পাঠক হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয়। কালিদাসের কুমারসম্ভবকাব্য তিনি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু সে শুধু অন্ধ অনুবাদ নয়। বইখানির 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি লিখেছিলেন—"মহাকবি কালিদাসের নিয়মে আমি সমুদয় সর্গ এক ছন্দোবিশেষে রচিত না করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোবন্ধের অনুসরণ করিয়াছি; অনবরত এক ছন্দ শ্রুতিবিবরে প্রবিষ্ট হইলে জড়তার প্রাদুর্ভাব হয়; জলযন্ত্র নির্গত অনর্গল একাকার ধারাপাত-শব্দ নিদ্রাকর্ষণের জন্য নহে, তাহা চিত্তকে অনবরত সচেতন রাখিবার সহকারী, ইহা সর্ববাদিসম্মত।"

এই মন্তব্যের মধ্যে রঙ্গলালের স্বাধীন বিচারের প্রবণতা তার নিজের স্বাক্ষর রেখে গেছে। পশ্চিমের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবের মধ্যে বাস করেও তিনি যথার্থ ঐতিহ্য-সচেতন কবির ধর্ম অনুসারে ঈশ্বর গুপ্তের মতোই দেশের প্রাচীন সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের পাণ্ডিত্য ছিল না; কিন্তু রঙ্গলালের বৈদগ্ধ্য ছিল। কাজে-কাজেই রঙ্গলালের বিচার-ক্ষমতা গুপ্তকবির চেয়ে আরো বেশি ছিল। দুজনেই রসিক ছিলেন,—এবং সে অবস্থায়, বহু সাহিত্য পাঠের শ্রম স্বীকার করে একজন আর একজনের চেয়ে তুলনামূলক বিচারের শক্তি বেশি অর্জন করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত বরাবর কলকাতা

অঞ্চলেই জীবন যাপন করেছেন; রঙ্গলাল কর্মসূত্রে ভারতবর্ষের আরো বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের এবং জনসমাজের সাক্ষাৎ পরিচয় পেয়েছিলেন। উড়িষ্যার পুরাবৃত্ত 'মাদলা-পঞ্জী' দেখে এবং 'কাঞ্চীকাবেরী'-র একখানি জরাজীর্ণ পুঁথি পড়ে তিনি তাঁর 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্য লিখেছিলেন। সে অবশ্য উনিশের শতকের শেষ দিকের ঘটনা। সে ঘটনার প্রায় আঠাশ-উনত্রিশ বছর আগে ড্রিংক-ওয়াটার বীটনের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর কলকাতায় 'বীটন সোসাইটি'র পত্তন হয়। ১৮৫২-র ৮ই এপ্রিল তারিখে ঐ সমিতির এক অধিবেশনে রামবাগানের দত্ত-পরিবারের হরচন্দ্র দত্ত বাংলা কবিতা সম্পর্কে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ পড়েন। তাতে বাংলা কবিতার নিন্দা শুনে ঐ বছর ১৩ই মে তারিখের সভায় রঙ্গলাল তাঁর 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' পড়েছিলেন।

বাংলায় সাহিত্য-বিবেকের নতুন এক উদ্ভাসনের খবর আছে সেই প্রবন্ধটিতে। উনিশের শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর তার আগেই অতিবাহিত হয়েছে। বাংলা গদ্য তখন দাঁড়িয়ে গেছে, বলা যায়। রামমোহন তার অনেক বছর আগে মারা গেছেন [২৭-এ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৩]; বিদ্যাসাগর তখন ছাত্রপাঠ্য অনেকগুলি বাংলা বই লিখে ফেলেছেন,—তাঁর 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' অবশ্য আরো বছর খানেক পরে ছাপা হয় [মার্চ, ১৮৫৩]; রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' মাসিক পত্রিকার আবির্ভাব প্রায় তার সমকালীন ঘটনা [১৮৫৪]।

রঙ্গলালের প্রধান বক্তব্য কী ছিল, সেকথা তাঁর প্রবন্ধের এই কথাগুলি থেকেই বোঝা যাবে—

> "ইউরোপীয়া কবিতাসতী আমারদিগের সম্ভ্রমের পাত্রী, সাধ্বী এবং লজ্জাশীলা স্ত্রীলোককে কদাচ ঘৃণা এবং উপহাস করা যায়না, কিন্তু আমারদিগের দেশীয়া কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।"

প্রবন্ধের মধ্যে তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বহু কবির নাম করেছিলেন—হোমর, ভর্তৃহরি, মিল্‌টন, পেত্রার্ক, চসার ইত্যাদি অনেকেরই উল্লেখ আছে। কিন্তু শুধু উল্লেখই নয়। ঐতিহাসিক কাল-পারম্পর্যের ধারণা মনে

রেখে তিনি এ আলোচনায় অন্তত দু'একটি ক্ষেত্রে বাংলার প্রাচীন কবিদের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য কবিদের কিঞ্চিৎ তুলনার আভাস দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

> "বাঙ্গালা কবিতা ইউরোপীয় আধুনিক কবিতার সহ বয়ঃক্রম তুলনায় জ্যেষ্ঠা না হউন, ফলে সমবয়স্কা বটেন; পেট্রার্কা এবং চসারের কিয়ৎকাল পরেই বাঙ্গালা কবিতা আবির্ভূতা হইয়াছেন;..."।

পেত্রার্ক এবং চসার উভয়েই কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং রঙ্গলাল হিসেবে ভুল করেন নি। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের তিনি খুবই প্রশংসা করেছিলেন। এবং অনুবাদের প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—

> "কাশীদাস মূল কাব্যরচক ছিলেন না, অনুবাদক ছিলেন বলিয়া তাঁহার শক্তির প্রতি সন্দিগ্ধ হওয়া উচিত নহে, যেহেতু তেঁহ ব্যাসকৃত মহাভারতের প্রকৃত অনুবাদ করেন নাই; অনুবাদ দুই প্রকার হয়, এক মর্মানুবাদ, অপর ভাষানুবাদ, কিন্তু কাশীদাস ইহার কোন নিয়মেই রচনা করেন নাই, মর্মানুবাদ হইলে জৈমিনী ভারতের ভিন্ন প্রকার বিবরণ সকল সংগ্রহ করিতেন না..."

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের সমাজচিত্রের বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন রঙ্গলাল,—ভারতচন্দ্রের কথাপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্রের পারিপার্শ্বিক দেশ-কালের দৈন্য এবং সংকীর্ণতার কথা তুলে ভারতচন্দ্রের কৃষ্ণচন্দ্র-স্তুতির সঙ্গে Ovid-এর জীবনে অনুরূপ প্রভু-স্তুতির প্রসঙ্গ স্মরণ করেছিলেন। শেক্স্‌পীয়রের কথা তো বটেই,—রোমক নাট্যকার টেরেন্সের কথাও রঙ্গলালের এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচিত হয়েছে। অবশ্য এরকম তথ্য-প্রাচুর্য সত্ত্বেও তাঁর বিচারে কিছু-কিছু গলদ ছিল। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্যের সঙ্গে শেক্স্‌পীয়রের 'Venus and Adonis'-এর তুলনার উৎসাহ-কে নির্ভেজাল সাহিত্যিক উৎসাহ বলা চলে না। কিন্তু যেদিক থেকে তিনি তাঁর যুক্তির ব্যূহ সাজিয়েছিলেন, সেদিকে তাঁর বিশ্বাসের জোর ছিল। 'বিদ্যাসুন্দরে'র কবি ভারতচন্দ্রকে যদি অশ্লীলতার জন্যে দায়ী করা হয়, তাহলে Venus

and Adonis-এর লেখক শেক্‌স্‌পীয়রই বা সে রকম অভিযোগ এড়াবেন কোন্ পথে?—এই ছিল রঙ্গলালের যুক্তি!

বাংলা কবিতা সম্বন্ধে রঙ্গলাল খাঁটি দেশপ্রেমিকের চেয়ে বরং গোঁড়া দেশভক্তের প্রীতি অনুভব করতেন। তাঁর বিচারের ফল যাই হোক্, সাহিত্য বিচারে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতিটির কথা ভেবে দেখা দরকার। বাংলা সাহিত্যের পক্ষ নিয়ে তিনি আন্তরিক ভাবে দীর্ঘ যুদ্ধ চালিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক বহু তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে তিনি এক-একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। 'Venus and Adonis' থেকে অনুবাদই কি তিনি কম করেছেন! বৈজ্ঞানিককেও এইভাবে যুক্তি দিয়ে [সে যুক্তি অকাট্য না হলেও কিছু আসে যায় না], দৃষ্টান্ত তুলে, পাশাপাশি পর্যালোচনা করে তাঁর বিজ্ঞানের পরীক্ষা চালাতে হয়। অবশ্য বৈজ্ঞানিকের কোনো পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। রঙ্গলালের পদ্ধতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ছিল, কিন্তু তাঁর আয়োজন ছিল হৃদয়বোধের-ই পক্ষপাতী। বৈজ্ঞানিকরা শান্ত ভাবে বিশ্লেষণ করেন; রঙ্গলাল উত্তেজনার বশে বিশ্লেষণ করেছিলেন। এই বিশেষ দুর্বলতাটির কথা উহ্য রাখলে রঙ্গলালের সমালোচনার পদ্ধতি-কে একালের পরিভাষার সাহায্যে বলা যায় অংশতঃ 'আরোহ-পন্থী'—অর্থাৎ তার মধ্যে যথার্থ Inductive Criticism-এর আংশিক সাদৃশ্য আছে। সংস্কৃতের সাহিত্য-বিচারশাস্ত্রে রসবাদীরা ছিলেন মন্ময় আনন্দে বিশ্বাসী—সমালোচনার রাজ্যে তাঁদের বলা যায়, অধ্যাত্মবাদী—অর্থাৎ, subjectivist। কিন্তু রঙ্গলাল কেবল 'রস' 'রস' বলে তাঁর মতের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন নি; তিনি প্রমাণ করতে বসেছেন,—তর্ক করেছেন,—সাধ্যানুসারে যুক্তি দিয়েছেন।

ইংরেজিতে Inductive Criticism কথাটি অধ্যাপক মোল্টনই বোধ হয় প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন। নিন্দা বা প্রশংসার ঝোঁকে নয়,—এ-পথে বিজ্ঞানসম্মত সত্যসন্ধানের তাগিদে সমালোচ্য রচনার উপাদান বিশ্লেষণ করে সমালোচক-কে এগিয়ে যেতে হয়।

Inductive Criticism বা আরোহপন্থী সমালোচনা সম্পর্কে আলোচনাসূত্রে ইংরেজি সাহিত্যের পূর্বগামী আর এক সমালোচনা-বিধির কথা ওঠা স্বাভাবিক। এখানে সেই 'Judicial Criticism'-এরও উল্লেখ করা দরকার। সে কথার মর্মানুবাদ করে বাংলায় 'বৈধী' সমালোচনা কথাটি

ব্যবহার করা যেতে পারে। 'বৈধী'-পদ্ধতির বিশেষত্ব এই যে [১] তাতে নৈতিক আইনের মতোই সাহিত্যের অবশ্য-পালনীয় কতকগুলি আইন স্বীকার করে নেওয়া হয়। [২] দ্বিতীয়তঃ, সেই সব বিধি মিলিয়ে দেখে একটি রচনা আর একটির চেয়ে কতো ভালো বা কতো খরোপ হয়েছে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা হয়। [৩] তৃতীয়তঃ সেইসব অপরিবর্তনীয় বিধির চির-আনুগত্যের ওপরেই সাহিত্যের শ্রেয়ত্ব যে নির্ভরশীল, 'বৈধী' পন্থায় সে-বিশ্বাসও চিরস্থায়ী।

বাংলা কবিতার তিনি যে অত্যন্ত পক্ষপাতী, রঙ্গলাল তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে সেকথা বার-বার বলেছিলেন বটে,—কিন্তু, একথা বলেন নি যে, পূর্বোক্ত 'বৈধী' দৃষ্টিতেই বাংলা কবিতা ইংরেজির চেয়ে ভালো হয়েছে। তাঁর দুটি মন্তব্য এই সূত্রে স্মরণীয়। প্রবন্ধের শেষ দিকে তিনি বলেছিলেন [১] "ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন, তদ্বিরচিত বাবুবিলাস বিবি-বিলাস দূতীবিলাস গ্রন্থে ইয়ং বেঙ্গাল ওল্ড্ বেঙ্গালের যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লেখাও প্রাচীন হইয়া পড়িল, যেহেতু তাঁহার জীবদ্দশাতেই কলিকাতার ভাব পরিবর্তন হইয়া আসিয়াছে...।" এ উক্তিটি কিন্তু পূর্বোক্ত আরোহ-পন্থায় বিচারের নমুনা নয়। ভবানীচরণ "কুকবি নহেন, সুকবিও নহেন,"—ভবানীচরণের লেখাতে Young Bengal এবং Old Bengal-এর 'যথার্থ চিত্র বিচিত্রিত হইয়াছে, আপাতদৃষ্টিতে সমালোচনা-পদ্ধতির এই বিশেষত্ব আরোহ-পন্থার পরিচায়ক মনে হতে পারে। অধ্যাপক মোণ্টন লিখেছিলেন—আরোহপন্থী সমালোচনার কাজ হলো অবিমিশ্র সন্ধিৎসাবশে সাহিত্যের বিচার করা; শিল্পীদের সৃষ্টি থেকেই তাঁরা শিল্পের আইন খুঁজে থাকেন;—শিল্প তাঁদের কোনো পূর্বসংস্কার বা প্রচলিত আইনের অনুগামী হতে বাধ্য, এমন কথা তাঁরা ভাবেন না,—প্রকৃতির মতো শিল্পকেও তাঁরা অনন্ত বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাময় হিসেবেই চিনে থাকেন। কিন্তু পুরোপুরি আরোহপন্থী সমালোচনার যাঁরা গোঁড়া ভক্ত, তাঁরা ইতিহাসের ধারার দিকেও নজর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন না। প্রত্যেক রচনাই তার আপন-আইনের ওপর নির্ভরশীল, একথা মনে করে নিলে ঐতিহাসিক ধারায় শিল্পের তুলনামূলক আলোচনার কথাই ওঠে না। রঙ্গলাল কিন্তু সে রকম গোঁড়া আরোহপন্থী ছিলেন না। তিনি সমালোচনার তৃতীয় পন্থার সঙ্গেও পরিচিত

ছিলেন। আরোহ-পন্থা এবং বৈধী-পন্থার কথা বলা হয়েছে। এইবার তৃতীয় পন্থাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। সেটিকে বলা যায় 'ইতিহাস-সাপেক্ষ' পন্থা, ইংরেজিতে যার নাম Historical Criticism। সমালোচনা-রাজ্যের এই পথটিই সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত এবং সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। কারণ, এতে সাহিত্যসৃষ্টির অনিবার্য স্বাধীনতার কথা উপেক্ষিত হবার ভয় নেই,—বৈধী পন্থায় সেইটিই তো আশঙ্কার সব চেয়ে বড়ো হেতু; দ্বিতীয়তঃ আরোহ-পন্থী সমালোচনার অতিস্বাতন্ত্র্যদোষও এতে সংক্রামিত হবার ভয় নেই, কারণ, ইতিহাসের ভিত্তিতেই এর বিবেচনার নিরপেক্ষতা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই তৃতীয় পন্থার আদর্শ অল্প কথায় এইভাবে প্রকাশ করা যায় যে, সমালোচ্য রচনার ঐতিহাসিক অবস্থান, অর্থাৎ কোন্ দেশে, কোন্ কালে কোন্ লেখকের দ্বারা তা রচিত,—সেই শ্রেণীর রচনা সেই একই ভাষাতে কিংবা—বিস্তারিত অর্থে,—বিভিন্ন ভাষাতে, এবং বিভিন্ন দেশে এবং কালে [এতো ব্যাপক আলোচনা যে সমালোচকের পড়াশোনার প্রচুর বিস্তার ছাড়া অসম্ভব, সেকথা বলা বাহুল্য,] আর যা-যা লেখা হয়েছে, সেগুলির সম্যক পরিচয় দিয়ে তুলনামূলক ভাবে রচনাটির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্ণয় করতে হবে। ইংরেজিতে Historical Criticism এবং Comparative Criticism-কে একই সমালোচনপন্থা বলা চলে। আর, যাকে Judicial Criticism বলা হয়েছে, কেউ-কেউ তাকে বলেন Dogmatic Criticism। ইংরেজিতে একই অর্থে Classical Criticism কথাটি প্রচলিত আছে। য়ুরোপের রেনেশাঁ-র আমল থেকে রুশোর অভ্যুদয় অবধি সে রীতির প্রচলন ছিল। আমাদের 'বৈধী' কথাটি ও রীতির সর্বভাবনার সূচক।

ইংরেজিতে রুশোর সময় থেকে Romantic বা Impressionistic Criticism নামে আর এক পন্থার কথা শোনা যায়। তার সঙ্গে Inductive Criticism-এর পার্থক্য এই যে আরোহপন্থী সমালোচনায় রচনা-বিশেষের অন্য-নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দায়িত্বই বড়ো কথা; আর, Impressionistic রীতিতে [বাংলায় বলা যেতে পারে 'ধারণাসর্বস্ব'-রীতি] সমালোচ্য রচনা সম্পর্কে শাস্ত্রবচন, জনমত, কল্যাণ-অকল্যাণবোধ ইত্যাদি কোনো কিছুরই দায় না মেনে সমালোচক তাঁর নিজস্ব ধারণার কথাতেই জোর দেন। বইটা ভালো লেগে থাকলে, ভালো;—ধারণা

মনে হলে, খারাপ। ধারণাস্বর্বস্ব সমালোচনায় এ-ছাড়া আর কোনো দায় নেই।

রঙ্গলালের শেষ দুটি কথার মধ্যে একটি কথা থেকেই এতো কথা উঠ্‌লো। এইবার তাঁর দ্বিতীয় কথাটি দেখা দরকার। আলোচনার প্রায় শেষাশেষি এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন—

> "এ কথা অবশ্যই বলিব, মনুষ্য বড় বিদ্বান হইলেই যদ্যপি বড় কবি হইতেন, তবে শেক্সপিয়র অপেক্ষা বেন্ জন্সন এবং কালিদাস অপেক্ষা বররুচি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য হইতেন; পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার কাব্যশাস্ত্রের পয়োধিবিশেষ এবং প্রকৃত কবির অনেক লক্ষণ প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু অস্মদ ক্ষুদ্র বিবেচনায় বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তদপেক্ষা অধিকতর কবিতা শক্তি ধারণ করেন...।"

রঙ্গলালের এই উক্তি থেকে তাঁর অনুসৃত রীতি সম্বন্ধে দুটি বিশেষ সত্যের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে,—প্রথমতঃ তিনি তুলনামূলক আলোচনা পরিহার করেন নি; দ্বিতীয়তঃ কবিতার সার্থক অন্তর্নিহিত আনন্দের লক্ষণ তিনি চিন্‌তেন; —তাঁর কাছে 'রস' ব্যাপারটি দীর্ঘ-অভ্যস্ত একটি সংস্কৃত শব্দের পুনরুচ্চারণ মাত্র ছিলো না,—কোনো শিল্পীর পাণ্ডিত্য দেখেই তাঁর রচনাকে তিনি শিল্প বল্‌তে রাজী ছিলেন না। শেক্‌স্‌পীয়রের Venus and Adonis সম্বন্ধে তিনি ঠিক সাহিত্যমূল্যের বিচার করেননি, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে তিনি যে প্রশংসার কথা লিখেছিলেন, সে কথা সাহিত্য-বিচারের কথা। তাঁর সে মন্তব্য আজও গ্রাহ্য। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে প্রশংসা করেছিলেন, সে আরো পরের ঘটনা। বঙ্কিমের আগেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক সমালোচনা-রীতি শুরু হয়েছিল। হরচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র পালিত ইত্যাদি অনেকেই হয়তো সে কাজে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু লিখিত আলোচনার পরিমাণ দেখে এবং বক্তব্য বিষয়ের স্পষ্টতার দিকে নজর রেখে সেকালের আলোচক-দের মধ্যে রঙ্গলালকেই আধুনিক সাহিত্য সমালোচনার প্রথম প্রবর্তক বল্‌তে হয়। 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'টিতে তো বটেই,—তা'ছাড়া তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় তিনি আধুনিক 'ইতিহাস-সাপেক্ষ' সমালোচনার আদর্শই

অনুসরণ করেছেন। বীটন্-সভায় সেই অধিবেশনে তিনি এই প্রস্তাব করেছিলেন—

> হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষায় ও বাঙ্গালা কবিতায় বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কালবিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভ্য কণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা ভূমি আছে, বীজ আছে উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন, উৎসাহ সলিল সেচন করুন, তবে ত্বরায় সুশস্যলাভ হইবেক...।"

রঙ্গলালের পরে 'বঙ্গদর্শন'-এর সাহিত্য-বিবেক

রঙ্গলালের সমসাময়িক সাহিত্য আলোচকদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর [১৮২০-১৮৯১], রাজেন্দ্রলাল মিত্র [১৮২২-১৮৯১], ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৫-১৮৯৪], রাজনারায়ণ বসু [১৮২৬-১৮৯৯] ইত্যাদি বহু মনীষীর নাম এই সূত্রে স্মরণ করা যায়। সাহিত্যের আসরে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবেশ করেছিলেন আরো কয়েক বছর পরে। এঁরা সকলেই ছিলেন কৃতবিদ্য, রসিক ব্যক্তি। কাজে-কাজেই এঁরা প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য উভয় সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, ধীরে-ধীরে বাংলা সমালোচনার পথ আরো প্রশস্ত করে গেছেন। ইতিহাস-সাপেক্ষ বিচারে, যুক্তি-তর্কের সঙ্গে ব্যাপক সমবেদনার গ্রাহিকা শক্তি যোগ করে এঁরাই বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যবীক্ষার যুগান্তর এনেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সেই নবজাগরণের দিনে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে-ছিলেন—"এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিক তত্ত্ববিৎ।' বঙ্কিমচন্দ্রের কথা অল্পকথায় শেষ হবার নয়। অন্যত্র তাঁর অনুশীলিত সমালোচনা-রীতির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। এখানে সে প্রসঙ্গের অতি-বিস্তার অনাবশ্যক। 'বঙ্গদর্শন'-পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। 'বঙ্গদর্শন'-এর নামে উনিশের শতকের বাংলা সাহিত্যে শক্তিমান লেখকদের একটি সুবর্ণ-যুগ যাপিত হয়েছে, বলা যায়। 'বঙ্গদর্শন-এর সাহিত্য-বিবেক বললে এঁদের সকলের সম্মিলিত বক্তব্যের কথাই বোঝাবে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি সম্মানবোধ, বাংলা সাহিত্যের উন্নতি সম্বন্ধে আশা এবং

বিশ্বাস, য়ুরোপের সাহিত্য সম্বন্ধে ব্যাপক আগ্রহ—এই তিন মনোবলে বলীয়ান্ হয়ে এঁরা প্রধানতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব-নেতৃত্বেই ইতিহাস-সাপেক্ষতা এবং আরোহ-পন্থা—এই দুই রীতির মিশ্রণ মেনে নিয়েছিলেন। মিশ্রণের কথাটা অবিশ্বাস্য মনে করবার কোনো কারণ নেই। ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের [১৮৫১-১৯০৩] 'সমালোচনা-সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে কিঞ্চিৎ নজির তোলা হলো। ১২৯১ সালের 'পাক্ষিক সমালোচক' পত্রিকায় প্রকাশিত এই লেখাটির মধ্যে তিনি জানিয়েছিলেন—

> "বাঙ্গালা সাহিত্যে সমালোচনা সাহিত্য অদ্যাপি প্রকৃত প্রস্তাবে প্রস্তুতই হয় নাই। সুতরাং তাহাতে কোনও প্রণালীর অনুসন্ধান করা বৃথা। সে পক্ষেও ইংরেজী সাহিত্য আমাদের অবলম্বন।"

১৮৮০-র দশকের একজন বিচক্ষণ বাঙালী সাহিত্যিকের এই সুবিবেচিত মন্তব্য অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মতো হৃদয়-নিরপেক্ষভাবে বিশেষ-বিশেষ রচনার যাবতীয় উপাদান বিচারের আবশ্যিকতা বাংলা সাহিত্যের সমালোচকরা অবশ্য কোনোদিনই তাঁদের আদর্শ মনে করেন নি। কোনো সাহিত্যের কোনো আলোচকের পক্ষেই সে আদর্শ গ্রাহ্য নয়। কারণ, সাহিত্যের বিচার তো হৃদয়-নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। ভালো লাগা, মন্দ লাগা-র কথা অনিবার্যভাবেই ভাবতে হয়। রঙ্গলালের প্রবন্ধেও সে ভাবনা দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রও সেই পথে চলেছেন। যাঁরা বঙ্কিমচন্দ্রের পরে এসেছেন, হৃদয়বোধের সেই অনিবার্যতা তাঁদেরও মেনে নিতে হয়েছে। ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতার কথা স্বীকার করে, তুলনামূলক পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব মেনে নিয়ে, পৃথক-পৃথক তথ্য বিচারের পথ ধরে রচনার দোষ-গুণ সম্বন্ধে সামান্য সত্যে পৌঁছবার আরোহ-পন্থা অনুসরণ করে, পরিশেষে সকলকেই নিজের-নিজের হৃদয়বোধ দিয়ে নিজের-নিজের মন্তব্য প্রকাশ করতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সেই আদর্শের দিকেই নেতৃত্ব করেছিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথ এলেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা

সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কতো কথা-ই যে বলেছেন! রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, প্রিয়নাথ সেন ইত্যাদি অনেকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক

সাহিত্যচিন্তা তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে আত্মসাৎ করেছেন। তাঁর একটি জীবনকালের মধ্যেই বাংলা দেশে এবং বাংলা সাহিত্যে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সাহিত্যের ভাব, ভাষা, প্রকার, গঠন ইত্যাদি বিষয়ে তো বটেই,—এসব ছাড়া ছন্দ এবং শব্দ সম্বন্ধেও তিনি মৌলিক আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার মধ্যে ছুটি কথা খুবই বড়ো বলে মনে হয়। একটি কল্যাণের আদর্শ; অন্যটি সৃষ্টির রহস্যবোধ। আমাদের সাহিত্য-বিবেকের এই ছুটি স্বীকৃতি রবীন্দ্রনাথও তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে পুনরায় সমর্থন করেছেন। বিচারের কাজে তাঁকে যখনই নামতে হয়েছে তখনই বৈজ্ঞানিক এবং রসিক দেখা দিয়েছেন পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে। বিনয়ী রসিক তবু যেন কুণ্ঠা বোধ করেছেন। 'পাছে লোক কিছু বলে', এই ধরনের সংকোচ জেগেছে তাঁর সত্তার গহনে। এই কুণ্ঠার বোধটিই স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ছেলেভুলানো ছড়া-'র প্রথম দু'তিনটি অনুচ্ছেদে,—যেখানে তিনি বলেছেন—

> "আমার কাছে কোন্‌টা ভালো লাগে বা না লাগে এই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। কারণ, যাঁহারা সুনিপুণ সমালোচক, এরূপ রচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।"

'পঞ্চভূতের ডায়ারি'-তে 'কাব্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—

> "কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির রচনাশক্তি পাঠকের রচনাশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়; তখন স্ব-স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ-বা নীতি, কেহ-বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন।"

এ হলো ১৮৯০-এর দশকের কথা। কাব্যের সত্য কি, সে কথা যিনি না বোঝেন; কাব্যের সমালোচনা তাঁর পক্ষে পণ্ডশ্রম মাত্র। তাই ঐ দশকেই 'কর্মফল' কবিতাটির মধ্যে তিনি লিখেছিলেন—

> "পরদুঃখ সত্য হলে'
> কি ঘটে মোর সেটা জানি।
> আবার আমায় টানবে ধরে'
> বাংলা দেশের এ রাজধানী।"

এবং সেই কল্পিত পরজন্মে—

"আমায় হয়ত করতে হবে
আমার লেখা সমালোচন।"

ইহজন্মে নিষ্ঠুর, অরসিক, মুষলধারী সমালোচকের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথেরও নিস্তার ছিল না। তাই পরজন্মে তিনি হয়তো নিজের রচনারই 'ধূম্রলোচন' সমালোচক হয়ে জন্মগ্রহণ করবেন, এমন দুঃস্বপ্নও তাঁর মনে এসেছিল! সেই দুঃস্বপ্ন অবশ্য প্রকৃত দুঃস্বপ্ন নয়। যিনি সত্যদ্রষ্টা কবি, আত্মপ্রত্যয় তাঁকে কখনোই পরিত্যাগ করে না। দুঃস্বপ্নের ভানটুকু কৌতুকের হাসি দিয়ে ভরে তুলেছিলেন তিনি—

"বল্‌ব, এসব কি পুরাতন।
আগাগোড়া ঠেক্‌চে চুরি।
মনে হচ্ছে, আমিও এমন
লিখ্‌তে পারি ঝুড়ি ঝুড়ি।
আরো যে সব লিখব কথা
ভাবতে মনে বাজচে ব্যথা,
পরজন্মের নিষ্ঠুরতায়
এ জন্মে হয় অনুশোচন।"

সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজের লেখার মধ্যে অনেক কথা ছড়িয়ে আছে। তা থেকে মোট যে-কথাটি পাওয়া যায়,—সেই কল্যাণ-বোধ, সৃষ্টিরহস্যের স্বীকৃতি ইত্যাদি প্রসঙ্গ তো আগেই বলা হয়েছে। তাছাড়া স্রষ্টা এবং সমালোচক উভয়ের জন্যই তিনি একটি কথা দিয়ে গেছেন। সে কথা আর-একটি কবিতার সাহায্যেই বলা যেতে পারে—

"সব লেখা লুপ্ত হয় বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে" —লেখা : পরিশেষ

এক যুগের পরে অন্য যুগ শুরু হয়। সাহিত্যের প্রযুক্তির পরিবর্তন হয়। প্রসঙ্গের রুচি বদলে যায়। নতুন শ্রোতা এবং নতুন পাঠকের নতুনতরো দাবী দেখা দেয়। আমাদের সাহিত্য-বিবেকের কাছে এই সর্বস্বীকার্য কথাটি রবীন্দ্রনাথের মতো এতো বেশি বার আর কেউই নিবেদন করেননি!

নীরস কাটা-ছেঁড়ার প্রসঙ্গ শেষ হলো। এইবার কবিতার দিকে ফেরা যাক্।

বাংলা কবিতার কথা

বার্ড'সার্থের কবিতার আলোচনা-সূত্রে ব্লেক বলেছিলেন, 'সত্যিকার কবিদের মধ্যে কোনোরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আমি ভাবতেও পারি না। স্বর্গে সবাই সমান, সেখানে 'সব-থেকে সেরা' বলে আলাদা কোনো সম্প্রদায় নেই! কবিতার রাজ্যেও তেমনি।'

ব্লেকের কথা যে এক হিসেবে অকাট্য, সেকথা মনে-মনে মানলেও কবিদের কবিতা পড়বার সময়ে তাঁদের জাতিভেদের অনুভূতি মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। যে-কোনো স্বর্গেই হোক, গোবিন্দচন্দ্র দাস এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক পাশাপাশি বাস করবার সমানতন্ত্র লাভ করেছেন, একথা ভাবতে মনে উৎসাহ পাওয়া যায় না। 'ছবি ও গান,' 'শৈশব সঙ্গীত,' 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতি বই লেখা শেষ করে রবীন্দ্রনাথ যখন 'মানসী'র কবিতাগুলি শুরু করেছিলেন, তারই কাছাকাছি সময়ে গোবিন্দচন্দ্র দাস তাঁর 'কুঙ্কুমের' কবিতাগুলি লিখেছিলেন। সে বইয়ের একটি কবিতায় নারী-হৃদয়ের রহস্যের কথা এই ভাবে ব্যক্ত হয়েছে—

"কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?
একটু চাপিয়া বুকে, শোণিত উঠিল মুখে
একটুকু আলিঙ্গনে ভেঙ্গে দিলে হাড় !
কে জানে রাক্ষসি তোর, শুধু ঠোঁটে এত জোর,
চুম্বনে করিলে চূর্ণ পরাণ আমার।
কেমনে বুঝিব নারি হৃদয় তোমার ?"

অভিজ্ঞতাটি মর্মান্তিক, সন্দেহ নেই। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের জনপ্রিয়তা সত্বেও এ-রচনা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'-র সঙ্গে একই স্বর্গে সমান গৌরবের রোশনাই ভোগ করছে, একথা মনে করবার সংগত কোনো কারণ নেই। ব্লেক্ নিশ্চয় তা বলতে চাননি। জয়দেবপুর,—ঢাকায় বসে, গোবিন্দচন্দ্র তাঁর নিজের ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্তর থেকে নারী-হৃদয় সম্বন্ধে যে রহস্যবোধের কথা ১২৯৫ সালের ২রা ফাল্গুন তারিখে লিখে ফেলেছিলেন, ১২৯৪ সালের ৩রা অগ্রহায়ণের কবিতা 'নিষ্ফল কামনা'-তে রবীন্দ্রনাথ, কিছু আগেই তার

অনুরূপ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছিলেন। তাতে ‘শোণিত’-ও নেই, ‘হাড়’-ও নেই,—‘রাক্ষসি’ বলে সম্বোধন করে কোনো বিম্বাধরা-কে বিড়ম্বিত করবার আয়োজনও নেই সেখানে। এক ঐকান্তিক ক্ষুধা এবং ক্ষুধার ঐকান্তিক অতৃপ্তি সেখানে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। দেহের দেহলীতে ধরা দেননি বাঞ্ছিত। তিনি স্ত্রী, না পুরুষ? তিনি শরীরী, না অশরীরী?

"দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়ন
চেয়ে আছি দুটি আঁখি মাঝে।
খুঁজিতেছি কোথা তুমি,
কোথা তুমি।
যে অমৃত লুকানো তোমায়
সে কোথায়।"

নারী-হৃদয়ের কথায় ভাওয়ালের দরিদ্র, জনপ্রিয় কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস বলেছিলেন—

"ক্ষিপ্ত কুকুরের বিষে, পাগল করিছে কি সে
জলাতঙ্কে করে প্রাণে আতঙ্ক সঞ্চার
হাত দিয়ে কি বুঝিব হৃদয় তোমার?"

আর, রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

"অন্ধকার সন্ধ্যার আকাশে
বিজন তারার মাঝে কাঁপিছে যেমন
স্বর্গের আলোকময় রহস্য অসীম,
ওই নয়নের
নিবিড় তিমিরতলে, কাঁপিছে তেমনি
আত্মার রহস্য শিখা।
তাই চেয়ে আছি।
প্রাণ মন সব লয়ে তাই ডুবিতেছি
অতল আকাঙ্ক্ষা-পারাবারে।"

অতএব প্রসঙ্গ কতকটা অভিন্ন হলেও এক্ষেত্রে দু'জন কবি যে দু'জনই,—

তাঁরা যে এক নন, অভিন্ন নন, পরস্পর পরস্পরের ছায়া মাত্র নন, এই নিতান্ত পরিচিত সত্য এখানে পুনরায় স্বীকার করে নেওয়া গেল।

কোনো বিশেষ কালের কবিতার ধারা অনুসরণের অভিজ্ঞতায় এ সত্য বার-বার ধরা পড়ে যে, এক যুগে বাস করলেই সেই যুগের সব কবি সমধর্মী, সমবিশ্বাসী, সমবোধময় অথবা সমমনা হতে বাধ্য থাকেন না। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাধর বিরলসত্তার কথা বাদ দিলেও এ সত্য অটুট থাকে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং মানকুমারী বসু জন্মেছিলেন একই সালে, কিন্তু ১৮৬৩ সালের জাতকমাত্রেই কবি হবেন, এমন বিধিলিপি যেমন কল্পনার অতীত, সমকালবর্তী কবিজাতক মাত্রেই সমশক্তিসম্পন্ন হবেন, এরকম ধারণাও তেমনি অলীক। আবার, অনেক দিন বাঁচতে পেলেই যে সব কবির প্রজ্ঞা এবং প্রযুক্তি সমান পরিণতির সুযোগ পায়, তাও নয়। রবীন্দ্রনাথের সময়ে, রবীন্দ্রনাথ এবং বিজয়চন্দ্র মজুমদার উভয়েই প্রায় সমান পরমায়ু পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১-তে জন্মগ্রহণ ক'রে ১৯৪১-এ মারা গেছেন; বিজয়চন্দ্র একই সালে জন্মেছিলেন, মারা গেছেন রবীন্দ্রনাথের এক বছর পরে,—১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে। যশ, শক্তি, সিদ্ধি, কোনো দিক দিয়েই এঁদের দুজনের নাম কোনো রকম অতি-সাদৃশ্যের নৈকট্যে ঘনিষ্ঠ মনে করবার হেতু নেই।

সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা দীক্ষার পরিমাণ, বংশগত ঐতিহ্য, বিত্তগত অবস্থা ইত্যাদি নানা ব্যাপারের ওপর এক-একটি মনের বিশেষ মনন-স্বভাব নির্ভর করে। অন্যান্য প্রয়াসের মতো কাব্যরচনার ব্যাপারটিও এক রকম মানসিক প্রয়াস। এ কাজের দোষগুণ বিচার করতে হলে কবিতার আদর্শের কথা ভাবা দরকার। অর্থাৎ, কবিতার স্বরূপ কী, তা জানা চাই। আমাদের বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ধারায় যতো কবিতা দেখা দিয়েছে, সেই বিচিত্রতার মধ্যেই তার স্বরূপ-রহস্য নিহিত আছে। বরিশালের ফুল্লশ্রী গ্রামে প্রচলিত, পুরোনো দিনের সূর্য-ঠাকুরের গানে লুপ্তনাম গ্রাম্য কবি লিখেছিলেন—

"ঘটের আড়ে রইয়া সূর্যাই মুইঞা মুইঞা চায়
শ্বেত ধূপের গন্ধে সূর্যাই পূজা খাইতে যয়।
পূজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্যাই জলপান কল্লা কি
হাল্যা বাড়ীর দুগ্ধদধি গোয়াল-বাড়ীর ঘি॥

পূজা খাইয়া ছাওয়াল সূর্যাই চতুর্দিকে চায়।
জলপান কল্লা ছাওয়াল সূর্যাই মুখশুদ্ধ কল্লা কি।
বারৈ বাড়ীর পান সুপারি গাছের হরতকী॥

[সূর্যপূজার আয়োজন হয়েছে। পূজার মঙ্গলঘটের আড়ালে (আড়ে) বসে ধূপের সৌরভে প্রসন্নচিত্ত বালক সূর্যদেব কৃষক পরিবারের (হাল্যা-বাড়ীর) দধিদুগ্ধ, গোপ-পরিবারের ঘি ইত্যাদি সেবন করে মুখশুদ্ধির জন্য বারুজীবী-পরিবারের (বারৈ-বাড়ীর) দেওয়া পান-সুপারি ইত্যাদি অর্ঘ্য মুখে দিলেন।]

আকাশের সূর্য সে যুগে গ্রাম্য কবির কবি-কল্পনার গুণে মানুষের ঘরের ছেলে হয়ে আঙিনায় বসে আহার করে গেছেন!

কৃত্তিবাসের রামায়ণে সীতার অগ্নিপ্রবেশের পরে শোকার্ত রামের মুখে এই সব কথা দেওয়া হয়েছে—

"যারে না দেখিলে প্রাণ তিলেক না রয়।
সে মোর আগুনে পুড়্যা হল্য ভস্মময়॥
জানকীরে সঙ্গে লয়্যা হল্যাও বনবাসী।
কি লয়্যা যাইব দেশে কর‍্যা ভস্মরাশি॥
পরীক্ষা চাহিআ ভাই কি কর্ম্ম করিল
কাঞ্চন-প্রতিমা সীতা আগুনে পুড়িল॥
এ মোর কপাল মন্দ বিধি বাম হল্য
সমুদ্রে তরাঁয়্যা নৌকা শুকনায় ডুবাল্য॥"

এই শোকোক্তি বহুকাল বহু পাঠকের মনে গভীর বেদনার ঢেউ তুলেছে।

আবার, সেকালের কাব্যের অবাধ দক্ষিণ্য যশতঃ নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণে' বেহুলার বিবাহে রান্নার ফিরিস্তি প্রবেশ করেছে—

"মুগ দিয়া মুগ দাইল আর মুগের বড়ি।
ঘৃতে ভাজিয়া কত তুলিল সিঙ্গাড়ি॥
তিল দিয়া তিলুয়া আর তিলের বড়া।
তিল দিয়া রান্ধিলেক তিল কুমুড়া॥"

বেহুলার জননী তারকারাণী আমিষ-নিরামিষ দুরকম রান্নাতেই ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সুতরাং শুধু মুগডাল, মরিচ দিয়ে চৈ-এর ঝোল, 'পোর লতার' শুক্ত মাত্র নয়—

"ভাজিয়া তুলিল কত চিথলের কোল।
মাগুর মৎস দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল॥"

—এই ভাবে নিরামিষের পরে আমিষ; মৎস্যের পরে মাংস, এবং মাংসের পরে, নারায়ণ দেবের জনপ্রিয় কাব্য—

"পরমান্ন পিটাতে করিল প্রবেশ।"

লোকরুচির দীর্ঘ সমর্থন পাওয়া এইসব কাব্য-কবিতার যুগ যে এখন শেষ হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একালে এরকম পদার্থ আর কবিদের ভাবায় না, কাঁদায় না, সৃষ্টিসুখের আশ্চর্য কোনো উল্লাস দেয় না। ভারত-চন্দ্রের সঙ্গে-সঙ্গে এ-ধারা শেষ হয়ে নবধারার সূত্রপাত ঘটেছিল। রামায়ণ-মহাভারত, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, গোবিন্দদাস-গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কথা, এসব প্রসঙ্গ অতিক্রম করে, ভারতচন্দ্রের আধুনিকতম কাব্যজগতের ঐতিহ্য মনে রেখে, কবিওয়ালাদের দল ছেড়ে, ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল বাঁড়ুয্যে যখন ছাপা-সাহিত্যের নূতনতর জগতে প্রবেশ করলেন, তখন থেকে বাংলা কবিতায় য়ুরোপের শাসন শুরু হয়েছে, বলা যায়। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্র, এই ব্যাপক অর্থে, উনিশের শতকে শুরু হয়ে অদ্যাবধি প্রসারিত রয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে যে খাঁটি বাঙালী ভাব বাংলা কবিতার সর্বাঙ্গে জড়িত ছিল, ঈশ্বর গুপ্ত তার শেষ প্রতিনিধি। তিনি সেকালের শেষ এবং একালের সূচনা! প্রাচীন কালের বাংলা কাব্যে ভোজ্য রস প্রবর্তনার মর্যাদা বজায় আছে তাঁর আনারস, তপসে মাছ, পাঁটার প্রসঙ্গ-নির্বাচনে। কবির লড়াইয়ে শিক্ষিত কবি তাঁর আপন সমাজে সাহেবীয়ানার প্রবেশ লক্ষ্য করে খাঁটি বাংলা ভাষায় বাংলা ভঙ্গিতে বলেছেন—

"যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

যদি অনাথ বামুন হাত পেতে চায়
ঘুসি ধরে ওঠেন তবে।
বলে, গতোর আছে, খেটে খেগে
তোর পেটের ভার কেটা ব'বে ?"

'গতোর', 'ট্যাঁস', 'ছুঁড়িগুলো', 'তুড়ি মেরে', 'আকাল'—'জমিদার সব কাচা ঢিলে', 'সাত চড়ে রা ফোটেনাক', পোড়া ভাগ্‌গি, সকল মাগ্‌গি' ইত্যাদি অকৃত্রিম বাংলা শব্দ এবং শব্দবন্ধের প্রাচুর্য আছে তাঁর কবিতায়। পুরোনো কালের বাংলা কবিতার কথ্য রীতির লক্ষণ ফুটেছে গুপ্ত-কবির লেখাতে। রঙ্গলালও পুরোনো ধারা ভুলতে পারেন নি। কিন্তু, তিনি ছিলেন প্রধানতঃ লেখ্য রীতিরই সাধক। সাধু ক্রিয়াপদ বজায় রেখে গুপ্ত-কবি যেখানে অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভঙ্গি স্বীকার করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর অভ্যস্ত আটপৌরে ভঙ্গি থেকে বড়ো জোর এইটুকু মাত্র সরে এসেছেন—

"উড়িয়াছে আকাশেতে সুচারু ফানস
তাহাতে মানুষ বসে প্রফুল্ল মানস ॥
সাবাস সাহস তার কিছু নাই ভয়
যত উঠে তত মনে সুখের উদয় ॥
নগরের লোক যত করে হই হই
দেখি যত আমি তত কত সুখী হই ॥"

দূর শূন্যে ভাসমান প্রথম যুগের ব্যোমযানের বিস্ময় ধরা পড়েছিল সেকালের যুগ-প্রতিনিধি নবীন কবির রচনায়। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর আটপৌরে ভাষাতেই সে বিস্ময় ব্যক্ত করেছেন—

"কেহ বলে দেখা যাবে এইখানে রই।
কেহ বলে এতক্ষণে হলো চাঁদসই ॥
হেলে দুলে নেচে নেচে চলে থরে থরে।
মহাবেগে চড়িয়াছে মেঘের উপরে ॥"

মেঘান্তরাল-সীমা অবধি ব্যোমযানের দৃশ্য দেখে নিয়ে তাঁর দৃষ্টি ফিরে এসেছিল অন্য লোকে। সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত খুশিতেই দেখা দিয়েছিল লোকমুখ-চলিত 'চাঁদসই' কথাটা। মেঘের আড়ালে ব্যোমযান অন্তর্হিত হবার পরে

এমন বিস্ময়ের কথাটা হয়তো আর একটু গম্ভীর, আর একটু কুলীন কবিতার ভাষায় বলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই কবি বলেছিলেন—

"নিরখি নীরদ তারে হয়ে হৃষ্টমন
পুনঃ পুনঃ প্রেমভরে দেয় আলিঙ্গন॥
ভূলোক পুলকপূর্ণ আলোক ঈক্ষণে।
ত্রিলোক করিছে জয় গোলকগমনে॥"

ক্রমশঃ চোখের দেখা থেকে সরে গিয়ে ঈশ্বর গুপ্তের মন তাঁর শব্দগত বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টায় নিরত থেকে দুর্ভাগ্যবশতঃ কবির আসল দায়িত্ব বিস্মৃত হয়েছিল। তখন, একালের এবং চিরকালের মুদ্রাদোষপ্রবণ কবিদের মতো তিনি একবার মধ্যযুগের তৎসম শব্দবাহিত শ্লেষ-যমক-অনুপ্রাসের কসরৎ দেখিয়েছেন,—আবার, নতুন ইংরেজি-বুকনি-শেখা বালকের মতো ব্যোমযানের প্রসঙ্গ থেকে 'টাইট', 'কাইট', 'সাইট', 'ফাইট', 'রাইট', লাইট', 'বাইট'-এর [tight, kite, sight, fight, right, light, bite] মিল ব্যবহার করেছেন। একবার প্রাচীন রীতিতে বলেছেন—

"আরবার ভাবি যত আকাশের তারা।
তারা নয় তারা হয় তারানাথ-দারা॥
বিনোদ বিমানে বসি বিশেষ বিরলে।
সেই তারা হার করি পরিতেছে গলে॥"

পুনরায়, একই নিঃশ্বাসে, লোচনদাসের মতো কথ্য শব্দরীতির সঙ্গে, নতুন-শেখা ইংরেজি শব্দের খিচুড়ি পরিবেষণ করে এই রচনার শেষ দিকে তিনি বলেছেন—

"হরিয়া লইবে শশী করিয়া 'ফাইট'॥
মনে এই ভাবিয়াছে হইলে 'নাইট'।
কেড়ে লবে আমাদের চাঁদের 'রাইট'।
চেলেছে নূতন কল জেলেছে 'লাইট'।
এখনি নাশিব তারে করিয়া 'বাইট'॥
চঞ্চল চকোরচয় চঞ্চুর আঘাতে
"কাইট বাইট" করি দিলে অধঃপাতে॥"

রঙ্গলাল [১৮২৭-১৮৭৭] ঈশ্বর গুপ্তের [১৮১২-৫৯] চেয়ে বয়সে প্রায় বছর পনেরো ছোট ছিলেন। মধুসূদনেরও [১৮২৪-১৮৭৩] পরে জন্মেছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের জন্মের আগেই ঈশ্বর গুপ্ত মারা গেছেন। আর, রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন প্রায় ষোল বছর,—'ভারতী'র প্রথম বছরে [১২৮৪ বঙ্গাব্দে] 'কবিকাহিনী' যখন ধারাবাহিক ভাবে ছাপা শুরু হয়েছে, রঙ্গলাল গোকাগুরিত হয়েছেন সেই সময়ে। আগেই 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' বেরিয়ে গেছে। রঙ্গলালের চার বছর আগে মারা গেছেন মধুসূদন। তবু, রঙ্গলালের কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের মতো যথেষ্ট বাঙালীত্ব নেই,—প্রথম বয়সের মধুসূদনের মতো তেমন সাহেবীয়ানাও নেই,—তাঁর গ্রন্থাবলীর যে কোনো জায়গা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে তাঁর ভঙ্গির গতানুগতিকতা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য নয়। ভঙ্গির দিক থেকে তিনি যেমন পুরোনো বাংলা কবিতার অনুকরণ করেছেন, প্রসঙ্গের দিক থেকে তেমনি আবার ইংরেজি-পড়া নব্যতার পরিচয় রেখে গেছেন। চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মধ্যযুগের কাব্যে 'বারমাস্যা' ইত্যাদি বর্ণনায়,—বৈষ্ণব পদাবলীর কোনো-কোনো ক্ষেত্রে,—ভারতচন্দ্রের কবিতাবলীতে যে রকম ছন্দ, অলঙ্কার, শব্দ-প্রকৃতি দেখা যায়, রঙ্গলালের কবিতায় সেই ধারারই অনুসৃতি চোখে পড়ে। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' যুদ্ধের বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের-ই প্রতিধ্বনি শোনা গেল—

"মহাঘোর যুদ্ধে মুসলমান মাতে
দিবারাত্র ভেদে ক্ষমা নাহি তাতে॥
সহস্রেক যোদ্ধা চিতোরের পক্ষে।
বিপক্ষের পক্ষে যুঝে লক্ষে লক্ষে॥
বহে রক্তধার বুঁদেলা শরীরে।
হয় জাত সেনা ঘন স্বেদনীরে॥
গুড়ুম গুম্ গুড়ুম গুম্ মহা শব্দ তোপে।
পড়ে সৈন্য ঠাট তরবার কোপে॥"

রঙ্গলালের এই যুদ্ধ-বর্ণনায় সঙ্গে 'অন্নদামঙ্গলের' মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের যেমন কতকটা বর্ণনাগত সাদৃশ্য আছে, তেমনি এখানকার ভুজঙ্গপ্রয়াতের ধ্বনির সঙ্গে ভারতচন্দ্রের 'শিবের দক্ষালয় যাত্রা'র ধ্বনিগত সাদৃশ্যও বিদ্যমান। ভারতচন্দ্রের অনুসরণ করে রঙ্গলাল একাবলী প্রভৃতি

সংস্কৃত ছন্দ ব্যবহার করেছেন, বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে মাঝে-মাঝে ঘোরতর শব্দ-যুযুৎসুর দক্ষতা দেখিয়েছেন [যেমন, 'স্তোত্র'—পদ্মিনী-উপাখ্যান ; শ্রীনাথের স্তব'—কাঞ্চী কাবেরী, তৃতীয় সর্গ ইত্যাদিতে], আবার, ভারতচন্দ্রের মতোই ধ্বন্যাত্মক শব্দের বাহাদুরি দেখাবার চেষ্টা করেছেন কোনো-কোনো জায়গায়। 'কর্মদেবী'-র তৃতীয় সর্গে 'উন্দ ধুন্দ ধুন্দমারী,' 'জড়াজড়ি, গড়াগড়ি, পড়াপড়ি ক্ষেত্রে' প্রভৃতি প্রয়োগের মধ্যে এই সাদৃশ্যের চিহ্ন আছে। 'পদ্মিনী-উপাখ্যানে'র 'দারুণ দুর্নীত দুষ্ট দুরাত্মা দনুজ',—'কপট লম্পট শঠ পাতকে পুলক',—'শূর-সুন্দরী'র 'কুমুদিনী আমোদিনী হিমকর করে' প্রভৃতি উক্তিতে তাঁর অনুপ্রাসের ঝোঁক প্রকট হয়েছে। উপমার ব্যবহারেও তিনি প্রাচীনপন্থী। পুরোনো প্রসিদ্ধ রূপক-উপমা দিয়েই তিনি পদ্মিনীর রূপ বর্ণনা করেছেন। তারই মধ্যে একটু মৌলিকতা আছে।

"পদ্মিনীর পদ্মনেত্র বিনোদ বিহার ক্ষেত্র
ব্রীড়া তাহে সদা ক্রীড়া করে।"

এইভাবে বর্ণনা শুরু করে তিনি বেশ কিছুদূর এগিয়েছেন বটে,—কিন্তু অতীতের এই নীতি যে তাঁর নিকট-বর্তমানের রুচিকর ছিলো না, সেকথাও অবশেষে স্পষ্ট জানিয়ে গেছেন।

"মৃগপতি যূথপতি দ্বিজপতি গজমোতি
তিল ফুল কোকিল খঞ্জন ॥"

—ইত্যাদি কথার তালিকা শেষ করে অবশেষে তাঁকে লিখতে হয়েছে—

"এই সব উপমার প্রয়োজন নাহি আর
নব কবিজনের বাঞ্ছিত।
কহিলাম যতগুলা পদ্মিনী রূপের তুলা
কেহ নহে সকলি লাঞ্ছিত।"

রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যান [১৮৫৮], কর্মদেবী [১৮৬২], শূরসুন্দরী [১৮৬৮], কাঞ্চী কাবেরী [১৮৭৯] ইত্যাদি কাব্য যখন প্রকাশিত হয়েছে,—বাংলা কবিতার ধারা তখন মধ্যযুগ অতিক্রম করে,—মধুসূদনের নেতৃত্ব বরণ করে,—অধ্যয়নের বৈচিত্র্যে, অনুশীলনের আন্তরিকতায়, জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধায়, এবং নতুনত্বের সেবায় নতুন এক বাঁক নিতে শুরু করেছে। 'কলের গাড়ী'

'তাড়িত্বার্তাবহ' 'ব্যোমযান' ইত্যাদি দেখে ঈশ্বর গুপ্ত নবযুগের নতুন বিষয় পেয়েছিলেন বটে। ইংরেজ শাসনের সঙ্গে-সঙ্গে পশ্চিমের বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার আমাদের দেশের মাটিতে এবং জনসাধারণের জীবনে সেই প্রথম প্রবেশ করেছে। সূর্যঠাকুর, রাধা-কৃষ্ণ, মনসা-চণ্ডী-ধর্ম ঠাকুরের দিন পেছনে ফেলে ঈশ্বর গুপ্তের কণ্ঠে ভর করে নতুন বাংলার মন বলেছে—

"কি আশ্চর্য রেল-রোড দেখ দেখ সবে।...
ভারতে কি ছিল ইহা ভারতে কি আছে?"

বিজ্ঞানের প্রসাদে পৃথিবীর দেশ-দেশান্তরের দূরত্ব সঙ্কুচিত হচ্ছে,—ইংরেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে-সঙ্গে য়ুরোপের আচার, ব্যবহার, ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান ভিড় করে এসে পড়েছে তখন। স্পর্শকাতর তীক্ষ্ণ কবিচৈতন্য সেদিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকতে পারেনি,—নিঃসংশয় অনুভূতির গুণে ঈশ্বর গুপ্ত বুঝতে পেরেছিলেন ভবিষ্যতের ভবিতব্য—

"পাইতেছি কত দ্রব্য প্রয়োজন মত।
কত দেশে যায় লোক কত শত শত॥
নূতন নূতন দেখে কুশল অশেষ।
স্বদেশ বিদেশ আর না হয় বিশেষ॥
জাহাজ কেবল নয় কত দেখ আর।
বস্ত্র অস্ত্র যন্ত্র আদি অশেষ প্রকার॥"

—বিজ্ঞান-বিদ্যা।

অর্থাৎ, গ্রাম থেকে নগরে প্রবেশ করবার দিন এসে গেছে, বাংলা কবিতার স্রোত তখন নতুন একটি বাঁক নিতে শুরু করেছে।

ঈশ্বর গুপ্ত লোকান্তরিত হয়েছেন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর মৃত্যুকাল থেকে অদ্যাবধি এই শ'-খানেক বছরের মধ্যে সকল বিভাগেই বাংলা সাহিত্য দ্রুত পরিণতি লাভ করেছে। ১৮৫০ থেকে ১৯৫০-এর মধ্যে বাংলা কবিতার ইতিহাসে ন্যূনপক্ষে চারটি পৃথক যুগ অতিবাহিত হয়েছে। প্রথমে, ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলালের যুগ। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে সেই যুগেই আমাদের ঘনিষ্ঠতার সূচনা। তারপর মধুসূদনের নেতৃত্বে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের 'কৃত্রিম' ক্লাসিক-যুগ। সে যুগে য়ুরোপের কাব্যলোক থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ এলো, চতুর্দশপদী

কাব্যরূপ এলো। কর্মবাদী মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য ভঙ্গিতে নতুন চোখে প্রাচীন রাবণের নবরূপ উপলব্ধি করলেন। সিদ্ধরসের বিরোধিতা ঘটলো। নতুনের ঐকান্তিক মমতায় আত্মসমর্পণ করে বাংলা কবিতা তার অতীতকে ফিরে পেলো নতুন রূপে, প্রগাঢ় উদ্দীপনার পাত্রে! মধুসূদনের পরে নবীন সেনের সঙ্গে-সঙ্গে বিহারীলাল এবং অক্ষয় চৌধুরীর যে লেখাগুলি আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেখান থেকেই তৃতীয় যুগের সূচনা। বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'ভোরের পাখি'। সে হলো 'রোম্যান্টিক' মর্জির ভোর। তার লক্ষণগুলি পরে দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথ-ই সেই তৃতীয় যুগের চূড়ান্ত পরিণতি। তারপর রবীন্দ্রনাথের সময়েই আবার যুগান্তর ঘটেছে। তথাকথিত 'রবীন্দ্রোত্তর' কবিরা সেই যুগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। মোটামুটি ১৯১৬ থেকে সেই চতুর্থ যুগের সূচনা ধরা যায়। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ছাপা হয়। 'বলাকা'-র প্রকাশকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের তারিখ ১৯৪১ অবধি মোট পঁচিশ বছরের মধ্যে বাংলা দেশের নবীনতর কবিরা বাঙালী জীবনের কঠোরতর বর্তমানের স্থূল চেহারাটা আর উপেক্ষা করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথই যে তা উপেক্ষা করেছিলেন, সেকথা নয়। জীবনের কোনো কথাই তিনি উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গির সঙ্গে নবীনদের ভঙ্গির ভেদ দেখা দিলো। ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে ভঙ্গির ভেদ তো থাকবেই। সে রকম সাধারণ ভেদ নয়। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইস্লাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র,—১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এই তিনজন কবিই অবশ্য-স্বীকার্য নতুন এক দৃষ্টিভেদ প্রবর্তন করলেন। রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ্-কথা, সর্বভূতান্তরাত্মা-বাদ, বিশ্বময় অধ্যাত্মবোধ, প্রণয় ও প্রকৃতির বিশিষ্ট চৈতন্য, জীবনদেবতার স্বীকৃতি ইত্যাদি বিশ্বাসের সূর্যালোক রইলো মনের অবকাশ-লগ্নের ঐশ্বর্য হয়ে। আর, প্রতিদিনের কাজের সংসারে—সাধারণ মানুষের শ্রম, স্বেদ, বস্তুসমস্যা-কণ্টকিত ঊষরতার মধ্যে,—বেকার সমস্যায়, নৈরাশ্যে, দুর্যোগে ছিন্ন-ভিন্ন প্রতিদিনের দুনিয়াতে বাংলার কবিতা পেলো নতুন আশ্রয়-তরু। রবীন্দ্রনাথ বনস্পতি। তাঁরা তাঁরই বীজ। কিন্তু ঝড়ের প্রমত্ততায় যে গাছ তারুণ্যেই ছিন্নশাখা, ভগ্নকাণ্ড,—কীটের অত্যাচারে যারা ছিন্নমূল,—কাঠুরিয়ার অন্ধতায় যারা শৈশবেই জীর্ণ হয়,—নিন্দার্থে নয়,—সেই সব পাদপের সঙ্গেই এঁদের কতকটা সাদৃশ্য চিন্তা করা যায়। পরিণত জীবনে

প্রেমেন্দ্র গভীরতর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার দিকে ঝুঁকেছেন। কিন্তু পরবর্তী কালের ভঙ্গি-প্রধান 'আধুনিকত্ব' [আধুনিকত্ব অবশ্য সব সময়েই ভঙ্গির নতুনত্ব; কিন্তু শুধু ভঙ্গিরই নয়] তিনি এড়িয়ে চলেছেন। সে দিনের যুগান্তর-সূচনায় যতীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ দুঃখবাদী,—স্বপ্নবিরোধী; নজরুল ছিলেন উচ্চকণ্ঠ, মিশ্রভাষী, অসংযত,—আর, প্রেমেন্দ্র ছিলেন বিশ্বাসী, বলিষ্ঠ, আত্মস্থ এবং সর্বাধিক শক্তিমান।

১৮৫০ থেকে ১৯৫০-এর অন্তর্বর্তী এই চার যুগের শেষেরটির মধ্যেই লক্ষণীয় আরো কয়েকটি তরঙ্গের কথা মনে আসে। এই তরঙ্গাবলীর একটিকে বলা যায় য়ুরোপ-অ্যামেরিকার 'অতি অনুকরণের ঢেউ',—দ্বিতীয়টিকে বলা যায়, 'গ্রামগাথার ঢেউ',—তৃতীয়টির নাম দেওয়া যেতে পারে 'স্বপ্নাবসাদ'। প্রথম ঢেউয়ের শীর্ষে বহুদিন আসীন ছিলেন বিষ্ণু দে,—বর্তমানে আছেন অমিয় চক্রবর্তী; দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত জসীমউদ্দীন; তৃতীয়টির সমর সেন এবং জীবনানন্দ দাশ। এছাড়া আরো বিশেষত্ব এবং প্রবণতাভেদের কথা ভাবা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভৌগোলিক এবং বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ চিন্তার কবিতা;—তাঁর এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়া;—সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গম্ভীর ভাষা;—অজিত দত্তের সনাতন পন্থা, আধুনিক মর্জি, স্থায়ী আবেদন,—বুদ্ধদেব বসুর কবিতা-আন্দোলন,—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দ এবং প্রসঙ্গের নতুনত্ব! এই পর্ব নিয়ে অজস্র বাদ-প্রতিবাদ চলেছে। এঁদের প্রত্যেকের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, বহু ভেদ আছে,—সেসব আলোচনা অল্পকথায় শেষ হবার নয়। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার রাজ্যে বিপুল বৈচিত্র্যের দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। সেই পঞ্চাশ বছরের কবিতা সম্পর্কে অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু এখানে সে কাজ সম্ভব নয়।

প্রকার, রূপ, গঠন, চিত্র

একারম্যানের সঙ্গে কথোপকথনের মধ্যে গোটে বলেছিলেন—'কবির অজ্ঞাতসারেই তাঁর কবিতায় ছন্দ এসে দেখা দেয়। কবিতা লেখবার সময়ে তাঁকে যদি সজ্ঞানে ছন্দের খুঁটিনাটি আইনের কথা ভাবতে হতো, তাহলে, উন্মাদ হয়ে যাওয়া ছাড়া তাঁর আর গত্যন্তর থাক্‌তো না।'

একা গোটে কেন, যে-কোনো সুস্থ, বিবেচনাক্ষম রসিক ব্যক্তির কাছে এই রকম মন্তব্যই শোনা যাবে।

কবির ভেতরের অনুভূতি, মনন, পূর্বস্মৃতি ইত্যাদির সম্মিলিত তাড়না থেকেই কবিতার ছন্দ আবির্ভূত হয়। গদ্যেরও ছন্দ আছে, পদ্যের তো আছেই।

ছন্দের কথা পরে ভাবা যাবে। আগে অন্য উপাদানগুলির ভাবনা ভাবা যাক্‌। কিন্তু 'উপাদান' বলা কি ঠিক হবে? বিষয়টি আর একটু তলিয়ে দেখা যাক্‌। আমাদের দেশে সকল সাহিত্যের ব্যাপক নাম হিসেবে 'কাব্য' কথাটি অনেকদিন ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্যের অনেক শাখা-প্রশাখা। গীতিকবিতা, খণ্ডকবিতা, মহাকাব্য, নাটক,—নাটকের আর এক নাম রূপক,—রূপকের আবার অজস্র ভাগ,—ভাণ, ডিম, সমবকার, ব্যায়োগ, প্রহসন ইত্যাদি ইত্যাদি। এতো গেল প্রাচীন সংস্কৃতের পরিকল্পনা। পশ্চিমের সাহিত্যেও এমনি বহু শাখা-প্রশাখার শাস্ত্রনির্দেশ আছে। গ্রীসের প্রাচীন মহিমার দিনে অ্যারিষ্টট্‌ল প্রভৃতি আলোচকদের আলোচনা ছিল। অ্যারিষ্ট-ট্‌লের খণ্ডিত পুঁথিতে যেটুকু আলোচনা পাওয়া গেছে তার কথা সকলেই জানেন। তাঁর 'Poetics'-এ Lyric, Choric এবং Dithyrambic রচনার উল্লেখ দেখা যাচ্ছে। তা ছাড়া তিনি বলে গেছেন 'ট্র্যাজেডি', 'কমেডি', 'মেলোড্রামা', 'ফার্স' ইত্যাদির কথা। গ্রীসের পরে প্রাচীন রোমের কথা মনে পড়ে। রোমের সাহিত্যতত্ত্বের শাস্ত্রকারদের মধ্যে Horace প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে হোমার, ভার্জিল, স্যাফো, অ্যাল্‌সিয়াস্‌, ঈস্‌কিলাস্‌, ইউরিপিডিস্‌, অ্যারিষ্টোফিনিস ইত্যাদি কতো যে সাহিত্যিক

কতো যে বিচিত্র সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করে গেছেন। সংস্কৃতের শতক-কাব্য, দূত-কাব্য ইত্যাদি কতো কাব্য-কবিতা কতো লোকেই না লিখেছেন!

সেসব বৃত্তান্ত দেখে-শুনে মনে এই প্রশ্নটা বিশেষভাবে জেগে ওঠে যে, সাহিত্যের এতো সব প্রকারভেদের কারণ কি? একালের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ একই কথা একবার গানে বলেন,—আর একবার নাটকে বলেন; কিন্তু দুরকম পাত্রের দরকার কি? শুধু কি দু'রকম? —দু'রকম নয়,—সাহিত্য অশেষ পাত্রে পরিবেষিত হয়। এক-একটি পাত্র-জাতিকে এখানে 'প্রকার' বলছি। ইংরেজিতে Type of Literature বলা হয়। 'Type' বা 'প্রকার'-এর মধ্যে আবার এক-এক রকম 'রূপ' দেখা যায়। এই 'রূপ'-এর ইংরেজি হলো 'Form'। প্রশ্ন এই যে,—এই সব বিশেষ 'রূপ'-এর আসল কারণ কি? পর-পর একই পাত্র-প্রকারের সাহায্যে কবি কি তাঁর চৈতন্যের সব লগ্নের সব কথা পরিবেষণ করতে পারেন? যে কথা একটি ছোটো কবিতায় বল্‌লে অশেষ কালের বুকে ঝঙ্কার লাগে, সেই কথাই সাত তরঙ্গের উপন্যাসে বলা যাবে কি? যদিই বা তা বলা যায়, —তাহলে, তেমন করে বাজবে কি? রচনার বাইরের রূপ কি নিতান্তই বহিরঙ্গশোভা? প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে আছে রচনার নিজস্ব রূপ। সে 'রূপ' শিল্পীর মনের সন্তান। তার রহস্য অশেষ!

ইংরেজিতে Type আর Form কেউ-কেউ বেশি কাছাকাছি অর্থে ব্যবহার করেন। আমি যাকে 'প্রকার' বা 'Kind' বল্‌তে চাই, কেউ-কেউ সেই অর্থেই 'Typical form' কথাটা ব্যবহার করেছেন। 'Type'-কে জাতি বা genus অর্থে গ্রহণ করছি। কিন্তু Form-কে তার প্রজাতি বা species অর্থে মেনে নেওয়া সংগত নয়। সাহিত্যের প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তের মধ্যে স্বতন্ত্র 'রূপে'র প্রকাশ ঘটে থাকে। এই আমার বিশ্বাস। কথাটা এই-খানে ভেবে দেখা যাক্‌। এবং সাহিত্যের প্রকার-কে Type না বলে Kind বলাই ভালো। কারণ, নৈয়ায়িকরা বস্তুর যে-কোনো গুণ বা লক্ষণগত বিভাগকে [accidental] বলেছেন Type-গত বিভাগ; অপর পক্ষে—বস্তুর ব্যাপকতর, অধিকতর, গুরুতর গুণ বা লক্ষণভেদ [essential] থেকেই যথার্থ প্রকারভেদের [difference in kind] ভাবনা দেখা দেয়।

শাস্ত্রকাররা পুরাকালেও এসব কথা ভেবেছেন। একালেও ভাবা হচ্ছে।

একালের একজন পাশ্চাত্য আলোচকের একটি কথা এইখানে তুলে দেখা যেতে পারে। হার্বর্ট রীড রুচিবান, চিন্তাশীল ব্যক্তি। তিনি বলেছেন—

> "There can be no words with their accompanying music, no images with their visual immediacy, no metaphors with their more than verbal meaning unless there is either an intuition of form which I take to be an emotion about fitness, size, appropriateness tension, tautness and so on [as in the sonnet]; or, not alternatively so much as in addition, a progressive invention which will carry the poet on from word to word, line to line, stanza to stanza, book to book until the invention is exhautsed."[১]

—অর্থাৎ, 'কোন্ বিশেষ রূপে কবির কথা আত্মপ্রকাশ করবে, সে বিষয়ে কবির মনোগহনে স্বজ্ঞার বলে কোনো একরকম ধারণা যদি না দেখা দিতো, তাহলে, শব্দের সঙ্গে সুর,—অথবা, ভাষাচিত্রের সঙ্গে তার সঞ্চারণীয় প্রত্যক্ষতা,—অর্থালঙ্কারের সঙ্গে তার অর্থের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা, এসব কিছুই জেগে উঠতে পারতো না। সেই কারণেই কবিতার 'রূপ' [Form] সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে, ও হলো যোগ্যতা, পরিমাপ, যথৌচিত্য, অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গের সংবদ্ধতা, সংহতি সম্বন্ধে [এ সবই যেমন দেখা যায় চতুর্দশপদী কাব্য-রূপের মধ্যে] কবির এক অন্তর্বোধ ও ব্যাকুলতা,—অর্থাৎ এক রকম আবেগ। অথবা, বৈকল্পিক ভাবে নয়,—বরং ঐ ধারণার সঙ্গে আরো যোগ করা যেতে পারে যে, ও একরকম ক্রমাবিষ্কারশক্তি,—যার বলে, কবি তাঁর আভ্যন্তরীণ 'রূপ'-বোধ থেকে উদ্দীপিত হয়ে শব্দের শরণ নেন,—শব্দ ধরে-ধরে পৌঁছে থাকেন চরণের সীমাতে এবং বিস্তারে,—চরণ থেকে চরণান্তরে,—স্তবক থেকে স্তবকের গুচ্ছে; এইভাবে তাঁকে এগিয়ে চলতে হয় যতক্ষণ না আবিষ্কারের বেগটি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায়।'

কাব্যের 'রূপ' সম্বন্ধে ভাবতে বসলে এইভাবে বহিরঙ্গের বিশ্লেষণ থেকে আভ্যন্তরীণ সত্যের অনুধানে গিয়ে পৌঁছুতে হয়।

১। Form in Modern Poety [1932]—Herbert Read p. 61

'Kind' বা 'প্রকার',—Form বা 'রূপ',—এই দুই প্রসঙ্গের পরে আর একটি শব্দের মানে বোঝা যাক্। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Structure', বাংলায় তার নাম দেওয়া যেতে পারে 'গঠন'।

শিল্পের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কথা সম্পূর্ণ এবং অখণ্ড এক-একটি বিকাশ বা অভিব্যক্তি হিসেবেই ভাবা দরকার। কবিতার এক-একটি চরণ কি তার আশ্রয়-স্তবক থেকে আলাদা করে ভাবা যায়? কোনো-কোনো কাব্যরূপের চরণ এবং স্তবকের বিষয়ে গঠনের বিশেষত্বের ওপর বেশি ঝোঁক দিয়ে শাস্ত্রকাররা বিশেষ-বিশেষ বিধি দিয়ে গেছেন,—যেমন চতুর্দশপদী [Sonnet], স্তবকাব্য [Ode] ইত্যাদির কথা বলা যায়। সাহিত্য-রূপের গঠন কিন্তু পুরোপুরি ঘর-বাড়ির গঠন-ব্যাপারের মতো নয়। এক-একখানি ইঁট সাজিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি হয় বটে,—কিন্তু বাস্তুশিল্পীর সামনে থাকে পুরো বাড়িটার মানচিত্র। সাহিত্যিকের মনেও একটা কিছু থাকে বটে, কিন্তু সে ঠিক অতো স্পষ্ট ছবি নয়। বিশেষ আবেগ তাঁর মনকে যেন বিশেষ রূপ-গঠনের দিকে নিক্ষেপ করে। সেই বেগে তিনি বিশেষ শিল্পরূপের দিকে অগ্রসর হন। তারপর শাস্ত্রোক্ত রূপকল্পের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁকে নিশ্চয় কিছু-কিছু সংশোধন করে নিতে হয়। চতুর্দশপদীতে অনেক রকম মিল-বিন্যাস হতে পারে। তবে প্রথম আট চরণ আর শেষের ছয় চরণের বিভাগটা নিয়েই গঠনের বিশেষত্ব। সে বিশেষত্ব সাধারণতঃ সবাই মেনে চলেন। কিন্তু সেখানেও ব্যতিক্রম দুর্লভ নয়। বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' সেই ব্যতিক্রমের উদাহরণ। তাঁর মন যেন চৌপদীর ছাঁদে চল্‌বার পক্ষপাতী। তাঁর সনেটের ষষ্ঠক [Sestet] দেখে তাই মনে হয়। ষষ্ঠক অংশের প্রথম দুটি চরণ তিনি পৃথক মিল দিয়ে পৃথক ভাববন্ধন হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। 'সনেট'-রূপ তাঁর কেন ভালো লাগলো, তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন যে প্রৌঢ় বয়সে,—দ্বিতীয় যৌবনে পদার্পণ করে—

"আনিনু সংগ্রহ করে বিঘৎ প্রমাণ
ইতালির পিতলের ক্ষুদ্র কর্নেট
তিনটি চাবিতে যার খোলে রুদ্ধ প্রাণ।"

'সনেট'-এর মতো 'স্তবকাব্য', 'মহাকাব্য', ইত্যাদি আরো সব কাব্যরূপ

আছে যাদের গঠন সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা বিশেষ-বিশেষ বিধি জারি করেছেন। শিল্পীর মন সব বিধি খুঁটিয়ে মেনে চলতে পারে না; তবে, তাঁদেরও আদর্শের দিকে চোখ রেখে চলতে হয়। প্রাচীন কালে এই শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে বেশি ঝোঁক ছিল। প্রাচীন ক্ল্যাসিক রীতির এও অন্যতম বিশেষত্ব। কিন্তু পরের যুগে ফরাসী দার্শনিক রুশোর ধ্যান থেকে যখন এই শিক্ষা পাওয়া গেল যে, মানুষের মুক্ত ইচ্ছার মর্যাদা রাখাটাই মানুষের সর্বাধিক কর্তব্য, তখন থেকে সমাজ-জীবনেও যেমন আইন-অমান্য এবং আচার-অমান্য আন্দোলন শুরু হলো, শিল্পের রাজ্যেও তেমনি বিধিভঙ্গের প্রবলতা দেখা দিয়েছে। তৎসত্ত্বেও শিল্পীকে শিল্পের গূঢ়তর আভ্যন্তরীণ আইন মানতেই হয়। শিল্পের রূপ-গঠনের আসল আইনের রহস্য সেই স্তরেই নিহিত।

সাহিত্যের রূপগত, প্রকারগত, গঠনগত বিচিত্রতার কথা ভাব্তে-ভাবতে এইভাবে একরকম অধ্যাত্মিক ভাবনার সমুদ্রে গিয়ে পড়তে হয়। বোধ থেকেই প্রকাশের জন্ম। বোধের বৈচিত্র্য আছে বলেই প্রকাশের বিচিত্রতা দেখা দেয়। এই কথাটিই এ প্রসঙ্গের মূল কথা।

কবির বোধের মাপ অনুসারে তাঁর রচনার প্রকার, রূপ এবং গঠন নিয়ন্ত্রিত হয়। 'প্রকারের' মধ্যে 'রূপ',—'রূপে'র মধ্যেই গঠনের বিধিবৈচিত্র্য —এই পর্যায়ক্রমেই বিষয়টির ভাবনা সংগত। 'গীতিকাব্য' হলো সাহিত্যের বিশেষ এক 'প্রকার'; রবীন্দ্রনাথের 'জুতা-আবিষ্কার'-ও গীতিকবিতা, 'বসুন্ধরা'ও গীতিকবিতা; কিন্তু দুটির 'রূপ' ভিন্ন ভিন্ন—অর্থাৎ দুটির Form-এর পার্থক্য আছে। কোনো বিশেষ 'প্রকারে'র মধ্যে শ্রেণীগত 'রূপে'র সামান্যসূত্র একেবারে যে না ভাবা যেতে পারে, তা নয়। কিন্তু সাহিত্যের রসাস্বাদনের দিক থেকে রূপবিভাগের ভাবনার অভিমুখে অগ্রসর হলে প্রত্যেকটি শিল্পসৃষ্টির মধ্যে পৃথক রূপকল্প চোখে পড়ে। Lyric জাতীয় রচনার মধ্যে Ode একটি প্রজাতি। সে হলো নৈয়ায়িকের বিভাগ। কিন্তু বিভিন্ন Ode-এর আস্বাদনের দিক থেকে যিনি তার শ্রেণী-ভাবনার দিকে এগুতে চাইবেন, তাঁর কাছে শেলীর 'স্তবকাব্য' আর সুইনবার্নের 'স্তবকাব্য' এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সামগ্রী মনে হলেও শ্রেণীগত ঐক্য-আরোপ করে তিনি ঠিক তৃপ্তি পাবেন না। তাঁকে মানতেই হবে যে, সাহিত্যের 'প্রকার' বা Kind-এর ভাবনাটা যতো

স্পষ্ট,—প্রজাতি বা species-এর ভাবনা ঠিক ততো স্পষ্টও নয়, সংগতও নয়। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা যাকে বলেন infima species, আমরা ক্রমশঃ সেই চিন্তার দিকে গিয়ে পড়ি। তাতে সাধারণ বুদ্ধিমানদের বুদ্ধির সুবিধা হয়। কিন্তু সাহিত্য যে বোধ-বুদ্ধির সমন্বয়। স্বাদন ছাড়া সাহিত্যের বিচার চলেনা। শিল্পের রসবোধ থেকেই বোঝা যায় যে, প্রত্যেকটি রচনার আছে নিজস্ব 'রূপ'।

এইবার 'চিত্রে'র কথা।

অ্যারিষ্টট্‌ল বলে গেছেন যে, কবিতার সব চেয়ে বড়ো জিনিস হলো রূপক। 'রূপক' কথাটা অবশ্য অনুবাদের অনুবাদ। অ্যারিষ্টট্‌ল বলেছিলেন কবিদের 'metaphor'-এর ক্ষমতার কথা। আমাদের দেশেও কবিদের এ সামর্থ্যের কথা বিশেষভাবে ভাবা হয়েছে। অর্থালঙ্কারের আলোচনায় উপমা, রূপক প্রভৃতি সাদৃশ্যভিত্তির অলঙ্কার বিশ্লেষণের অন্ত খুঁজে পাওয়া দুর্ঘট!

সাহিত্য-শিল্পের 'প্রকার', 'রূপ' এবং 'গঠনের' প্রসঙ্গ পেরিয়ে এসে আর একবার পূর্বালোচিত উপমা, রূপকের প্রসঙ্গ মনে করা দরকার। ইংরেজিতে আঠারোর শতকে যখন পুরোনো গ্রীক আলোচকদের সাহিত্যতত্ত্বের সূত্র মিলিয়ে সাহিত্যসৃষ্টির কাজ চলছিল, তথনকার সাহিত্য-সমালোচকরা অলঙ্কার ব্যাপারটিকে নাকি সাহিত্যের নিতান্তই অঙ্গসজ্জা মনে করতেন বলে অভিযোগ শোনা যায়। সেকালের কথাসূত্রে একজন নামী কবি বলেছেন, কেকের ওপর যেমন চেরি ছিটিয়ে দেওয়া হয়, কবিতায় imagery বা চিত্র-শোভাও তেমনি! সেকালে এই ধারণাই বলবতী ছিল।

সাহিত্যের imagery সম্বন্ধে আজকাল বাংলাতেও অনেকেই অনেক কথা বলে থাকেন। ইংরেজির সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতার ফলে আমাদের সাহিত্য-সমালোচনার পরিভাষা ইংরেজির মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছে। আমরা imagery কথাটা হামেশা ব্যবহার করি। অতএব নির্দিষ্ট অর্থবোধের তাগিদেও কথাটির মানে বোঝা দরকার।

অ্যারিষ্টট্‌ল metaphor-এর মূল্য বুঝেছিলেন,—সেকথা বলা হয়েছে। আঠারোর শতকের শেষের আর উনিশের শতকের প্রথম দিকের ইংরেজি কবিতার কথাসূত্রে কোল্‌রিজ বলেছিলেন যে, সেকালের ইংরেজ কবিদের সব চেয়ে বেশি ঝোঁক ছিল চিত্ত-চমৎকারী image সৃষ্টির দিকে। বাংলায়

'চিত্রকল্প' কথাটি image-অর্থে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু imagery কি কেবলই 'চিত্র'? বাংলায় যাকে বলা হয় 'চিত্রকল্প', সে কি শুধু ছবি?—'কেবলি ছবি, শুধু পটে লিখা?' কথাটা গভীর কথা! এ আলোচনায় একটু বিস্তার দরকার। পূর্ববঙ্গগীতিকার 'কঙ্ক ও লীলা'র উপাখ্যান থেকে এই ছবিটি দেখা যেতে পারে—

"হাসিয়া খেলিয়া লীলার বাল্যকাল গেল।
সোনার যৈবন আসি অঙ্গে দেখা দিল ॥
শাউনিয়া নদী যেমন কূলে কূলে পানি।
অঙ্গে নাহি ধরে রূপ চম্পকবরণী ॥"

প্রথম-যৌবনবতী নারীর যে সৌন্দর্য কবির চৈতন্যে দাগ রেখে যায়, —এখানে ছবির আশ্রয়ে সেই দাগই আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু সে দাগটি কি কেবলি চোখে দেখবার জিনিস? শ্রাবণের ভরা নদীকে প্রধানতঃ চোখ দিয়েই পাই বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে মন কি অবগাহনের স্পর্শসুখ অনুমান করে নেয়না? 'চম্পকবরণী' কথাটা কি শুধু চোখেরই তৃপ্তির ব্যঞ্জক? ও-শব্দের মধ্যে দৃষ্টি-সুখের ঠিক নিচের স্তরেই কি খানিকটা আঘ্রাণের সুখ, খানিকটা কোমলতার ছোঁয়া লেগে নেই? এই জন্যেই 'চিত্রকল্প'-কে এক মিশ্র অনুভূতি, মিশ্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্যোতক বলা সংগত। জগতে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানুষের মন অবিরাম নানান্ সুখ-দুঃখ পেতে-পেতে পরিণত হচ্ছে। কোনো বিশেষ অভিজ্ঞতার ইন্দ্রিয়চেতনার মধ্যে দৃষ্টি, শ্রুতি, স্পর্শ, ঘ্রাণ ইত্যাদি বিবিধ বোধের গ্রন্থি ঘটে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। লীলা-মেয়েটির যৌবনশ্রী পূর্ব-বঙ্গের কবির মনে সেইরকম মিশ্রস্বাদের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল কোনোদিন। নদীমাতৃক পূর্ববঙ্গ কবির চোখের সামনে মেলে রেখেছিল নদীর দৃশ্য। সেই দৃশ্যের উপলব্ধি শুধু চোখের ব্যাপার নয়। ইন্দ্রিয়চেতনার বিচিত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন অনুষঙ্গ জড়িয়ে গিয়েছিল কবির মনোলোক। তারই ফলে ঐ image বা 'চিত্রকল্প' দেখা দিয়েছিল। এইটুকু বুঝে নিয়ে সূত্র তৈরি করা যেতে পারে।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তটি হলো সরল বা সহজ চিত্রকল্পের উদাহরণ। যে শব্দচিত্রের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধের স্বাদ ফুটে ওঠে, তারই নাম সাহিত্যের চিত্রকল্প। যেখানে বুদ্ধির বা যুক্তি-বিবেচনাদির সম্পর্ক-নিরপেক্ষ ভাবে চিত্রকল্প

তার স্বকীয় মহিমা পায়, সেখানে সহজ-চিত্রকল্প ঘটেছে বলতে হবে। যেখানে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের প্রাপ্তির সঙ্গে শিল্পীর ভাবনা-চিন্তার কাজ মিশে যায়,—অর্থাৎ শুধু আবেগ নয়, যেখানে বিচার-বিবেচনারও কাজ দেখা যায়, সেখানে হয় জটিল চিত্রকল্প। অতঃপর জটিল চিত্রকল্পের নমুনা দেখা যাক্। ঐ কঙ্ক ও লীলার উপাখ্যানের মধ্যেই লীলার আর একটি বর্ণনা আছে। সেখানে কবি বলেছেন—

"তার মধ্যে দন্ত লীলার নাহি যায় দেখা।
দুর্লভ মুকুতা যেন ঝিনুর মধ্যে ঢাকা।"

মুক্তার মতো দাঁত,—শুধু এইটুকু বল্‌লে সাদৃশ্যটা সরাসরি চোখ দিয়েই যেন দেখা যায়। কিন্তু ঝিনুকের মধ্যে মুক্তো থাকে, এ জ্ঞান আমাদের স্মৃতির অর্জন। চোখ ঝিনুকের খোলা ফাটিয়ে ভেতরের মুক্তোকে দেখতে পারে বটে, কিন্তু সে ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে ভিন্ন-ভিন্ন অভিজ্ঞতা এসে পড়বে। ঝিনুকের আবরণের ধারণা, আর, সেই আবরণের মধ্যে নিহিত দাঁতের মুক্তাবর্ণ বা মৌক্তিক দ্যুতি—এই দুই ধারণা একসঙ্গে পেতে হলে কবিকে একই সঙ্গে চোখ দিয়ে এবং স্মৃতি দিয়ে,—অর্থাৎ মনন দিয়ে দেখতে হচ্ছে। মনের এটুকু কাজে অবশ্য মনঃশক্তির তেমন কোনো ভার পড়ছে না। কিন্তু মাঝে-মাঝে সেরকম জটিলতর মনন থেকেও চিত্রকল্প জন্মগ্রহণ করে। 'বনবাণীর' 'বৃক্ষ-বন্দনা' থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিকল্পনার তৈরি এমনি একটি জটিল চিত্রকল্পের নমুনা তোলা হলো। 'বৃক্ষ'কে বন্দনা জানাতে গিয়ে কবি লিখেছিলেন—

"ওগো সূর্যরশ্মিপায়ী,
শত শত শতাব্দীর দিনধেনু দুহিয়া সদাই
যে তেজে ভরিলে মজ্জা মানবেরে তাই করি দান
করেছ জগৎজয়ী..."

এক-একটি দিন যেন এক-একটি ধেনু। গোদুগ্ধে মানুষের যেমন পুষ্টি হয়, দিনধেনুর সূর্যরশ্মিতে বৃক্ষের তেমনি পুষ্টি ঘটেছে,—শত শত শতাব্দীর সংখ্যাগণনার মধ্যে সৌর উত্তাপ এবং দ্যুতির অপরিমেয়তা সূচিত হয়েছে। কবির মন এখানে অনেকটা কাজ করেছে,—অনেক ভেবেছে। ভাবনার চিহ্ন থাকলেও ভাবনার ভার কিংবা বোঝা পিঠে নিয়ে ও ছবি আবির্ভূত হয়নি। 'চিত্রকল্পের' এই অলিখিত আইনটাই মান্য দরকার। যতো মননই

থাক্,—যতো বুদ্ধি বিবেচনাই ভেতরে-ভেতরে কাজ করুক্, প্রকাশ্য ছবিটা যখন পাওয়া গেল, তখন প্রধানতঃ সেটা হওয়া চাই ইন্দ্রিয়চেতনার উদ্বোধক।

এইবার কথা উঠতে পারে যে, নামটা তাহলে 'চিত্র' বা 'ছবি' হলেই তো চল্‌তো। 'চিত্রকল্প' কেন?

'চিত্রকল্প' নামটি এই কারণে বাঞ্ছনীয় যে ওতে চোখে দেখবার দৃশ্যের সংকেত তো আছেই, তার অতিরিক্ত আরো সব ইন্দ্রিয়বোধের বৈচিত্র্য রয়েছে। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। কোনো কোনো চিত্রকল্প আবার স্পর্শবোধ-প্রধান হতে পারে, তেমনি ধ্বনিবোধ-প্রধান চিত্রকল্প-ও সম্ভব। এবং বাইরের জগতের যে কোনো ছবির নাম 'চিত্রকল্প' নয়। 'স্বভাবোক্তি' আর 'চিত্রকল্প' এক জিনিস নয়। চিত্রকল্পের ব্যাখ্যাতা লিখেছেন—অন্তরাবেগ দিয়ে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বোধের সম্পর্ক স্থাপন করবার সামর্থ্যই তার বিশেষত্ব "insistence on the modifying and interrelating image by passion."।[২] এবং তিনি আরো বলেছেন যে, বাইরের জগতের নিখুঁৎ চিত্রণ ঘটলেই 'চিত্রকল্প' হয় না, সাহিত্যের চিত্রকল্প হলো তদতিরিক্ত আরো কিছু—"Something more than accurate reflection of an external reality."।[৩]

২। The Poetic Image—C. Day Lewis
৩। ঐ, পৃঃ ১৮

কবিতার ভাষা

কবিতার ভাষার কথা ভাবতে বসলে কোনো একটা ভূমিকা বা পূর্ব-ভাবনা থেকে যাত্রা শুরু করতে হয়। 'কবিতার ভাষা' বললে প্রথম পদটির সম্বন্ধবাচকতা মেনে নেওয়া হয়। ভাষার আশ্রয় ধরেই রচনার মধ্যে কাব্য-গুণ ধ্বনিত হয়ে থাকে। অতএব, বিশেষ ক্ষেত্রে ভাষার ঔচিত্যের কথা তুললে আগে সেই ক্ষেত্রটির স্বরূপ দেখা চাই। অর্থাৎ কবিতার নির্ভরযোগ্য একটা সংজ্ঞা দরকার। সেই সংজ্ঞা ধরেই কবিতার ভাষার কথা ভাবা যাবে। কিন্তু তার আগে বলে রাখা ভালো যে, একদিকে কবিতা এবং অন্যদিকে কবিতার শব্দ, ছন্দ, ভাষা, চিত্র ইত্যাদি উপাদানভেদের পৃথক চিন্তা বা দ্বৈততাবুদ্ধি কাব্যরসিকের গ্রাহ্য নয়। কবির বচন যখন কবিতা হয়ে ওঠে, তখন সে হয় অদ্বৈত সত্তা। মনে পড়ে, বিদ্বান কবি ডক্টর সুশীলকুমার দে দামোদর গুপ্তের একটি উক্তির চমৎকার অনুবাদ দিয়েছিলেন—

> "লক্ষ্য তাহার অলক্ষ্য মন, ধন্বী তবু সে নিপুণতর
> একেরে দুভাগ না করিয়া করে দুয়েরে এক সে ধনুর্ধর!"

কবির শক্তি সেই অতনুর সঙ্গে তুলনীয়। তারও লক্ষ্য সেই অলক্ষ্য মন। বুদ্ধির আলো দিয়ে তার উপায় সম্যক্ দেখা যাবে না। কবিতার মধ্যে কবিতার প্রক্রিয়া এবং সিদ্ধি একই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে থাকে।

বার্ডসার্থের দেওয়া সূত্রটি মেনে নিতে আপত্তি নেই। তিনি বলেছেন —"Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings recollected in tranquillity"। অর্থাৎ—শান্ত অবস্থায় পুনর্মননের ফলে বলবতী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতার নাম কবিতা। 'অনুভূতি' [feeling] কথাটার ওপর মনস্তত্ত্ববিদ্যার তর্ক-বিতর্ক নিক্ষেপ করে বিষয়টি জটিল করবার প্রয়োজন নেই। অনুভূতির মধ্যে কবির জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার-বিতর্কের ক্ষমতা, জীবনের সকল অভিজ্ঞতার বিচিত্র স্বাদ, ইত্যাদি সব কিছুই নিহিত আছে ধরে নেওয়া যাক্। আসল ধর্তব্য কথাটা এই যে, বলবতী অনুভূতির যোগ্য ভাষা থাকা দরকার। সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভাষার জগতে বাস করেই কবির অনুভূতি জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু

নবজাত অনুভূতির বলবত্তার চিহ্ন ধরা পড়ে তার ভাষা-সৃষ্টির বিশেষত্বের মধ্য দিয়ে। সাধারণ ভাষা আর সাহিত্যের ভাষা কখনোই এক জিনিস নয়। কবিরা কী করেন, রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে বলেছেন—

"বোধে যার চিহ্ন পড়ে—
ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা।"

—এই সৃষ্টিলীলা ব্যাপারটি কিন্তু কবির ভাষাজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। তার মানে এ নয় যে, ভালো কবিতা লিখতে হলে সুনীতিকুমার কিংবা মধুসূদন হতে হবে। গ্রাম্য কবিরা ভাষার ব্যাকরণ উপেক্ষা করেছেন,—পণ্ডিত কবিরাও পিছিয়ে নেই। 'আর্ষ প্রয়োগ' তো পাঠকের মার্জনাময় মনের দাক্ষিণ্যের চিহ্ন নয়—সে হলো কবির বিশেষ অধিকারের স্বীকৃতি। তেমন আবেগ লাগ্‌লে ব্যাকরণ কোথায় ভেসে যায়! তখন তর্ক নয়,—স্বীকৃতিই স্বীকার্য।

বাংলা কবিতার ভাষা সম্বন্ধে গত শ'খানেক বছরের মধ্যে কবিরা অনেক ভেবেছেন। আঠারোর শতকে ভারতচন্দ্র লিখেছিলেন—

"না রবে প্রসাদগুণ, না হবে রসাল
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল!"

রবীন্দ্রনাথের আগে ভাষার বিষয়ে মধুসূদনও অনেক মাথা ঘামিয়েছিলেন। কিন্তু অল্প আয়ুর প্রাণী আমরা। একটি জীবনসীমার মধ্যে মাথা না হয় খুবই ঘামানো গেল। কিন্তু মাথার কর্মফল মনের মধ্যে থিতোনো চাই তো! বার্ডসার্থের সূত্রে দেখা গেছে স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতার তত্ত্ব। ভাষাটাও স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া দরকার। মধুসূদনের কাব্যে প্রশংসা করবার মতো অনেক গুণ আছে। কিন্তু তাঁর ভাষাটা বড়োই চেষ্টালব্ধ। তাঁর প্রয়াসের অর্জনে যেন সত্তার সহজ অধিকারের স্বতঃসিদ্ধতা নেই। মিল্টনের কথা মনে পড়ে। কবিতার ভাষা কেমন হবে?—না, 'music married to immortal verse.'। উক্তিটির মধ্যে স্পষ্ট কোনো রকম সূত্রনির্দেশ নেই বটে। বরং ভাষার সংগীতধর্মের ওপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। তবু কিছু খবর তো ওরই মধ্যে নিহিত আছে। শুধু সংগীতধর্ম নয়, ভাষার সকল ধর্মই সহজ হয়ে ফোটা চাই। পরিণয়পাশে আবদ্ধ হওয়া চাই,—

প্রয়াসপাশে নয়! 'সাহিত্য' কথাটির মধ্যে যে সহিতত্ব বা সম্পর্ক-স্বীকারের মর্মানুভূতি আছে, সেই আদর্শ মনে রেখে সার্থক কবিকে তাঁর সানন্দ কর্তব্য পালন করতে হয়। বার্ডসার্থ কাম্বার্ল্যাণ্ড অঞ্চলের সাধারণ মানুষের চলতি ভাষাকে কিঞ্চিৎ শোধিত করে নিয়ে তাঁর কবিতায় প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। সেও একরকম মাথা-ঘামানো, সন্দেহ নেই। এখানে তাঁর বিশেষ ভাষাবাদের আলোচনা নয়, শুধু তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্যটির কথাই স্মরণীয়। তিনি বলেছিলেন—

> "I have wished to keep the reader in the company of flesh and blood, persuaded that by so doing I shall interest him."

—অর্থাৎ, 'পাঠককে রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গ দেবার অভিপ্রায় নিয়েই আমি এসব লিখেছি এবং আমার মনে হয়েছে যে পাঠক এতে সুখী হবেন।'

বার্ডসার্থ বিশ্বাস করতেন যে, কবিতার সঙ্গে গদ্যের ভাষাগত কোনো মৌল বা আবশ্যিক [essential] কোনো পার্থক্য নেই—

> "Poetry sheds no tears 'such as Angels weep', but natural and human tears ; she can boast of no celestial Ichor that distinguishes her vital juices from those of prose ; the same human blood circulates through the veins of them both."

অর্থাৎ—'কবিতার কান্না কোনো দেবদূতের অশ্রুর মতো মর্ত্য সম্পর্কের বাইরের জিনিস নয়,—সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চোখের জলেই তার অশ্রুর মাধুর্য; গদ্যের প্রাণবস্তুর বিশেষত্ব যাতে, তা থেকে পৃথক অন্য কোনো স্বর্গীয় অমৃতরসেই তার বিশেষ অধিকার,—একথা ভাবা ঠিক নয়। উভয়ের ধমনীতেই মানব-জীবনরসের অভিন্ন রক্তস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে।'

কোল্‌রিজ তাঁর Biographia Literaria বইখানির মধ্যে বার্ডসার্থের এই ভাষা-নীতির সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, সব রকম কবিতার পক্ষে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ভাষা শোধন করে ব্যবহার করবার আদর্শটা উপযোগী

১। **Preface to Lyrical Ballads.**

নয়,—দ্বিতীয়তঃ বিশেষ-বিশেষ কাব্যপ্রকারেও কতকগুলি সীমায় দায়িত্ব মেনে নিয়েই ও রকম ভাষা ব্যবহার করা সম্ভব;—তৃতীয়তঃ সাধারণতঃ ও আইন ক্ষতিকর বলেই নিশ্চিত ধারণা হয়। আর—

> "..A rustic's language, purified from all provincialism and grossness, and so far reconstructed as to be made consistent with the rules of grammar—[which are in essence no other than the laws of universal logic, applied to psychological materials]—will not differ from the language of any other man of common sense, however learned or refined he may be, except as far as the notions, which the rustic hae to convey, are fewer and more indiscriminate"

অর্থাৎ—'প্রাদেশিকতা এবং অশিষ্টতা ছেঁকে বাদ দিয়ে ব্যাকরণের আইন-অনুসারী করে নিলে—[মানসিক উপাদানগুলির ওপর সার্বভৌম বা সর্বজনীন ন্যায়বুদ্ধির প্রয়োগেই তো ব্যাকরণের বিধিনিষেধের জন্ম হয়েছে] —গ্রামীণ মানুষের ভাষার সঙ্গে সাধারণবোধ-সম্পন্ন যে-কোনো মানুষের ভাষার আর কোনো পার্থক্য থাকে না,—তা তিনি যতোই বিদ্বান বা রুচিবান হোন্ না কেন, কেবল এইটুকু পার্থক্য থাকবে যে, গ্রাম্যজনের বলবার কথাও অপেক্ষাকৃত কম এবং তাদের রীতিও অপেক্ষাকৃত অবিন্যস্ত বা অসংযত।'

বার্ডসার্থের 'গ্রামীণ' ভাষার বিরুদ্ধে কোল্‌রিজের আপত্তির একটি বড়ো কারণ এই ছিল যে, শিক্ষা ছাড়া ভাষার মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করা অসম্ভব গ্রামের অশিক্ষিত মানুষের পক্ষে ভাষার মধ্যে শক্তি সঞ্চার করা অসম্ভব কারণ, সাধারণ মাটির মানুষ নিজের মনের রহস্য বা ভাবনা-চিন্তার বিস্ময়কর ব্যাপার তেমন ভাবে ভাববার তাগিদই বোধ করেনা। কোল্‌রিজ বলেছিলেন—

> The best part of human language, properly so called, is derived from reflection on the acts of the mind itself. It is formed by a voluntary

appropriation of fixed symbols to internal acts, to processes and results of imagination, the greater part of which have no place in the consciousness of uneducated men; though in civilized society, by imitation and passive remembrance of what they hear from their religious instructors and other superiors, the most uneducated share in the harvest which they niether sowed nor reaped."

অর্থাৎ মানুষের ভাষার মধ্যে যথার্থ যা শ্রেষ্ঠ, সে হলো, মনের মনক্রিয়ারই অনুধ্যানের ফল। মনের ভেতরে যা ঘটে থাকে, বাইরের নির্দিষ্ট ভাষাকে সেইসব অন্তর্ঘটনার,—কল্পনার প্রক্রিয়ার এবং প্রাপ্তির প্রতীক হিসেবে মেনে নেওয়া, সে বিশেষত্বের বেশির ভাগই অশিক্ষিত মানুষের ধারণার বহির্ভূত ব্যাপার; তবে সভ্য সমাজের মধ্যে, গুরু বা পুরোহিত বা প্রবীণদের কাছে তারা যা শোনে, তা তাদের নিজেদের প্রয়াস ব্যতিরেকেই কতকটা অনুকরণের মধ্য দিয়ে, কতকটা পড়ে পাওয়া স্মৃতির সাহায্যে তারা পেয়ে থাকে।

এই ভাবে বার্ডসার্থের প্রিয় ভাষা-রীতির প্রতিবাদ করেছিলেন কোল্‌রিজ।

কবিতার ইতিহাসে দেশে দেশে,—যুগে যুগে, এই রকম ভাবনা আর প্রতি-ভাবনার ঢেউ উঠে থাকে। দেশে-দেশে এবং কালে-কালে প্রবাহিত এই ভাবনা-ধারার আঞ্চলিক বা সাময়িক প্রসঙ্গগুলি এড়িয়ে, কবিদের এই জাতীয় উদ্বেগের আসল কারণটা দেখতে হবে। আঠারোর শতকে ড্রাইডেন প্রভৃতি কবির রচনায় যে কৃত্রিম কাব্যিক শব্দ [poetic diction] সন্ধানের প্রয়াস দেখা গিয়েছিল, বার্ডসার্থের ভাষা-নীতির সেও অন্যতম হেতু। স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা, আর, বলবতী অনুভূতি—এই অন্তর-সত্যের চেয়ে কবিতার ভাষা-ব্যাপারের অন্য কোনো প্রবলতর কারণ নেই। কবিতার ভাষা সম্বন্ধে কবি বা সমালোচকের এতদতিরিক্ত কোনোরকম সূত্রঘোষণার সত্যিই বিশেষ কোনো দাম নেই। শুধু ভাষার প্রসঙ্গেই নয়,—সৃষ্টির ব্যাপারে সূত্রের ব্যর্থতা এবং ঘোষণার নিষ্ফলতা ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে;

একজন সমালোচক কথাটি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর কথা তুলে দিলাম—

> "Apart from our contemporaries only twice in England has poetry been written to a programme; by Wordsworth and Coleridge in Lyrical Ballads and by Rossetti in his application to poetry of the manifesto of the 'Pre-Raphaelite Brotherhood.' The most distinctive verse of both poets denied the principles which they set out to support."[৪]

উনিশের শতকের মধুসূদন প্রভৃতি কবিদের পরে এসে, ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালী কবির ভাষার কৃত্রিমতা দেখে রবীন্দ্রনাথও বার্ডসার্থের মতো 'খাঁটি বাংলা'-র পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ সাধক-জীবনে ভাষার অনেক বিচিত্রতাই তিনি ঘটিয়ে গেছেন। তাঁর 'কল্পনা'-তে দেখা যায় সংস্কৃত-ঘেঁষা ভাষা,—'ক্ষণিকা'তে আছে হসন্ত-বহুল চলিত ভাষার ঝোঁক। পরের দিকেও একই কালের ভিন্ন-ভিন্ন লেখায় চলিত এবং শিল্পীকৃত, দুরকম ভাষারই নমুনা আছে। তবু প্রথম থেকেই তিনি জ্ঞানতঃ ছিলেন চলিত ভাষারই পক্ষপাতী। শুধু চলিত বা চল্‌তি নয়, তিনি চেয়েছিলেন খাঁটি বাংলা ভাষা। আমার মনে হয়, এই সূত্রটি অবলম্বন করে এগিয়ে গেলে সন্ধানী গবেষক রবীন্দ্রনাথের এই মতের মধ্যে মধুসূদনের ভাষারীতির প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ দেখ্‌তে পাবেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে শ্রদ্ধা করতেন। ঈশ্বর গুপ্তের খাঁটি বাংলার প্রশংসা করে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব লেগেছিল হয়তো।

বাংলার চলিত ভাষা ও রবীন্দ্রনাথ

কেম্ব্রিজের বাংলা-অধ্যাপক জে-ডি-অ্যাণ্ডার্সনকে লেখা একখানি চিঠির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—"বাংলার হসন্ত-বর্জিত সাধু ভাষাটা বাবুদের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোটা গোলগাল; চর্বির স্তরে তার চেহারাটা একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে এবং চিক্কণতা যতই থাক্ তার জোর অতি অল্পই।

[৪] Tradition and Romanticism by B. Ifor Evans [1940] p. 5.

আমাদের ভাষায় বিশেষ যে জীবিত সুরটি সচরাচর 'অসাধু বাংলা'-নামে অভিহিত হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ সে সুরের মধ্যে বিশিষ্ট এক সুরধর্মিতা লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর নিজের কথা—"সে আউলের মুখে, বাউলের মুখে, ভক্ত কবিদের গানে, মেয়েদের ছড়ায় বাংলাদেশের চিত্তটাকে একেবারে শ্যামল করে ছেয়ে রয়েছে।" সেই বিশেষ আবেদনের কথা স্বীকার করে তিনি আরো জানিয়েছিলেন—"আমার শেষ বয়সের কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার সুরটাকে ব্যবহারে লাগাবার চেষ্টা করেছি। কেননা দেখেছি চলতি ভাষাটাই স্রোতের জলের মতো চলে—তার নিজের একটি কলধ্বনি আছে।"

'পুরবী'র পরেই তিনি যে রাতারাতি এই চলিত বা চল্‌তি সুরের দিকে ঝুঁকেছিলেন, সেকথা ঠিক নয়। শতাব্দীর শুরুতেই তাঁর 'ক্ষণিকা' ছাপা হয়েছিল। 'ক্ষণিকা'-র মধ্যে চল্‌তি ভাষার দিকে তাঁর পক্ষপাতিত্বের নমুনা আছে। তারও আগে 'সাধনা'তে এবং 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় তাঁর 'ছেলেভুলানো ছড়া' ইত্যাদি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। 'লোকসাহিত্যে'র ভূমিকায় তিনি বলেছিলেন যে, ছড়াগুলির মধ্যে 'বাল্যরস'-এর আবেদনই তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। আর, ছড়ার ভাষা সম্বন্ধে 'লোকসাহিত্যে' তাঁর এই মন্তব্য ছিল—"ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা লক্ষিত হইবে।... ইহারা সজীব, ইহারা সচল; দেশকালপাত্রবিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে।"

সে হলো ১৩০১-২ সালের কথা। গ্রন্থাকারে 'লোকসাহিত্য' অবশ্য আরো পরে ছাপা হয়েছে—১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে। 'লোকসাহিত্যের' অন্তর্ভুক্ত 'কবিসঙ্গীত' প্রবন্ধে ভাষার বিশুদ্ধি এবং বিষয়ের সঙ্গে ভাষার সমন্বয়-সাধন সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা হয়েছিল। তাতে ঠিক 'চল্‌তি' এবং 'সাহিত্যিক' ভেদে সাহিত্যের ভাষার কোনোরকম শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা না থাক্‌লেও এই সূত্রে স্মরণীয় বিশেষ একটি ইশারা আছে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

> "...সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হউক না কেন, তাহাদের আনন্দ বিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য, এবং

আবশ্যকসাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে।...এই সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার, এবং সর্ববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে যে, অবসর বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইব তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"

অতঃপর, 'লোকসাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত আর একটি প্রবন্ধে গ্রাম্য-সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয়সূত্রে তিনি লিখেছিলেন—

"গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না থাক্ [অসংখ্য প্রাণীর জীবনসুখসম্ভোগের] আনন্দের সুর আছে।"

এইসব উক্তি থেকে একথা সহজেই বোঝা যায় যে, 'ক্ষণিকা' [১৯০০] প্রকাশিত হবার অনেক আগে থেকেই কবিতার মধ্যে চল্‌তি-ভাষা প্রয়োগের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত নিয়ে তিনি সাহিত্যের একাধিক তত্ত্ব এবং অভিমুখিতার কথা চিন্তা করেছিলেন।

আরো কয়েক বছর আগে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের 'ভারতী'তে [ভাদ্র, ১২৮৯] 'মেঘনাদবধকাব্য' সম্পর্কে তিনি যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন তাতে চল্‌তি-ভাষা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য ছিলো না বটে,—মধুসূদনের বৈদগ্ধ্যময় ভাষা সে-বয়সে তাঁর যে আদৌ ভালো লাগেনি, সেইকথাই যথাসম্ভব তীব্রভাবে বল্‌তে চেয়ে তিনি লিখেছিলেন—"ভাষাকে কৃত্রিম ও দুরূহ করিবার জন্য যত প্রকার পরিশ্রম করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত, তাহা তিনি করিয়াছেন।" এই মন্তব্যের পরে আরো প্রখর মন্তব্য ছিল। কিন্তু পরে 'জীবনস্মৃতি'র [১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ] মধ্যে এই কৈশোরক সমালোচনার জন্য তাঁর অনুতাপের সীমা ছিল না। সেই কারণেই সেসব কথা উহ্য থাক্। তাছাড়া বর্তমান প্রসঙ্গে সেকথার বিশেষ প্রয়োজনও নেই। 'সমালোচনা' বইখানির [১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ] অন্তর্ভুক্ত 'সঙ্গীত ও কবিতা' প্রবন্ধটিতেই বরং এখানে উল্লেখ করবার মতো ভাষার বিষয়ে দরকারী কথা আছে। সাধারণ প্রয়োজনে ব্যবহৃত যুক্তিমূলক গদ্যের ভাষা একদিকে,—এবং ভাবোদ্রেকের পক্ষে উপযোগী হৃদয়ের ভাষা কবিতা

অন্যদিকে ; মানবসংস্কারের এই দুই ভাবান্তরের কথা উত্থাপন করে তিনি এই প্রবন্ধে লিখেছিলেন—

> "অনুভাবের ভাষা ছন্দোবদ্ধ। পূর্ণিমার সমুদ্রের মত তালে তালে তাহার হৃদয়ের উত্থান-পতন হইতে থাকে, তালে তালে তাহার ঘন-ঘন নিশ্বাস পড়িতে থাকে।...সরল যুক্তির এমন তাল নাই, আবেগের দীর্ঘনিশ্বাস পদে-পদে তাহাকে বাধা দেয় না।... ...এই নিমিত্ত চূড়ান্ত যুক্তির ভাষা গদ্য, চূড়ান্ত অনুভাবের ভাষা পদ্য।"

অতঃপর কবিতার সঙ্গে সংগীতের শিল্পভেদ সম্বন্ধে ঐ প্রবন্ধে বলা হয়েছিল—

> "কবিতায় যেমন বাছা বাছা সুন্দর কথায় ভাব প্রকাশ করে সঙ্গীতেও তেমনি বাছা বাছা সুন্দর সুরে ভাব প্রকাশ করে। যুক্তির ভাষায় প্রচলিত কথোপকথনের সুর ব্যতীত আর কিছু আবশ্যক করে না। কিন্তু যুক্তির অতীত আবেগের ভাষায় সঙ্গীতের সুর আবশ্যক করে।"

এই বলে তিনি ম্যাথ্যু আর্নল্ডের একটি কবিতার উল্লেখ করেছিলেন। ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সেই কবিতার মর্মকথা এই যে, 'চিত্রে' প্রকৃতির এক মুহূর্তের অভিব্যক্তিটুকু ধরা যায়,—'সংগীতে' মনের ভাবশৃঙ্খলের একটিমাত্র ভাব বেছে নিয়ে তাতেই অবস্থান করতে হয়,—"কিন্তু কবিতার কাজ আরো বিস্তৃত।" কবিকে ভাবের উত্থানলগ্ন থেকে শুরু করে ভাবের সাগরসঙ্গম অবধি পরিবর্তমান অবস্থা প্রকাশ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ এ-প্রবন্ধে ভাষার নির্বাচন-তত্ত্বটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে প্রবন্ধের মূল প্রস্তাবের ভাবনাতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সংগীত এবং কবিতা এই দুটি-ই যে অভিন্ন উদ্দেশ্যের পৃথক দুই বাহন মাত্র, সেই সিদ্ধান্ত প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই লেখাটি শেষ হয়েছে।

'সমালোচনা'-বইখানির অনেক প্রবন্ধেই কবিতার কথা উঠেছিল। কিন্তু ভাষার স্তরভেদ সম্বন্ধে উল্লেখ বা আলোচনা অল্প কয়েকটিতেই দেখা যায়। 'বাউলের গান' প্রবন্ধটি এই জাতের রচনা। ১২৯০ সালের বৈশাখের

'ভারতী'তে এ লেখাটি প্রথম ছাপা হয়—অর্থাৎ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে। সেকালের লেখকদের অনুসৃত বাংলা ভাষারীতি সম্বন্ধে তিনি এই প্রবন্ধে কিঞ্চিৎ দুঃখপ্রকাশ করে,—সংস্কৃতবাগীশ এবং ইংরেজিনবীশ, এই দুই শ্রেণীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাঙ্গালা নাই আর ইংরেজি ব্যাকরণেও বাংলা নাই বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালীদের হৃদয়ের মধ্যে আছে।"

১৮৯৩ সালের এই লিখিত স্বীকারোক্তিটি নানা কারণে আমাদের কৌতূহল উৎপাদন করে। খাঁটি বাংলা ভাষার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হিসেবে বাউল গানের কথাই তিনি বলেছিলেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য এই ছিল যে, "ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না।" দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি জানিয়েছিলেন যে Force of Gravitation-কে ভারাকর্ষণ শক্তি বল্‌লে কিছু ক্ষতি হয় না, কারণ, সে একটি জ্ঞানের বিষয়; অপর পক্ষে, "ইংরাজিতে Liberty ও Freedom শব্দে যে ভাবটি মনে আসে, বাঙ্গালায় স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য শব্দে ঠিক সে ভাবটি আসে না কোথায় একটুখানি তফাৎ পড়ে।" "Free as mountain air"-এর বঙ্গানুবাদ হিসেবে "পর্বতের বাতাসের মত স্বাধীন" এই নমুনাটি বিশেষ উপযুক্ত নয়। ইংরেজিওয়ালারা দেশের সর্বসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধি নন। তাঁরা ইংরেজির অনুবাদ পরিবেষণ করে তাঁদের নিজেদের সমধর্মীদের কাছে তারিফ পেলেও যথার্থ ভাবানুবাদের ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারেননি বলেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি বলেছিলেন—

> "অতএব বাঙ্গালা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

"সংগীত-সংগ্রহে" এই খাঁটি বাংলার নমুনা পেয়ে তিনি খুশি হয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে কিছু অনুযোগেরও কারণ দেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

> "প্রকাশকের সহিত এক বিষয়ে কেবল আমাদের ঝগড়া আছে। তিনি ব্রহ্মসংগীত ও আধুনিক ইংরেজি রচনাওয়ালাদিগের রচনাকে ইহার মধ্যে স্থান দিলেন কেন?"

∴

বাংলা ছন্দের শ্রেণী ও পরিভাষা

বাংলা ছন্দের বিষয়ে এ পর্যন্ত এই বইগুলি প্রকাশিত হয়েছে—'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র'—অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় [১৩৩৯]; 'ছন্দ'—রবীন্দ্রনাথ [১৩৪৩]; 'ছান্দসিকী'—দিলীপকুমার রায় [১৩৪৭]; 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' —প্রবোধচন্দ্র সেন [১৩৫২]; 'বাংলা কবিতার ছন্দ'—মোহিতলাল মজুমদার [১৩৫২]; 'ছন্দোবিজ্ঞান'—তারাপদ ভট্টাচার্য [১৩৫৫]; 'বাংলা ছন্দ'—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য [১৩৬১]। এ ছাড়া অধ্যাপকদের মধ্যে শ্যামাপদ চক্রবর্তী, প্রবীণ কবিদের মধ্যে কালিদাস রায় এবং আরো কেউ-কেউ তাঁদের ব্যাকরণ প্রভৃতি বইয়ের মধ্যে ছন্দ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর আলোচনা করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু এবং অজিত দত্তেরও কয়েকটি লেখা আছে। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দ সরস্বতী'ই বাংলায় আমাদের একালের ছন্দ-শাস্ত্র সম্বন্ধে অনুশীলনের কবি-রচিত দিগ্দর্শনী। ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসের 'ভারতী'তে সে লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের পরে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক আলোচকদের মধ্যে কালানুক্রমিক দ্বিতীয় নামটি প্রবোধচন্দ্র সেনের। ১৩২৮ সালের ফাল্গুনে বাংলা ছন্দ সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধ লেখেন সেটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৩২৯-৩০ সালে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। অমূল্যধনের বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় সেই ঘটনার বছর দশেক পরে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি জানিয়েছিলেন—

> "শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন কয়েকটি প্রবন্ধে ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি লেখকগণের মতানুযায়ী কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বাংলা ছন্দের বিভাগ করিয়া তাহাদের লক্ষণ নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মত ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের দিক দিয়া বিচার করিলে যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয় না।"

ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে তিনি আরো জানিয়েছিলেন—

> "বিজ্ঞানসম্মত, প্রণালীবদ্ধভাবে বাংলা ছন্দের পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ রচনার বোধ হয় এই প্রথম প্রয়াস।"

অমূল্যধন-প্রবোধচন্দ্রের মধ্যে বাংলা ছন্দের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা কে আগে শুরু করেছিলেন, সে বিষয়ে কৌতূহল বোধ করা স্বাভাবিক। মোহিতলালের 'বাংলা কবিতার ছন্দ' বইখানির ভূমিকা থেকে এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন—

> "একদা 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের কয়েকটি প্রবন্ধ আমার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিয়াছিল; ঐ প্রবন্ধগুলিতে একটা বাংলা 'Prosody' রচনার উত্তম লক্ষ্য করিয়াছিলাম, এবং তাহা আমাকে আশান্বিত করিয়াছিল। পরে সেন মহাশয় যে ভাবে ছন্দ পরিচয় ত্যাগ করিয়া ছন্দতত্ত্বের গহনে যাত্রা সুরু করিলেন, এবং "actual sounds" হইতেই বাংলা ছন্দের একটা অদ্বৈত তত্ত্ব আবিষ্কার মানসে যেরূপ অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন, তাহাতে সে আশা অচিরে ত্যাগ করিতে হইল; অথচ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির সহিত রসজ্ঞান একমাত্র তাঁহার মধ্যেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম।"

ঐতিহাসিক কালক্রমে কে আগে, কে পরে, সে বিষয়ে সমকালীন সহত্রতীদের সাক্ষ্য-অনুমোদন-মীমাংসার চুলচেরা বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। বিলম্ব পরিহার করে বাংলা ছন্দের মূল কথার দিকে এগিয়ে যাওয়াই সংগত। তার আগে রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বইখানির অতি সংক্ষিপ্ত 'বিজ্ঞপ্তি'টকু দেখে নিলে এতদ্বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র এবং অমূল্যধন উভয়েরই প্রাবীণ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সশ্রদ্ধ অনুমোদন পেয়ে অবান্তর বাদ-প্রতিবাদের অশান্তি দূর হবে।

পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির 'কাব্যনির্ণয়ে' ছন্দের এই সংজ্ঞা আছে—

> "যে পদকদম্ব কতিপয় পরিমিত অক্ষরে সমৃদ্ধ ও যাহা শ্রবণ মাত্র শ্রবণের ও মনের প্রীতি বা আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে ছন্দ [verse] বা পদ্য বলে।"

সুনীতিকুমারের 'ভাষাপ্রকাশ বাংলা ব্যাকরণে' ছন্দের এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

> "বাক্যস্থিত [অথবা বাক্যাংশস্থিত] পদগুলিকে যেভাবে সাজাইলে বাক্যটি শ্রুতিমধুর হয় ও তাহার মধ্যে একটা কালগত ও

ধ্বনিগত সুষমা উপলব্ধ হয়, পদ সাজাইবার সেই পদ্ধতিকে ছন্দ বলে। পদগুলির অবস্থান এমনভাবে হওয়া চাই, যাহাতে ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতির কোনও পরিবর্তন না হয় এবং রচনাটির মধ্যে একটি সহজ লক্ষণীয় এবং সুসঙ্গত পরিপাটি বা আদর্শ [pattern] দেখিতে পাওয়া যায়।"

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' বইখানির মধ্যে আরো অল্পকথায় ছন্দের সূত্র দেওয়া হয়েছে—"যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয় তাহাকে ছন্দ বলে।"

অমূল্যধন আরো বলেছেন—"যদি ভাষার স্বাভাবিক উচ্চারণপদ্ধতি অব্যাহত রাখিয়া বিভিন্ন বাক্যাংশ কোন সুস্পষ্ট সুন্দর আদর্শ [pattern] অনুসারে যোজনা করা হয় তবে সেখানে ছন্দঃ আছে বলা যাইতে পারে।"

শ্যামাপদ চক্রবর্তী লিখেছেন—"যে পরিমিত পদবিন্যাসের ফলে বাক্যে একটি নৃত্যপর সঙ্গীতমধুর তরঙ্গময় প্রবাহের সৃষ্টি হয়, তাহার নাম ছন্দ।"

অনর্থক সূত্রের দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই। অতঃপর ছন্দের এই সংজ্ঞাটির ওপর নির্ভর করা যাবে—**কবির অভিপ্রায় অনুসারে শ্রুতিমাধুর্য ও রস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে রচনাবিশেষে পদবিন্যাসের যে সুশৃঙ্খল আদর্শ দেখা দেয়, তারই নাম ছন্দ।**

বাংলায় কখনো স্পন্দ বা rhythm অর্থে,—কখনো বা গদ্য এবং পদ্যের পার্থক্য প্রসঙ্গে বিশেষভাবে পদ্য-প্রকৃতিরই নির্দেশক হিসেবে,—আবার কখনো পদবিন্যাসের কোনো রীতি বোঝাতে [যেমন পয়ার ছন্দ, গদ্যছন্দ, পদ্যছন্দ,] 'ছন্দ' কথাটির ব্যবহার হয়ে থাকে।

ছন্দের উদ্দেশ্য কি ? এই প্রশ্নই ছন্দোজিজ্ঞাসার প্রথম প্রশ্ন। রবীন্দ্রনাথ 'অতি সহজ কথায়' জবাব দিয়েছেন—"কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।" সেতারের বাঁধা তার থেকে সুর যেমন ছাড়া পায়,—তীরকে দূরে নিক্ষেপ করবার জন্যেই যেমন ধনুকের ছিলে বাঁধা হয়, কথাকে কবির অভিপ্রেত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবার জন্যেই তেমনি ছন্দের প্রয়োজন। তিনি পুনরপি বলেছেন—"ছন্দের বাহনযোগে কথা কেবল যে দ্রুত আমাদের চিত্তে প্রবেশ করে, তা নয় ; তার স্পন্দনে নিজের স্পন্দন যোগ করে দেয়।"

তারপর দ্বিতীয় প্রশ্ন জাগে—বাংলা ছন্দের মূল ভিত্তি কি? অমূল্যধন বলেছেন—"ছন্দের মূল ভিত্তি একটা ঐক্য। সেই ঐক্যের পরিচয় আমরা পাই পর্বের ব্যবহারে"।

অতঃপর জিজ্ঞাসা ওঠে—**পর্ব** কি? প্রবোধচন্দ্র জানিয়েছেন—"ছন্দের রীতি বা প্রকৃতিই গঠিত ও নির্ণীত হয় পর্বের প্রকৃতি অর্থাৎ তার গঠন প্রণালীর দ্বারা। সুতরাং বলতে হয়, পর্ব বাংলা ছন্দের ভিত্তি। সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে পর্ব শব্দের ব্যবহার নেই, আছে তৎস্থলবর্তী 'গণ' শব্দ। বাংলার সব ছন্দই আসলে গণবৃত্ত।" ১

কিন্তু পর্বের আসল পরিচয় জানতে হলে আগে আর একটি শব্দের মানে জেনে নেওয়া দরকার। অমূল্যধন বলেছেন—"এক যতি [কিম্বা চরণের আদি] হইতে পরবর্তী যতি পর্যন্ত চরণাংশকে বলা হয় পর্ব।"

'ছন্দোমঞ্জরী'তে 'যতি' [pause] শব্দটির মানে দেওয়া হয়েছে—'যতির্জিহ্বেষ্টবিশ্রামস্থানং'। অর্থাৎ জিহ্বার ইষ্ট বা অভিপ্রেত বিশ্রামস্থানকে 'যতি' বলা হয়। প্রবোধচন্দ্র লিখেছেন—"বস্তুতঃ যতির দ্বারা পদ্যের প্রবাহ বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত হয় বলেই তার অপর নাম বিচ্ছেদ বা ছেদ। এই ছেদ বা যতি দ্বিবিধ—ছন্দের প্রয়োজনগত এবং ভাবের প্রয়োজনগত। ছন্দোগত যতিকে বলা যায় ছন্দোযতি [metrical pause] এবং ভাবগত যতিকে বলতে পারি ভাবযতি [sense pause]।"

অমূল্যধন কিন্তু কেবল ছন্দোযতি বোঝাতেই 'যতি' শব্দটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র যাকে 'ভাবযতি' বলেন, অমূল্যধনের বইয়ে সে-কথার বিশেষ পরিভাষা হলো 'ছেদ'। তাঁর দেওয়া দুটি সংজ্ঞা মনে রাখা দরকার। সে দুটি পর-পর এখানে তুলে দেওয়া হলো—

ছেদ—"কথা বলার সময় আমরা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারি না; ফুসফুসের বাতাস কমিয়া গেলেই ফুসফুসের সঙ্কোচন হয়, এবং শারীরিক সামর্থ্য অনুসারে সেই সঙ্কোচের জন্য কম বা বেশি আয়াস বোধ হয়। সেইজন্য কিছু সময় পরেই ফুসফুসের আরামের জন্য এবং মাঝে মাঝে তৎসঙ্গে পুনশ্চ নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় শব্দোচ্চারণ করা যায় না।

১। পূর্বাশা, মাঘ, ১৩৫৫ দ্রষ্টব্য

"এই রকমের বিরতির নাম 'বিচ্ছেদ-যতি' বা শুধু ছেদ [breath pause]।"

যতি—"যেখানে ছেদ থাকে, সেখানে সব কয়টি বাগ্‌যন্ত্রই বিরাম পায়। ...ছেদ ভাবের অনুযায়ী বলিয়া সব সময় নিয়মিতভাবে বা ততশীঘ্র পড়ে না—পূর্ব হইতেই জিহ্বার ক্লান্তি ঘটিতে পারে, এবং বিরামের আবশ্যকতা আসিয়া পড়ে। এক একবারের ঝোঁকে কয়েকটি অক্ষর উচ্চারণ করার পর পুনশ্চ শক্তিসংগ্রহের জন্য জিহ্বা এই বিরামের আবশ্যকতা বোধ করে। বিরামের পর আবার এক ঝোঁকে পুনশ্চ কয়েকটি অক্ষরের উচ্চারণ করে। এই বিরামস্থলকে বিরাম-যতি বা শুধু যতি নাম দেওয়া যাইতে পারে। যেখানে যতির অবস্থান, সেখানে একটি impulse বা ঝোঁকের শেষ; এবং তাহার পর আর একটি ঝোঁকের আরম্ভ।"

অতঃপর পর্বের পরিচয় সুপরিস্ফুট হবে। অমূল্যধন লিখেছেন—"এক এক বারের ঝোঁকে ক্লান্তিবোধ বা বিরামের আবশ্যকতা বোধ না হওয়া পর্যন্ত যতটা উচ্চারণ করা যায়, তাহারই নাম পর্ব। পর্ব-ই বাংলা ছন্দের উপকরণ।"

পর্বের বিভাগ কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে দেখা যাক্—

[১] "আহা পিঁপড়ে। ছোটো পিঁপড়ে। ঘুরুক দেখুক। থাকুক
কেমন যেন। চেনা লাগে। ব্যস্ত মধুর। চলা—"

—'পিঁপড়ে' : অমিয় চক্রবর্তী

[২] "বন-পথে। বিভীষিকা। বিঘ্ন
আমাদেরও। বল্লম। তীক্ষ্ন
কাপুরুষ। সিংহ তো। মারতেই জানে শুধু
আমরা যে। মরতেও। চাই।"

—'নীলকণ্ঠ' : প্রেমেন্দ্র মিত্র

[৩] "বাদলের কালো ছায়া।
স্যাঁৎসেতে ঘরটাতে ঢুকে।
কলে-পড়া জন্তুর মতন।
মূর্ছায় অসাড়।"

—'বাঁশি' : রবীন্দ্রনাথ

পর্ববিভাগের চেহারা চেনবার পক্ষে এই তিনটি দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এইবার পর্বের ভাগগুলির মধ্যে আরো ছোটো 'পর্বাঙ্গ'-বিভাগ চিনতে হবে। উচ্চারণের সময়ে গলার স্বরের ওঠা-নামার দিকে নজর রাখলে দেখা যাবে যে, প্রথম দৃষ্টান্তের প্রথম পর্ব 'বন-পথে' যেন আরো ছোটো-ছোটো বিভাগে ভাগ হয়ে 'বন।-পথে', এই ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। অমূল্যধন লিখেছেন—

"কণ্ঠস্বরের উত্থান-পতন হইতে পর্বাঙ্গের বিভাগ বোঝা যায়; যেখানে একটি পর্বাঙ্গের শেষ ও অপর একটি পর্বাঙ্গের আরম্ভ হয়, সেখানে ধ্বনির একটি তরঙ্গের পর অপর একটি তরঙ্গের আরম্ভ হয়।"

'পর্বাঙ্গ' সম্বন্ধে আরো চারটি কথা মনে রাখা দরকার—১] প্রত্যেক পর্বে পর্বাঙ্গের সংখ্যা হতে পারে দুই বা তিন। [২] পর্বের মধ্যে পর্বাঙ্গ-বিন্যাসের আইনটি এই যে, হয় পর-পর সমান মাপের,—না হয় বড়ো-মাপ থেকে ক্রমশ ছোটো-মাপ অনুসারে পর্বাঙ্গ সাজানো হয়। বড়ো, ছোটো, বড়ো—এ রকম ক্রম স্বীকার করা হয় না। [৩] পর্বাঙ্গ হলো পর্বের সূক্ষ্মতর বিভাগ; পর্বাঙ্গ সাধারণতঃ গোটা-গোটা ছোটো-ছোটো শব্দের ভাগে ভাগ হয়ে থাকে। তবে, তার ব্যতিক্রমও হতে পারে। [৪] পর্বাঙ্গের মধ্যে কণ্ঠস্বরের আর-কোনো ওঠা-পড়া থাকে না।

ধ্বনি-পরিমিতির এককের নাম মাত্রা। বাংলা ছন্দের রীতি-ভেদ অনুসারে মাত্রা-ভেদ ঘটে থাকে। উচ্চারণের স্বাভাবিক রীতি বজায় রেখে, কবিতায় কবির প্রেরণার অভিপ্রায়টি যেমন ফুটেছে, সেই ভাবটি যথাযথ রক্ষা করে কবিতাটি আবৃত্তি করা উচিত। সেই রকম পড়বার রীতি থেকেই বিশেষ ছন্দের বিশেষ ছাঁদ বা রূপকল্পটি ধরা পড়বে। অতএব মাত্রা সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে পৌছোনো যায় যে, **কবির অভিপ্রেত ছন্দোপাঠের রূপকল্পের ওপরেই মাত্রার তারতম্য নির্ভর করে।** উচ্চারণের তারতম্য ব্যাপারটি বুঝতে হলে একটি দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। মাত্রার আলোচনা আপাততঃ স্থগিত থাক্। কবির অভিপ্রায় অনুসারে, একই শব্দ দু'রকম ছাঁদে দু'ভাবে যে উচ্চারিত হতে পারে, তার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' বই থেকে তুলে দেওয়া হলো—

[১] "মনে পড়ে দুইজনে জুঁই তুলে বাল্যে
নিরালায় বনছায় গেঁথেছিনু মাল্যে।"

এবং—

[২] "দুইজনে জুঁই তুল্‌তে যখন
গেলেম বনের ধারে,—"

—এই দুটির মধ্যে প্রথমটিতে 'দুই' আর 'জুঁই' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত হয়েছে,—দ্বিতীয়টিতে তারা উভয়েই আরো বেগবান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ' বইখানিতে পর্ব অর্থে ব্যবহার করেছেন বটে,—ছান্দসিকেরা কিন্তু **'কলা'** শব্দটি **হ্রস্ব-উচ্চারণের একক** রূপেই ব্যবহার করে থাকেন। প্রবোধচন্দ্র লিখেছেন—"কলা ও মাত্রার পার্থক্য স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। যে রীতির ছন্দে কলা-ই মাত্রা, তাকে বলা যায় কলামাত্রিক [moric]। আর যে রীতিতে সিলেব্‌ল বা দলই মাত্রা তাকে বলা যায় দলমাত্রিক [syllabic]। 'কলাবৃত্ত' এবং 'দলবৃত্ত' শব্দ দুটি 'কলামাত্রিক' ও 'দলমাত্রিক'-এরই নামান্তর বলে স্বীকার্য।"

অতঃপর 'syllable'-এর,—অর্থাৎ প্রবোধচন্দ্র-কথিত 'দল'-এর পরিচয় জানা দরকার। 'দল'-এর নামান্তর হলো **'অক্ষর'**। অমূল্যধন জানিয়েছেন—"বাগ্‌যন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে যে ধ্বনি-উৎপন্ন হয় তাহাই অক্ষর।" 'বর্ণ' এবং 'অক্ষর' এক জিনিস নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে Letter, বাংলায় তারই নাম বর্ণ। বর্ণের আর এক নাম হরপ। **একটি মাত্র স্বরধ্বনির সাহায্যে এক প্রযত্নে উচ্চারিত ধ্বনির নাম অক্ষর বা দল।** 'জল্', 'ফল্' ইত্যাদি শব্দে দুটি-দুটি বর্ণ,—কিন্তু একটি করে অক্ষর আছে। এইসব অক্ষরের প্রকৃতি হলো হল্ বা ব্যঞ্জনান্তিক। তার মানে এসব ক্ষেত্রে হসন্ত উচ্চারণ হচ্ছে। এদের বলা হয় 'হলন্ত অক্ষর'। অপর পক্ষে, 'কুন্দ' শব্দটি 'কুন্—দ', এইভাবে উচ্চারিত হয়। ওতে দুটি অক্ষর, প্রথমটি হলন্ত, দ্বিতীয়টি স্বরান্ত।

ছান্দসিকেরা ইংরেজি accent কথাটির সর্বার্থবোধক বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'দমক', 'ঝোঁক এবং 'প্রস্বর' কথাগুলি ব্যবহার করে থাকেন। শেষেরটিকেই accent-এর যথার্থ পরিভাষা হিসেবে প্রবোধচন্দ্র গ্রহণ করেছেন।

অতঃপর ছন্দের **পদ, চরণ** বা পংক্তি বিভাগের কথা ওঠা সংগত। ইংরেজিতে যার নাম verse বা metrical line, তারই বাংলা হলো পদ বা চরণ। সাধারণতঃ শুধু line অর্থে ব্যবহৃত হয় বলেই পংক্তি শব্দটা না ব্যবহার করাই ভালো। এই অর্থে 'চরণ' বা 'পদ'-এর সংজ্ঞা হলো **পূর্ণযতির বিভাগ।** "মহাভারতের কথা অমৃত সমান।"—এই হলো metrical line-এর দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক পদে কয়েকটি পর্বের সমাবেশ ঘটে থাকে। পর্ব-কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ছন্দের **'চলন'** বা **'পদক্ষেপ'**। তাঁরই 'ছন্দ' বইয়ের একটি দৃষ্টান্ত থেকে এখানে পদের আর একটি দৃষ্টান্ত তোলা হলো—

"মাথা তুলে তুমি। যবে চলো তব। রথে"

এই দৃষ্টান্তের প্রথম পর্ব [=চলন=পদক্ষেপ] হলো ছয় মাত্রার, দ্বিতীয়টিও তাই, শেষেরটিতে আছে দুই; অর্থাৎ পূর্ণযতির দ্বারা প্রশমিত-বেগ এই মোট পথটি হচ্ছে চোদ্দ মাত্রার। এইবার ওর পরের পদটি দেখা যাক্—

"তাকাও না কোথা । আমি ফিরি পথে । পথে,"

—এখানে দেখা গেল [৬+৬+২=১৪] চোদ্দ মাত্রার দ্বিতীয় পরিসীমা। রবীন্দ্রনাথ এই রকম সীমা অর্থেই 'পদ' কথাটি ব্যবহার করে পদের এক-একটি পর্বকে বলেছেন 'কলা' [ছন্দ : আষাঢ় ১৩৪৩, পৃঃ ১০২]। পরিভাষা নিয়ে বড়োই গোলমালে পড়তে হয়। এই কারণেই সাহিত্যের অন্যান্য প্রসঙ্গের মতো ছন্দের প্রসঙ্গেও নিশ্চিত পরিভাষার দরকার। চরণ, পদ, পংক্তি [verse অর্থে],—কলা, পদক্ষেপ, চলন, পর্ব [কবিতার শুরু থেকে কিংবা এক যতি থেকে পরের যতির সীমা অর্থে] ইত্যাদি নামের বহুত্ব থাকে থাক্, —কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য বিশেষ নামের নির্দিষ্টতা চাই। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এই কারণেই বাংলা ছন্দের পরিভাষা সৃষ্টির কাজে নেমেছিলেন। অবশ্য তাঁর দেওয়া 'পংক্তি' শব্দের পরিবর্তে আর কোনো শব্দ পেলে ভালো হতো। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ভাবেই বলে গেছেন—

> "আমার বক্তব্য এই, লেখার পংক্তি এবং ছন্দের পদ এক নয়। আমাদের হাঁটুর কাছে একটা জোড় আছে বলে আমরা প্রয়োজন মতো পা মুড়ে বসতে পারি, তৎসত্ত্বেও গণনায় ওটাকে

এক পা বলেই স্বীকার করি এবং অনুভব করে থাকি। নইলে চতুষ্পদের কোঠায় পড়তে হয়। ছন্দেও ঠিক তাই।”

যাই হোক্ পূর্ণযতির সীমা পর্যন্ত এক একটি verse বা metrical line-এর বিস্তার,—এই সংগত কথাটিতে কোনো পক্ষেরই আপত্তি হবার কথা নয়।

এইবার ছন্দের স্বরূপ নির্ণয়ের প্রশ্ন উঠবে। সেই উপলক্ষে আবার রবীন্দ্রনাথের কথা তোলা দরকার। তিনি বলেছেন—"ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে হোলে সমগ্রের মাত্রাসংখ্যা তার কলাসংখ্যা ও কলাগুলির মাত্রাসংখ্যা জানা আবশ্যক। শুধু তাই নয়, যেখানে ছন্দের রূপকল্প একাধিক পদের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় সেখানে পদসংখ্যাও বিচার্য।” [—ছন্দ, পৃঃ ১১৪]—এই বলে কবি পূর্ণযতি-বিভাগে সীমিত চারটি অসমান পদের একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

বর্ষণ শান্ত
পাণ্ডুর মেঘ যবে ক্লান্ত
বন ছাড়ি' মনে এলো নীপরেণু গন্ধ,
ভরি দিল কবিতার ছন্দ।

পর্ব,—পর্ব-সমাবেশময় পদ,—পদ-সমাবেশময় বৃহত্তর বিভাগ, এই তিন বৃত্তান্ত একত্র মিলিয়েই ছন্দের রূপকল্পের কথা ভাবতে হবে। শেষে যে বৃহত্তর বিভাগের উল্লেখ করা হলো, তারই নাম 'স্তবক' বা stanza। অমূল্যধন লিখেছেন—“সুশৃঙ্খল রীতিতে পরস্পর সংশ্লিষ্ট চরণপর্যায়ের নাম স্তবক।”

সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে বাঙালী মনের পরিচয় পাওয়া যায়, ইতিহাসের ধারায় তার আত্মপ্রকাশের মধ্যযুগটি ছিল অপেক্ষাকৃত শান্ত। শান্ত, বৈচিত্র্যহীন, অভ্যাসনিষ্ঠ। সেকালের বাংলা কবিতার ছন্দের মধ্যে সে পরিচয় সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। প্রধানতঃ পয়ার-ত্রিপদী,—তাছাড়া বৈষ্ণব কবিতার ধ্বনিপ্রধান ছন্দ-শ্রেণী,—এবং তৃতীয়তঃ ছড়ার ছন্দ, এই তিন রকম ছন্দেই আমরা অভ্যস্ত ছিলাম। পয়ার-জাতীয় ছন্দ এসেছে সংস্কৃত থেকে,—ধ্বনিপ্রধান ছন্দ প্রাকৃত থেকে,—আর, ছড়ার ছন্দ আমাদের বাংলায় নিজস্ব ব্যাপার। বাংলা চর্যাপদের আমলেই পয়ারের সূচনা ঘটে-

পঞ্চদশ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আমলে তার স্পষ্ট রূপ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। উনিশের শতকেই বাঙালী কবিরা অভ্যস্ত পথ ছেড়ে উত্তরোত্তর আরো স্বাধীনতা খুঁজেছেন। তারপর একালে পদেরও সমতা থাকতে চাইছে না, স্তবকেরও সমরূপ রাখা হচ্ছে না। আঠারোর শতকে ভারতচন্দ্র অনেকরকম ছন্দ-কারসাজির চেষ্টা করেছিলেন বটে। উনিশের শতকে মধুসূদন এসে অমিত্রাক্ষর প্রবর্তন করলেন। এ ছন্দের আদর্শ নেওয়া হলো মিল্টনের Blank verse থেকে। পদের শেষে যে অন্ত্যানুপ্রাসে বা মিল-বিন্যাসে আমরা অভ্যস্ত ছিলাম, এই নতুন ছন্দে তার আর মাহাত্ম্য রইলো না। অমিত্রাক্ষর হলো মিলহীন। কিন্তু সেইটিই এ ছন্দের বিশেষ পরিচয় নয়। পয়ারের মিল উঠিয়ে দিলেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর হয় না। আগেকার রীতিতে যতি সকল ক্ষেত্রেই ছেদের,—অর্থাৎ অর্থবিভাগের অনুগামী হতো। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান'—এই পর্যন্ত বলেই কিঞ্চিৎ দাঁড়াবার সুযোগ ছিল। কিন্তু ঠিক সেই ভাবে,—'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি'—এই উক্তিটির পরে থামবার অনুমতি নেই। অর্থের খাতিরে আরো এগিয়ে যেতে হবে। এতে ঠিক ক' মাত্রার পরে ছেদ পড়বে, সেটা নির্ভর করে কবির আবেগ বা অনুভূতির স্বাধীন ইচ্ছার ওপর। এই স্বাধীনতার জয়যাত্রাই একালের বাংলা কবিতার ছন্দের নতুনত্বের মূল ধর্তব্য বিষয়। একালে একদিকে স্বাধীনতা,—অন্যদিকে ব্যয়সংক্ষেপ! রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্য-ব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে বড় ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে ভাষায় অতিমাত্র বাছাবাছি চুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা।"[১]

মধুসূদন যখন 'অমিত্রাক্ষর' এনেছিলেন তখন সে অভিনবত্বের মূলে ছিল কিছু স্বাধীনতার তাগিদ, কিছু বোধ হয়, নতুনত্বের ঝোঁক। শেষের হেতুটি মধুসূদন সম্বন্ধে খুব বেশি প্রযোজ্য নয়; কিন্তু, মধুসূদনের সমসাময়িক গিরিশচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের অভিনবত্বের মধ্যে সে কারণের কল্পনা অন্যায় কল্পনা নয়। তাঁরা মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর'-এর [অমূল্যধন বলেছেন, 'অমিতাক্ষর'] আরো কিছু বৈচিত্র্য ঘটিয়েছিলেন। মধুসূদনের বন্ধুরতাময় জীবনের

১। সাহিত্যের পথে—'আধুনিক কাব্য' দ্রষ্টব্য

মধ্যে অমিত্রাক্ষরের যেরকম যথার্থ প্রেরণা ছিল, গিরিশচন্দ্র বা নবীনচন্দ্রের তা ছিলো না। কবিতার ছন্দ-গত সার্থক বিশেষত্ব কবি-মনের বিশেষত্বের ওপরেই নির্ভর করে। বিষয়ের রুচি, ভঙ্গির রুচি, ছন্দের রুচি, তিনের কোনোটাই যান্ত্রিক ভাবে বাইরে থেকে আসে না। খানিকটা নকল করে পাওয়া যেতে পারে,—সবটা নয়। যাই হোক্, বাংলা ছন্দের জাতি-ভেদের কথায় আসা যাক্ এবার। সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতীর আগে ১৩২৩ সালে রাখালরাজ রায় বাংলার তিন জাতের ছন্দের কথা উল্লেখ করেন। ১৩২৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'ছন্দ সরস্বতী' প্রবন্ধে বাংলা ছন্দের অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত এবং স্বরবৃত্তের শ্রেণীবিভাগের কথা বলেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বাংলায় ছন্দের তিনটি শ্রেণীর কথাই শুধু বলেন নি। বাংলা কবিতায় বিদেশী ছন্দের প্রয়োগ সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করেছিলেন। ছান্দসিক কবির চোখে ছন্দের সকল তত্ত্বই যেন ধরা দিয়েছিল। পরের যুগে 'বৃত্ত' নাম সম্বন্ধে আপত্তি উঠেছে। বর্তমানে 'তানপ্রধান' [ধীর লয়ের ছন্দ], 'ধ্বনিপ্রধান' [বিলম্বিত লয়ের ছন্দ] এবং 'বলপ্রধান' বা 'শ্বাসাঘাতপ্রধান' [দ্রুত লয়ের ছন্দ],—বাংলা ছন্দের এই তিন ঢঙের বিভাগ মেনে নেওয়া হয়েছে। অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র আমাদের মনে রাখতে বলেছেন যে, 'গানের আদ্যোপান্ত কালগতির নাম লয়'। এই সূত্রে সেই কথাটি মনে রাখলে ছন্দের এই তিন ঢঙ্ বা style-এর বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হবে। এখন এই তিন ঢঙের তিনটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

[১] বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে মনে,... —মধুসূদন

[২] কণ্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি। —গোবিন্দদাস

[৩] কার তরে এই শয্যা দাসী রচিস্ আনন্দে ?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে তোর দে রে আগুন দে।
—সত্যেন্দ্রনাথ

প্রথমটিতে ধীর লয়ের তানপ্রধান ছন্দ,—দ্বিতীয়টিতে বিলম্বিত লয়ের ধ্বনিপ্রধান,—এবং তৃতীয়টিতে দ্রুত লয়ের শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তানপ্রধানের এই বিশেষত্বগুলি মনে রাখা দরকার:—এতে একরকম টানা সুর [তান] থাকে ; অক্ষরের স্বর-অংশের প্রাধান্য স্বীকার করা হয় ; সুরের টান-এর বাঁধনটাই সর্বাধিক মর্যাদা পায় বলে সেই টানে অনেক রকম অক্ষর এতে বাঁধা পড়তে পারে—রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন 'পয়ারের শোষণশক্তি' এবং 'স্থিতিস্থাপকতা' ; সাধারণতঃ সাধুভাষা অবলম্বন করেই এ ছন্দ আত্মপ্রকাশ করে ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন এতে টেনে পড়া হয়—ছেড়ে-ছেড়ে নয় ; এতে অনেক বেশি মাত্রার পর্ব থাকতে পারে। ধ্বনিপ্রধান ছন্দের এই বিশেষত্বগুলি স্মরণীয়:—এর লয় বিলম্বিত ; এখানে উচ্চারিত ধ্বনির পরিমাণই প্রধান,—তানপ্রধানের মতো তানের প্রাধান্য নেই এতে ; সংযুক্ত ব্যঞ্জন ছেড়ে-ছেড়ে বিলম্বিতভাবে উচ্চারিত হওয়াই এখানকার আইন ; এতে এক-একটি পর্বে খুব বেশি মাত্রার জায়গা হয় না। শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দের বিশেষত্ব এই রকম:—দ্রুত লয়ের স্বীকৃতি ; এক রকম পর্বের প্রয়োগ ; প্রত্যেক পর্বে দুই পর্বাঙ্গ, চার মাত্রা ; প্রত্যেক পর্বের আদিতে প্রবল শ্বাসাঘাত,—প্রবোধচন্দ্রের ভাষায় 'প্রস্বর'। শেষ লক্ষণটিই প্রধান লক্ষণ।

অলঙ্কারশাস্ত্রের মতো ছন্দঃশাস্ত্রও অল্প কথায় অলোচনার সামগ্রী নয়। বাংলায় এ শাস্ত্রের সকল কথায় সর্বজনমান্য পরিভাষা থাকা উচিত। সেজন্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সম্মতি দরকার। যাই হোক্ এ প্রসঙ্গে ছেদ টানবার আগে আবার সেই স্বাধীনতাস্পৃহার কথা মনে পড়ে। মধুসূদন স্বাধীনতা চেয়েছিলেন,—ফলে অমিত্রাক্ষর দেখা দিয়েছিল। সে ছিলো Blank verse। তাতে দেখা গেছে পয়ারের বন্ধন-মোচন। একালে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-তে ছাপা লাইনগুলি যতিবিভাগ অনুসারে সাজানো হয়েছে। তাতে সমান লাইন সাজাবার প্রথা বা বাধ্যবাধকতা দূর হলো। এইভাবে ছন্দের কৃত্রিম বাঁধন উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার প্রবৃত্তি এগিয়েছে। বিশেষজ্ঞের দেওয়া 'মুক্তক' নামটি সেই অভিব্যক্তিরই শিরোনাম। কবি সত্যেন্দ্রনাথ Free verse-এর নাম দিয়েছিলেন মুক্তবন্ধ। 'বলাকা'র মুক্তক মিল-কে পরিত্যাগ করেনি। ১৯৩২-এর 'খেলনার মুক্তি'তে ['পরিশেষ'-এর অন্তর্ভুক্ত]

দেখা দিল মিল-ত্যাগী 'মুক্তক'। রবীন্দ্রনাথের মুক্তক ছন্দে প্রবহমানতাই বিশেষ ধর্ম। তাঁর জীবনের শেষ লেখাও এই অমিল মুক্তকেই প্রকাশিত হয়েছে। প্রবোধচন্দ্র লিখেছেন, "ছন্দোবদ্ধ পদ্যের পক্ষে কোনো-না-কোনো বন্ধন অবশ্য স্বীকার্য।" পদের আয়তনের সমতার আইন এবং মিলের বাঁধাবাঁধি নিয়ম এতে লঙ্ঘন করা হলেও যতির নিয়ম মেনে নেওয়া হয়। অতএব একে Free verse বলা চলে না। 'মুক্তক' আর 'মুক্তবন্ধ' এক জিনিস নয়। Free verse হলো পর্ব, চরণ, স্তবক ইত্যাদি যাবতীয় গঠনগত নিয়মতন্ত্রের বিরোধিতা। তাই যদি হয়, তাহলে ঐ নামের মধ্যে Verse অংশটুকু জুড়ে রাখা হয়েছে কেন? কারণ, বন্ধনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ওতে কিছু পদ্য-উপকরণ বিদ্যমান।

'পুনশ্চ' বইখানির ছন্দ সম্পর্কে কবি নিজে বলেছিলেন যে, তাতে তিনি 'গদ্যিকারীতি' প্রয়োগ করেছিলেন এবং—"বক্ষ্যমান কাব্যে গদ্যটি মাংস-পেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য হবে বলেই ভরসা করেছিলুম। এর মধ্যে ছন্দ নেই বল্‌লে অত্যুক্তি হবে, ছন্দ আছে বল্‌লেও সেটাকে বলব স্পর্দ্ধা।"..."কাব্যকে বেড়াভাঙা গদ্যের ক্ষেত্রে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়া যায় যদি, তাহোলে সাহিত্য-সংসারের আলঙ্কারিক অংশটা হালকা হয়ে তার বৈচিত্র্যের দিকে অনেকটা খোলা জায়গা পায়। কাব্য জোরে পা ফেলে চলতে পারে।"

অমূল্যধন গিরিশচন্দ্রের গৈরিশ ছন্দকেই [১২৮৮ শ্রাবণে, রাবণবধ' নাটকে প্রথম ব্যবহৃত] বরং Free verse বল্‌তে রাজী আছেন, কারণ তাতে মিল, পর্ব, স্তবক সব কিছুই স্বাধীন,—অন্যোন্য-নিরপেক্ষ। প্রবোধচন্দ্রের সঙ্গে অমূল্যধনের মধ্যে এই নিয়ে স্পষ্ট মতবিরোধ ঘটেছে। Free verse কথাটি বিদেশী। তার অর্থও খুব স্পষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা'র [১৯২২] আমল থেকেই বাংলায় এসব পরিভাষা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক বেড়েছে। যাই হোক্ পদ্যের প্রধান উপকরণ পর্ব—এই স্বতঃসিদ্ধ মেনে নিয়ে পদ্য-ছন্দের দুটি শ্রেণীর কথা ভাবা যেতে পারে। একটির নাম দেওয়া যাক্ **বদ্ধ-পদ্য,**—অন্যটির **মুক্ত-পদ্য**। বলা বাহুল্য শেষেরটি Free verse-এর বঙ্গানুবাদ নয়। গদ্যিকারীতি আদৌ পদ্যই নয়। সে হলো অসম পর্ব-চরণময় ভাবের ছন্দ।

•••

ক্ল্যাসিক ও রোম্যান্টিক

সাহিত্যের শাস্ত্রবিশারদদের আলোচনায় 'ক্ল্যাসিক' এবং 'রোম্যান্টিক' শব্দ দুটি বার-বার ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

দু'টি কথাই একাধিক যুগের সাহিত্যকর্মের বিশেষ প্রকৃতি বোঝাবার অর্থে ব্যবহার করা হয়। ইংরেজির সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে যখন থেকে, ইংরেজি পঞ্জিকার হিসেবে সে হলো উনিশের শতক। সে সময়ে ও দেশে একটি রোম্যান্টিক যুগের অভ্যুদয় ঘটেছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কবি ব্লেক্-এর লেখা কবিতার বই Songs of Innocence প্রকাশের সময় থেকে শুরু করে শতাব্দীর প্রায় শেষ পর্যন্ত এই যুগের বিস্তার বলা যায়—অবশ্য কিঞ্চিৎ ব্যাপক অর্থে। ব্লেক, কোল্‌রিজ, বার্ডসার্থ, শেলী এবং কীট্‌স্—এই পাঁচ জনকেই এ সময়ের আদি-রোম্যান্টিক কবি বলে মেনে নেওয়া হয়।

আঠারোর শতকের যুক্তি-তর্ক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, আর গদ্যময় বস্তুভাবনার মধ্যেই ব্লেক অন্তর্দৃষ্টির কথা শুরু করেছিলেন। পরের রোম্যান্টিক আন্দোলনে তারই পরিণতি দেখা গেল। অন্তর্দৃষ্টি,—প্রেরণায় বিশ্বাস,—অভ্যস্ত কাব্য-রূপ কিংবা গতানুগতিক শব্দ-ছন্দ-অলঙ্কারের অনুসৃতির চেয়ে মনের স্বাধীন আনন্দে স্বাধীনভাবে নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করবার ঝোঁক,—প্রকৃতি এবং প্রেমের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বের পরমাশ্চর্য ঐক্য উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া—এই ছিল রোম্যান্টিক আদর্শের মূল বিশেষত্ব। অতীন্দ্রিয়তা [Supernaturalism] এবং মরমীয়তা [Mysticism] এসেছে এদেরই ক্রম-প্রসারণ হিসেবে।

বাংলা সাহিত্যে রোম্যান্টিক আদর্শের কথা একটু বিশেষ অর্থে বুঝতে হলে ইংরেজির এই উনিশের শতকটিতে চোখ রাখতে হয়।

আঠারোর শতকের ইংরেজ কবিদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে উনিশের শতকের কবিদের তুলনা করলেই দুই দলের পার্থক্য ধরা পড়ে। 'কল্পনার'-র ওপর উনিশের শতকের আস্থা অনেক বেশি ছিল। সূক্ষ্ম বিভাগ-বিশ্লেষণে

"Strictly speaking all knowledge is particular".

সে যুগের নব্য দৃষ্টির মূল বিশেষত্বের পরিচয় এই আলোচনা থেকেই পাওয়া যাবে। মানুষের আত্মার দিকে নতুন আগ্রহ,—প্রকৃতিকে ভালোবাসা,—প্রেমে বিশ্বাস,—সুন্দর এবং সত্যের অদ্বৈত সত্তায় আস্থা রাখা,—এইসব লক্ষণ হলো উনিশের শতকের ইংরেজি কবিতার রোমান্টিক আদর্শের লক্ষণ। জীবন যে রহস্যের মহাসমুদ্র, কবিরা সেকালে সেই উপলব্ধিকেই ভাষা দিতে চেয়েছিলেন। বিজ্ঞানের নির্বিশেষ 'সামান্য' সত্য তাঁরা চাননি।

শেলী সৃজনী-কল্পনায় শ্রেয়ত্বের বিশ্বাস এতোদূর মেনেছিলেন যে, তাঁকে বলতে হয়েছিল—জগদ্ব্যাপার সম্বন্ধে মানুষের যুক্তি-তর্ক-বিবেচনায় যে ন্যায়বুদ্ধি [Reason], সেও আসলে ঐ সৃজনী-কল্পনারই সেবার কাজে ব্রতী! সত্য সম্বন্ধে কবির আছে অন্তর্দৃষ্টি। সত্য অজর, অমর, পূর্ণ! লৌকিক জগৎটা তার প্রতিভাস মাত্র। এই ছিলো শেলীর বিশ্বাস। সৃজনী-কল্পনার বলে ইন্দ্রিয়-জগতের অন্তর্নিহিত পরম ঐক্যময় এক পূর্ণের উপলব্ধি পেয়েছিলেন তিনি। দার্শনিক প্লেটো বলেছিলেন মনোলীন সংবিদ-সত্যের কথা। সৌন্দর্যের মধ্যে,—জগতের যাবতীয় খণ্ড-সৌন্দর্যের মধ্যে,—পরম ঐক্যময় সত্যকে,—অজর অমর সত্যকে উপলব্ধি করলেন শেলী। 'Defence of Poetry' বইয়ের মধ্যে তিনি বলে গেছেন যে, ন্যায়বুদ্ধি হলো জ্ঞাত বা পরিচিত পরিমিতির উল্লেখ বা স্বীকৃতি; কবিকল্পনা বা সৃজনী-কল্পনার কিন্তু অন্য ধর্ম, অন্য সামর্থ্য। আমাদের সকল জ্ঞানের বৈশেষিক এবং সামগ্রিক উভয় মূল্যবোধ তারই প্রসাদে ঘটে থাকে—"Reason is the enumeration of quantities already known ; imagination is the perception of the value of these quantities both separately and as a whole."।

কেউ-কেউ বলেছেন যে, উনিশের শতকের ইংরেজি কাব্যের এই রোমান্টিক ভাবাদর্শের পরিণতির রূপ ফুটেছিল বায়রনের কাব্যে এবং জীবনে। শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে সারা য়ুরোপের মধ্যে বায়রনের ভক্ত সাহিত্যিক ছিলেন। অভ্যস্ত ব্যবস্থা পরিত্যাগ করা,—নতুনের জয় গান করা,—স্বাধীনতা এবং ভালোবাসার সত্যে নির্ভর করা,—বায়রন ছিলেন এই

আদর্শের মানুষ। শোনা যায়, যে, ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রুষ কবিতার সমৃদ্ধির লগ্নে বায়রন-ই ছিলেন সে রাজ্যের ভাব-নেতা। পুশ্‌কিনের তিনি গুরু ছিলেন। বায়রনের নানান্ কবিতা এবং কাব্যরূপের প্রভাব দেখা যায় পুশ্‌কিনের সাহিত্যে। বাইরে যাই ঘটুক, দেশে কিন্তু তাঁর আদর ছিলনা। প্রতিষ্ঠিত কবিদের মধ্যে বার্ডসার্থ, কোল্‌রিজ প্রভৃতি তাঁকে বড়ো দরের কবি বলে মনে করেননি। সমালোচক বলেছেন যে, বায়রনের মধ্যে একদিকে যেমন সে যুগের রোম্যান্টিক ভাবাদর্শের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, অন্যদিকে তেমনি আবার খাঁটি রোম্যান্টিকদের 'কল্পনা'-পূজায় তিনি যোগ দেননি। পুরোপুরি অন্তরানুভূতির কাছেও তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি,—আবার পুরোপুরি বুদ্ধিমার্গেও নিষ্ঠা রক্ষা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। রোম্যান্টিক কবিরা ছিলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় রচনার বিরোধী। বায়রন কিন্তু সাহিত্যের সে সব অস্ত্রও পরিত্যাগ করেন নি। ড্রাইডেন-পোপের তিনি ছিলেন বিশেষ ভক্ত। প্রকৃতির মধ্যে রহস্যময়ী শক্তির রূপ দেখেছিলেন বার্ডসার্থ-কোল্‌রিজ;—বায়রন প্রকৃতিকে দেখেছিলেন অপেক্ষাকৃত শাদা চোখে, কোনো নীতিবাদ বা রহস্যভাবনার পরিকল্পনা ছিলনা তাতে।

উনিশের শতকের ইংরেজি সাহিত্যের রোম্যান্টিক আন্দোলনের আদি-পঞ্চকের সঙ্গে পরবর্তী রোম্যান্টিক কবিদের এই ধরনের মতভেদ বা দৃষ্টিভেদ ঘটেছিল। এখানে সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 'আদি-পঞ্চক' নামে যে গোষ্ঠীটির কথা ভাবা হয়েছে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যেও মতের কিছু কিছু পার্থক্য ছিলো। ব্লেক ব্যবহারিক জগতের ন্যায়বুদ্ধিকে আদৌ আমল দেন নি। কিন্তু বার্ডসার্থ ঠিক অতোদূর যান নি। সেসব তর্কের কথাও স্থগিত থাক। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে Lyrical Ballads-এর ভূমিকায় [১৭৯৮-এ প্রথম প্রকাশিত] কবিতার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন, সেই সূত্র থেকেই সে-যুগের রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে কিছু-কিছু কথা জানা গেছে। Lyrical Ballads-এর তারিখ থেকে প্রায় শ-খানেক বছর পিছিয়ে গেলে ইংরেজি কবিতায় বরাবর ভিন্ন এক আদর্শের অভিব্যক্তি চোখে পড়ে। সতেরোর শতকে তথাকথিত দার্শনিক [Metaphysical] কবিদের প্রতাপ দেখা গেছে; ফ্রান্সে সে ছিল প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য-সূত্র-নিয়ন্তাদের বিশেষ আনুগত্যের কাল। ইংরেজি নাটকে সে যুগে

ড্রাইডেন প্রভৃতি লেখকরা সম্ভবতঃ ফ্রান্সের আদর্শেই অনুপ্রাণিত হয়ে অ্যারিষ্টটলের বিশেষ বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীক কাব্যপ্রকার এবং কাব্যরূপের অনুকরণ চল্‌ছিলো ব্যাপক ভাবে। সমজদাররা বলেছেন, রোমের প্রাচীন কবি Horace-এর নকল করে পোপ্‌ তাঁর বিদ্রূপ-রচনায় সমুনায় গুরুকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। এই অনুকরণের ব্যাপকতা ক্রমশঃ কবিতার সম্ভাবনা সম্বন্ধে সেদেশে কাব্যানুরাগীর মন ভেঙে দিয়েছিল।—কবিতার দিন ফুরিয়েছে।—সবই তো নকল!—সবই তো পুনরাবৃত্তি!—নতুনের আশা নেই!—আঠারোর শতকের শেষ দিকে এই ধরনের দীর্ঘশ্বাসে ইংরেজি সাহিত্যের পাঠকসমাজ যখন অত্যন্ত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, কবি বার্ন্‌স্‌, ব্লেক এবং কুপার তখন ঈষৎ আশার আলো জ্বাললেন। আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাল্যকালে সেই দলের মধ্যেই ইংরেজি কাব্যের তৎকালীন আধুনিকতার প্রকাশ দেখেছিলেন। 'সাহিত্যের পথে' বইখানির মধ্যে এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য আছে:—"বাল্যকালে যে ইংরেজি কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হোলো তখনকার দিনে সেটাকে আধুনিক বলে গণ্য করা চলত। কাব্য তখন একটা নতুন বাঁক নিয়েছিল, কবি বার্ন্‌স থেকে তার সুরু।" হৃদয়াবেগ-রহিত, অনুকরণমুখ্য, যুক্তিবাদী আঠোরোর শতকের বিরুদ্ধে এই নতুন প্রতিক্রিয়ারই নাম 'ইংরেজি সাহিত্যের উনিশ-শতকীয় রোম্যাণ্টিক আন্দোলন'। সৃজনী-কল্পনার স্বাধীনতা, গৌরব এবং বৈচিত্র্য স্বীকার করবার প্রায় সম-মনোভাবে সমৃদ্ধ এক দল কবি ছিলেন এর প্রবর্তক। তাঁদের নাম আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কবিতার শব্দ, রীতি, প্রসঙ্গ,—প্রধানতঃ এই তিন বিষয়ে তাঁরা পূর্বাদর্শের বিরোধিতা করলেন। তাঁদেরই কবিকল্পনার গুণে জীবনের আটপৌরে ঘটনা আবার কবিতার অমৃত হয়ে উঠ্‌লো! হ্রদ-সমাকীর্ণ কাম্বার্ল্যাণ্ড অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জীবনকথা নিয়ে বার্ডসার্থ কবিতা লিখলেন। তুচ্ছের মধ্যেই যথার্থ উচ্চের অবস্থান,—এই সত্যটি মেনে নেওয়া হলো। প্লেটো এবং রুশোর সঙ্গে তাঁদের ভাবনার সাদৃশ্য দেখা গেল। বুদ্ধিবাদী মানুষ জীবনে তথাকথিত পরিণতির পথে এগিয়ে যেতে-যেতে,—সভ্য হতে-হতে—ক্রমশঃ স্বর্গভ্রষ্ট হয়! একথা বার্ডসার্থ অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করলেন। তথাকথিত সভ্যতার নামে মানুষের আত্মার অবনতি দেখে তিনি শোক প্রকাশ করে লিখলেন—

"Have I not reason to lament
What man has made of man ?"

এইবার 'ক্লাসিক' কথাটির দিকে মন দেওয়া যাক। সাহিত্যে বাইরের অঙ্গসজ্জার দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক,—শব্দ, অলঙ্কার, গঠন ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়মের অতি-আনুগত্য,—শৃঙ্খলার বাড়াবাড়ি ইত্যাদিকে যথার্থ ক্ল্যাসিক-স্বভাবের লক্ষণ বলা যায় না। 'ক্ল্যাসিসিজ্‌ম্' কথাটির এ অর্থ একালের উদ্ভাবনা। য়ুরোপে রোমান্টিক মতবাদের মধ্যেও বহু পার্থক্য দেখা গেছে। সপ্তদশ শতকের শেষে, অষ্টাদশের শুরুতে Samuel Pepys-এর প্রসিদ্ধ রোজনামচাতে এবং অন্যান্য নানান্ রচনায় 'রোম্যান্টিক', এই বিশেষণ পদটি অসম্ভাব্যতা এবং অবিশ্বাস্যতার ধারণা প্রকাশের শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। উনিশের শতকের চতুর্থ দশকে জার্মানির কবি হাইনে বলে গেছেন যে, জার্মানিতে রোম্যান্টিক শিল্পিগোষ্ঠী ছিলেন মধ্যযুগের পুনরভ্যুদয়ের বিস্ময়ে বিস্মিত। হাইনে এই রোম্যান্টিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মের প্রেরণা যে সেই নবজাগরণের মূলে শক্তি সঞ্চার করেছিল, সেকথা স্বীকার করেছেন। সেকালের মনে মধ্যযুগের প্রভাবের কথা সর্বভাবে স্বীকার্য। স্থাপত্যের প্রসঙ্গে 'গথিক' [Gothic] কথাটি মধ্যযুগের শিল্পকার্যের স্মারকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ইংলণ্ডে 'টিউডর' রাজাদের প্রতিষ্ঠার যুগে মধ্য-যুগের বহু স্তম্ভ ভেঙে ফেলা হয়। সে সময়ে—আঠারোর শতকে, পুরোনো কালের কথা স্বপ্ন হয়ে ঐ সব জীর্ণ স্তূপের মধ্যে বাসা নিয়েছিল।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে টি. এস্. এলিয়ট নিজের এই পরিচয় দিয়েছিলেন যে, তিনি হলেন "a classicist in literature, a royalist in politics and Anglo Catholic in religion।" ১৯৩৮-এ তিনি অন্যত্র Classic এবং Romantic-এর পার্থক্য ব্যাখ্যানের সূত্রে লিখলেন—এ প্রভেদ হলো পূর্ণতার সঙ্গে খণ্ডতার পার্থক্য, পরিণতির সঙ্গে অপরিণতির পার্থক্য,—সুশৃঙ্খলা আর বিশৃঙ্খলার পার্থক্য![২]

২। "Between the complete and the fragmentary, the adult and the immature, the orderly and the chaotic"—The Function of Criticism [1938]—T. S. Eliot.

একজন সাহিত্যপ্রমাতা খুবই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, প্রাচীন প্রসিদ্ধ কাব্যমালার আদর্শ এবং সাহিত্যের 'ক্ল্যাসিক-স্বভাব' [classicism] ঠিক এক জিনিস নয়।[৩] য়ুরোপে হোমার-ভার্জিলের কাব্য অথবা আমাদের রামায়ণ মহাভারত যে অর্থে ক্লাসিক,—সে অর্থের সঙ্গে কোনো কালের কোনো কাব্যরসিকের বিরোধ ঘটবার কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্যে একথা আরো বিশদভাবে বুঝিয়েছেন। 'প্রাচীন সাহিত্য' এবং 'মহাকাব্য' এই দুটি শব্দ যে খুবই কাছাকাছি এবং প্রায় অবিচ্ছেদ্য অর্থের প্রকাশক, সেকথা মেনে নিয়ে তিনি 'রামায়ণ' প্রবন্ধটির এক জায়গায় গ্রীসের মহাকাব্যের সঙ্গে আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের কিঞ্চিৎ তুলনা করে লিখেছিলেন—

> "আধুনিক কোনো কাব্যের মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় না। মিল্‌টনের প্যারাডাইস লষ্টের ভাষার গাম্ভীর্য, ছন্দের মাহাত্ম্য, রসের গভীরতা যতই থাক্ না কেন তথাপি তাহা দেশের ধন নহে,—তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী।
>
> "অতএব গুটিকয়েকমাত্র প্রাচীন কাব্যকে এক কোঠায় ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাব্য ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যাইতে পারে? ইঁহারা প্রাচীনকালের দেবদৈত্যের ন্যায় মহাকায় ছিলেন—ইঁহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।
>
> "প্রাচীন আর্যসভ্যতার এক ধারা য়ুরোপে এবং এক ধারা ভারতে প্রবাহিত হইয়াছে। য়ুরোপের ধারা দুই মহাকাব্যে এবং ভারতের ধারা দুই মহাকাব্যে আপনার কথা ও সংগীতকে রক্ষা করিয়াছে।
>
> "আমরা বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না গ্রীস তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাহার দুই কাব্যে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে কি না। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।

৩। "...the ancient classics and the so called classicism are not the same thing, Homer and Virgil do not lose their fascination for those steeped in romanticism"—R, A, Scott James.

> "এইজন্যই, শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাহা পঠিত হইতেছে—মুদীর দোকান হইতে রাজার প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্রই তাহার সমান সমাদর।"

রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে এই উদ্ধৃতিটি কিছু দীর্ঘ হলো। প্রাচীন কালের সাহিত্যের মধ্যে এই যে একই পাত্রে প্রাচীন-চিরন্তনের রস-সত্য পরিবেষণের কথা তিনি ব্যাখ্যা করে গেছেন, সে বিষয়ে একটু বেশি মনোযোগই দেওয়া দরকার। সেজন্য আরো উদ্ধৃতি দরকার। তিনি বলেছেন—

> "রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতাপুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতিভক্তির সম্বন্ধ—রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।...রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই—সে যুদ্ধঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ্য মাত্র।"

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতে যেমন জীবনের বহু বিচিত্র অবস্থা, সম্পর্ক, স্তর, সমাজ, আচরণ এবং অভিব্যক্তির কথা আছে,—কালিদাস প্রভৃতি কবির খণ্ডকাব্যে ঠিক ততো ব্যাপকতা না থাকলেও বিশেষ বিশেষ ভাবগ্রামের আশ্রয়ে সর্বমানবিক আত্মীয়তার বোধ সেসব কাব্যেও ঠিক একই ভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে। কথাটা বিশদ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অতএব চেষ্টা করা যাক্।

মানুষের মন পরস্পর-বিরোধী মনোভাবনার মধ্য দিয়ে জীবনের পথ পরিক্রমা করছে। সংসারে কিছু কিছু হিংসাও করতে হয়,—হিংসার বিরুদ্ধেও মন বিশ্বাস পোষণ করে ; লোভ জয় করতে পারি না,—আবার নির্লোভ হবার বাসনাও মনে আছে। ভোগও চাই, ভোগবিরতিও কাম্য। কর্মও রয়েছে,—কর্মত্যাগও মনের কাঙ্ক্ষিত। এ দিক থেকে রাজায়-প্রজায় ভেদ নেই,—বিত্তবানে-নির্বিত্তে ভেদ নেই। মানুষ বড়ো অসহায় এবং মানুষ খুবই

শক্তিমান! পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে এই সর্বজনীন চিরন্তন সংবাদটি নিহিত আছে। রোম্যান্টিক কবির দল বিশেষকে দেখে-দেখে জীবনের শুধু এই সত্যই নয়, এই ধরনের অন্যান্য সর্বজনীন সত্যেরও উপলব্ধি করে-ছিলেন,—করে থাকেন। বার্ডসার্থ এবং রবীন্দ্রনাথ দুই পৃথক দেশের রোম্যান্টিক কবি। এদিক থেকে দুজনেরই এক কথা। দুজনেই বিশেষভাবে দেখেছিলেন—'একটি ঘাসের শীষের উপরে একটি শিশিরবিন্দু'! এই ব্যাপারে কোনো দেশের কোনো যথার্থ কবিমনের বিরোধ ঘটবার কথা নয়। 'কুমার-সম্ভব', 'শকুন্তলা', 'রঘুবংশ' ইত্যাদি প্রচীন কাব্যের মধ্যেও সর্বমানবিক আত্মীয়তার ধ্যানই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

ছোটোই হোক্, আর বড়ো ব্যাপারই হোক্,—একটি বৃহৎ মনশ্চৈতন্যের ভূমিকায়,—শান্ত, সর্বব্যাপক, সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে ক্ল্যাসিক আদর্শের জন্ম। তাতে প্রাচীনত্ব এবং চিরন্তনত্ব দুটি উপাদানই বিদ্যমান। শুধু পুরোনো কালের জিনিস হলেই 'ক্ল্যাসিক' হয়না। গাম্ভীর্য, সারল্য, প্রশান্তি—এই সব গুণবাচক বিশেষ্য-সমাবেশের মধ্য দিয়েই সে আদর্শের কতকটা ধারণা লাভ করা সম্ভব। এবং এই অর্থে কালিদাসের 'শকুন্তলা' কাব্যকে 'রোম্যান্টিক' না বলে 'ক্ল্যাসিক' বলাই সংগত। রবীন্দ্রনাথ এই কাব্যের আলোচনাসূত্রে কালিদাসের কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন—

> "শকুন্তলা নাটক প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি শান্তি সৌন্দর্য ও সংযমের দ্বারা পরিবেষ্টিত।...
>
> "কবি এইরূপে বাহিরের শান্তি ও সৌন্দর্যকে কোথাও অতিমাত্র মুগ্ধ না করিয়া তাঁহার কাব্যের আভ্যন্তরিক শক্তিকে নিস্তব্ধতার মধ্যে সর্বদা সক্রিয় ও সবল করিয়া রাখিয়াছেন।"

এ-আদর্শ 'ক্ল্যাসিক' আদর্শ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ মন্তব্যের পরেও সংশয় কাটে না। তাহলে রবীন্দ্রনাথের নিজের অনেক লেখাও কি 'ক্ল্যাসিক' পর্যায়ে পড়বে? তিনিও তো প্রধানতঃ শান্ত রসের উপাসক। তিনিও তো বৃহৎ, ব্যাপক, শান্ত, সংযত, সর্বজনীন এবং বিশ্বময় আত্মীয়তা আস্বাদনের কবি।

'ক্ল্যাসিক' কথাটির যথার্থ ইঙ্গিত বুঝে ওঠা অনেক চিন্তার কাজ। এ

আলোচনায় একটি কথা বড়োই সাহায্য করে। সে কথা আগেই বলা হয়েছে। ক্ল্যাসিক-স্বভাব আর 'ক্ল্যাসিক্‌স্'-এর [যার বাংলায় রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থনাম থেকে 'প্রাচীন সাহিত্য'-অভিধাই ব্যবহার করা যেতে পারে] বিশেষত্ব অভিন্ন নয়। গ্রীসে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে ঠিক যে ভাবাদর্শ থেকে প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যের উদ্ভব হয়েছিল, কিংবা আমাদের দেশে যে সহজ-সামর্থ্যের গুণে প্রাচীন ভারতীয় মন তার রামায়ণ-মহাভারত-এর মতো কাব্য সৃষ্টি করেছে সেই সব অতীত অবস্থার তো পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। তবু, পরের যুগের মানুষ এসে বিগত কালের স্পষ্টতায়, সংযমে, সৌন্দর্যে, শান্তিতে পুনরায় আশ্রয় পেতে চায়। তারই ফলে অতীতের অনুকরণ শুরু হয়। সেই অনুকরণের সাধক একদেশে দেখা দেয় মিল্টনের মূর্তিতে, অন্যদেশে দেখা দেয় মধুসূদনের মূর্তিতে। পণ্ডিতরা তাই এই অনুকৃত প্রাচীনতার নাম দিয়েছেন কৃত্রিম-ক্ল্যাসিক স্বভাব—Neo-Classicism। এই সব অনুকরণ-কারীদের সাধিত আদর্শের সঙ্গে সাহিত্যের যথার্থ-প্রাচীনতার তুলনা করে ওয়াল্টার পেটার জানিয়েছেন—

> "The charm of what is classical, in art or literature, is that of the well-known tale, to which we can, nevertheless listen over and over again, because it is told so well."

প্রাচীন গ্রীকদের কাছে বাইরের প্রকাশ্য মূর্তির নিখুঁৎ ভাব-রূপের বিশেষ দাম ছিল। সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা, সংযমের ওপর তাঁদের ছিল স্বভাবলব্ধ শ্রদ্ধা-বোধ। তাঁদের দেবমূর্তির সৌম্য, শান্ত, সামঞ্জস্যময় অভিব্যক্তির আদর্শ ছিল তাঁদের মনে। সেই বহিরঙ্গ-ঔচিত্যবোধই পরের যুগের অনুকরণশীল অন্য পরিমণ্ডলে পড়ে বহিরঙ্গ-বিধিসর্বস্বতায় পর্যবসিত হয়েছিল। অর্থাৎ বাল্মীকি যখন রামায়ণ লিখেছিলেন, তখন মহাকাব্যের আইনের বাঁধন নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় হয়নি। ফুল ফুটেছে বিশাল আকাশের নীচে,—চিরকালের মাটির বুকে। ফুলের বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছে সেই প্রাচীন অভ্যুদয়ের অনেক,—অনেক কাল পরে। ফুলের উপমাটি যখন গ্রহণ করা গেল, তখন আরো একটু এগিয়ে বিশেষ একটি ফুলের কথাই বলি। সাহিত্যের সত্যিকার

প্রাচীনত্ব-চিরন্তনত্ব শ্বেত-পদ্মের সঙ্গে তুলনীয়। তাতে দেখা যায় নিখুঁৎ দল-বিন্যাস, পরম সামঞ্জস্য, সরল চমৎকৃতি এবং সমারোহহীন, অনাড়ম্বর মহিমা! রোম্যান্টিক মন নতুনত্ব চায়, চমক চায়, নিজের মনের মধ্যে ডুব্‌তে ভালোবাসে। অপর পক্ষে, ক্ল্যাসিক সৃষ্টির নমুনা আছে প্রাচীন গ্রীসের প্রাচীনতম Doric স্তম্ভে। তার চেহারা দেখে তাক্ লাগে না,—মন শান্ত হয়। সে শুধু নিরলঙ্কৃত সামঞ্জস্যের অভিব্যক্তি। পুরোনো কালের গ্রীসেই তারপর আরো দুটি যুগ কেটেছে। প্রাচীনতম 'প্রাচীনতার' নিরাভরণ প্রশান্তি থেকে গ্রীক মন নেমে এসেছিল 'প্রাচীনতা'র মধ্য-যুগে। তার নিদর্শন আছে অল্প-অলঙ্কৃত 'আইওনিক' [Ionic] স্তম্ভে;—তারপর, আরো কিছু বেশি অলঙ্কারময় 'করিন্থিয়ান' [Corinthian] স্তম্ভে তার ক্রমপরিণতির এবং ক্রমপরিবর্তনের চিহ্ন আছে। তাকে বলা যায় আদি প্রাচীনতার অন্ত্য-পর্বের রূপ।

বাংলা নাটকের কথা

[সূচনা থেকে রবীন্দ্রযুগ-সূচনা অবধি বাংলার নাট্যধারা]

১৮৭২-এর আগে কলকাতায় কোনো স্থায়ী সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ছিলনা। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'-এর তখন বিশেষ খ্যাতির যুগ। কলকাতায় তখন শখের থিয়েটারের ছড়াছড়ি। বাগবাজার অঞ্চলে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' অভিনয় করেছিলেন 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'। বাগবাজারের এই অ্যামেচার থিয়েটারই নাম বদল করে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' হলো। 'ন্যাশনাল নামটি দিয়েছিলেন সেকালের জাতীয়তাবাদী কর্মী নবগোপাল মিত্র। শোনা যায়, তাঁর জাতীয়তাবোধের জন্যে তাঁকে সবাই ডাকতেন 'ন্যাশনাল নবগোপাল' নামে। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অভিনীতহয়,—'নীলদর্পণ' দিয়েই এই রঙ্গালয়ের দরজা খোলা হয়। টিকিট বেচে প্রবেশমূল্য নিয়ে অভিনয়-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গিরিশচন্দ্র ঘোষের আপত্তি ছিল। তিনি প্রথমে এ রঙ্গালয় পরিহার করেন। পরে, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে অবৈতনিক অভিনেতা হিসেবে পুনরায় সেখানেই ফিরে আসেন। বাগবাজারের এই দলের ওপর তাঁর মমতা ছিল। স্বজনদের মধ্যে তিনি ফিরলেন বটে, কিন্তু 'ন্যাশনাল থিয়েটার' ঐ বছরেই বন্ধ হয়ে গেল। ভাঙনের ফলে ন্যাশনাল থিয়েটারে দুটি দল দেখা দিলো—একদলের নাম হলো 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার'—অন্যদল আদি নামেই প্রতিষ্ঠিত রইলেন। কিছু দিন পরে আবার দু'দলে মিল হলো। প্রতিষ্ঠানটির নতুন নাম হলো 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'। গিরিশচন্দ্র এই 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের নাট্যাকারে পরিবর্তিত ক'খানি বইয়ের অভিনয় করেন। কিন্তু এখানেও তাঁর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতের মিল হলোনা শেষ পর্যন্ত। ১৮৮৩-তে তিনি 'ষ্টার থিয়েটার' স্থাপন করলেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর আগেই বাংলা দেশের রঙ্গমঞ্চে এবং নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগ উত্তীর্ণ হয়ে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে।

বাংলা নাটকের যথার্থ উৎস কোথা থেকে এ ভাবনা গবেষকদের বিস্তর ভাবিয়েছে। একদিকে সংস্কৃত নাটক,—অন্যদিকে বাংলা যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদি অল্প-বিস্তর নাট্যগুণান্বিত রচনা,—তৃতীয়তঃ, ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের আদর্শ, এই তিন আদর্শের কোন্‌টির কাছে বাংলা নাটক সর্বাধিক প্রেরণা পেয়েছে তা নিয়ে পণ্ডিতরা চিন্তা করেছেন।

অনেক কাল ধরে অনেক আলাপ আলোচনা চলেছে। অবশেষে এই সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়া হয়েছে যে, বাংলা নাটক প্রধানতঃ বাঙালীর দেশাত্মবোধ, সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা, ভক্তি-ভাবের উৎসাহ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত হয়ে এইসব ভাবের সঙ্গে-সঙ্গেই বেড়ে উঠেছে। আমাদের একালের যথার্থ দেশাত্মবোধ এক হিসেবে ইংরেজ-শাসনের ফল। বাংলা নাটকও ইংরেজি শিক্ষার ফলে দ্রুত ক্রমোন্নতির পথে এগিয়েছে। উনিশের শতকের মাঝামাঝি সময়েই আমাদের সাহিত্যে আধুনিক মর্জির প্রথম সূত্রপাত ঘটেছিল। মধুসূদন দত্তকে ডাকা হয়েছিল ইংরেজিতে একখানি বাংলা নাট্য-কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার লিখে দেবার জন্যে। তার একটু ইতিহাস আছে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটের জমিদার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের উদ্যোগে বেলগাছিয়া থিয়েটার-এর পত্তন হয়। সেখানে রামনারায়ণ তর্ক-রত্নের 'রত্নাবলী [শ্রীহর্ষের সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে লেখা] অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজ দর্শকদের সুবিধার জন্য মধুসূদন দত্তকে পূর্বোক্ত সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রচনার আমন্ত্রণ জানানো হয়। মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাস বসাক রাজাদের কাছে সেকালের কবিখ্যাতিহীন মধুসূদনের ইংরেজি বিদ্যার প্রশংসা করেছিলেন। ইংরেজি অনুবাদটি লিখে দিয়ে মধুসূদন পাঁচশ টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। কিন্তু 'রত্নাবলী' নাটকের মহড়ায় উপস্থিত থেকে মধুসূদন বড়োই হতাশ বোধ করেছিলেন। বন্ধু গৌরদাসকে তিনি চুপি-চুপি বলেছিলেন—"What a pity the Rajas should have spent such a lot of money on such a miserable play. I wish I had known of it before,—I could have given you a piece worthy of your Theatre!"—অর্থাৎ—হায়, হায়, এমন অপদার্থ একটা নাটকের জন্যে রাজারা অঢেল খরচ করছেন! আমি যদি আগে

জানতাম তাহলে তোমাদের থিয়েটারের উপযুক্ত একখানা নাটক লিখে দিতে পারতাম!

এই ঘটনার পরদিন সকালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি'তে গৌরদাস বসাকের সঙ্গে দেখা করে মধুসূদন কয়েকখানি সংস্কৃত এবং বাংলা নাটকের বই নিয়ে গেলেন। তারপর সপ্তাহ-দুয়েকের মধ্যেই নিজের লেখা একখানি নাটকের প্রথম কয়েকটি দৃশ্য পড়ে শোনালেন বন্ধু গৌরদাসকে। এই নাটকটির নাম 'শর্মিষ্ঠা'। নিজের বাংলা রচনার বিশুদ্ধি সম্বন্ধে তখনো তাঁর সংশয় কাটেনি। বন্ধুদের পরামর্শে তিনি পাণ্ডুলিপিটি রামনারায়ণের কাছে সংশোধনের জন্যে পাঠিয়েছিলেন। রামনারায়ণকে তিনি কিন্তু কেবল ব্যাকরণের ভুল শুধ্‌রে দেবার জন্যেই অনুরোধ করেছিলেন। তার বেশি আর কিছুই চাননি। রাম-নারায়ণের এবং সেকালের সংস্কৃত-ঘেঁষা বাংলা নাটকের প্রভাব অপসারণের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল। গৌরদাসকে তিনি জানিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তিনি সজ্ঞানেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন।—প্রাচ্য ভাব আছে বলেই কি টমাস মূরের কবিতা নিন্দনীয়?—কার্লাইলের গদ্যে জার্মান আদর্শ কে না দেখেছেন?—কার না ভালো লেগেছে?—বায়রনের কবিতাতে কি এশিয়ার হাওয়ার ছোঁয়া নেই?—আর, মনে রেখো বন্ধু গৌরদাস, আমি লিখ্‌ছি আমার দেশের পাশ্চাত্ত্য ভাবে উদ্বুদ্ধ মানুষদের জন্যে।—পাশ্চাত্ত্য ভাবে এবং পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় তাঁরা শিক্ষিত।—যা-কিছু সংস্কৃতে আছে, তাই ভালো, এই ধরনের মানসিক দাসত্ব মোচনের অঙ্গীকার আমার মনে রয়েছে!

মধুসূদন এই ভাবেই তাঁর মনের কথা বলে গেছেন।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। বইখানির 'প্রস্তাবনা' অংশে মধুসূদনের একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। নিদ্রিত ভারতবর্ষকে আহ্বান করে তিনি জানিয়েছিলেন—

"শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম-ঘোর হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।”

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে মধুসূদনের ‘শর্মিষ্ঠা’ অভিনীত হয়। পাইকপাড়ার সিংহদের বাগানবাড়ী ছিল বেলগাছিয়াতে। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১-এ জুলাই তারিখে সেইখানেই রামনারায়ণের ‘রত্নাবলী’ অভিনীত হয়। ১৮৬১-তে ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে সে নাট্যশালার দিনান্ত হয়।

কলকাতায় আধুনিক ধরনের প্রথম নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা হয় আঠারোর শতকের প্রায় শেষ প্রহরে। ১৭৯৫-এর ২৭ এ নভেম্বর হেরাসিম্ লেবেডেফ নামে এক রুশ ভদ্রলোক চৌরঙ্গি অঞ্চলে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেছিলেন। সেখানে কোনো মূল বাংলা নাটকের অভিনয় হয়নি। লেবেডেফ্-এর নাট্যশালার নাম ছিল ‘বেঙ্গলী থিয়েটার’। ‘The Disguise’ এবং ‘Love is the Best Doctor” নামে দুখানি ইংরেজি নাটকের বঙ্গানুবাদ করে নিয়ে লেবেডেফ্ সেগু’টি তাঁর রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। লেবেডেফের বেঙ্গলী থিয়েটার-এর আগেকার বাংলা নাটকের ইতিহাস মধ্যযুগের মধ্যেই গণ্য,—বাংলা রঙ্গমঞ্চও তথৈবচ। ভারতচন্দ্রের ‘চণ্ডী’-কে কেউ কেউ আঠারোর শতকের বাংলা নাটকের নমুনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারও আগে সহজ সংস্কৃত ভাষায় লেখা রূপ গোস্বামীর ‘চৈতন্যচন্দ্রোদয়’ নাটকের কথা বাংলার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে জায়গা পেয়েছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র যদি-ই বা বাংলা সাহিত্যের নাট্যসাহিত্য-রচয়িতাদের মধ্যে জায়গা দাবী করতে পারেন, রূপ গোস্বামী তা আদৌ পারেন না, কারণ তিনি বাংলায় লেখেননি। তাঁর বইখানির ভাষা সংস্কৃত।

যাত্রার আমলে কৃষ্ণযাত্রা, রামযাত্রা ইত্যাদি ধর্ম এবং পুরাণমূলক কাহিনীই ছিল প্রাচীন অবলম্বন। চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলীর সঙ্গে রায় রামানন্দের নাটকগীতি মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ‘পালা’-বিভাগে সাজানো সাহিত্য। আজকের ইংরেজি নাটকের

সঙ্গে আমাদের সেই পুরোনো কালের নাট্যসাহিত্যের তুলনা চলে না। কিন্তু ইংরেজিতেও নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল ধর্মানুরাগের সম্পর্ক মেনে নিয়ে। মধ্যযুগে সে দেশে গির্জায় উপাসনার কাজ হতো ল্যাটিন ভাষায়। জনসাধারণের কাছে ল্যাটিন ভাষা সহজবোধ্য ছিলো না। ধর্মের কথা যাতে সকলের প্রাণে গিয়ে পৌছুতে পারে, হয়তো সেই উদ্দেশ্যেই যাজকরা খ্রীষ্টের জীবনকাহিনীর বিশেষ-বিশেষ দৃশ্য নাট্যরূপে রূপায়িত করতে চাইলেন। খ্রীষ্টমাসের সময়ে খ্রীষ্টের জন্মোপাখ্যান অভিনীত হতো। ইষ্টারের সময়ে অভিনীত হতো যীশু খ্রীষ্টের অমর আত্মার পুনরুত্থান বা পুনরভ্যুদয়ের কাহিনী। প্রথম দিকে গির্জার ভেতরেই অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল। তারপর সেইসব অভিনয় যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠলো, তখন আর গির্জার ভেতরে স্থান সংকুলান হয় না। অগত্যা রঙ্গমঞ্চ উঠ্‌লো বাইরের খোলা জায়গায়। সংলাপের ল্যাটিন ভাষার দিন ফুরোলো। ইংরেজের দেশে ইংরেজি নাটকের সূচনা হলো। পাত্র-পাত্রীর আলাপের ভাষা হলো ইংরেজি। জনরুচির উৎসাহ পেয়ে ধর্মাশ্রিত নাট্যকলার যাত্রা শুরু হলো বিপুলতর সম্ভাবনার দিকে। অল্প কালের মধ্যেই দেখা দিলেন মার্লো,—শেক্‌স্‌পীয়র,—বেন্‌ জন্‌সন্‌। কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই এলেন বার্ণার্ড শ'।

ইংরেজি নাটকের তুলনায় বাংলা নাটকের বিবর্তনের বেগ তবু মন্দই বলতে হবে। ১৮৫০ নাগাদ বাংলা নাটকের সূত্রপাত ঘটেছিল ধরে নিলে বর্তমানে তার শ'খানেক বছর বয়স হয়েছে, সন্দেহ নেই। তবু সত্যিই বাংলা নাটক তেমন যেন বৈচিত্র্য অর্জন করেনি। অনেকে বলেন, আমাদের জীবনে নেই দ্রুত উত্থান-পতন,—নেই অপ্রত্যাশিতের আঘাত,—নেই সত্যিকার নাটকীয়তা। আমরা বেশি চিন্তা করি, কম ঘটনা ঘটাই! হয়তো সেই কারণেই আমাদের নাটকের গতিবেগ মন্থর। সেকথা ভাববার কথা। হঠাৎ কোনো মতামত দেওয়া যায়না। তবে, একটু ভেবে দেখলেই একথা মানতে হয় যে, আমাদের মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদের পরে সত্যিই নাটক আর বেশি দূর এগোয়নি। রবীন্দ্রনাথ অনেক রকমের নাটক-নাটিকা লিখেছেন, সেকথা সত্যি। রবীন্দ্রনাথের নাটক কিন্তু রবীন্দ্রনাথেরই বিশিষ্ট সৃষ্টি। বাংলার নাট্যসাহিত্যের ঐতিহ্য থেকে সে একেবারে পৃথক ব্যাপার। কিন্তু তাঁর কথা বাদ দিলে, পূর্বোক্ত প্রবীণদের

পরে উল্লেখযোগ্য নবীনের সংখ্যা বড়োই কম। দু'চারজন আছেন বটে,—মহেন্দ্র গুপ্ত, মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, বনফুল [বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়], বিধায়ক ভট্টাচার্য, অয়স্কান্ত বক্সী এবং আরো কার-কারও কথা মনে পড়ে। 'বহুরূপী' সম্প্রদায়ের বর্তমান বয়স মাত্র ন' বছর—প্রতিষ্ঠানটি যদিও সাত বছর হলো গড়ে উঠেছে। কর্ণধার শম্ভু মিত্র, অমর গাঙ্গুলি প্রভৃতি রসিক এবং উদ্যোগী ব্যক্তি। প্রসিদ্ধ অভিনেতার নামে যুগ-বিভাগের ভাবনা ভাবলে বাংলা নাটকের গৈরিশী যুগের বিস্তার ধরা যায় ১৯২০ অবধি—অর্থাৎ গিরিশ চন্দ্রের মৃত্যুর পরে আরো প্রায় আট বছর তাঁরই প্রভাব চলেছিল। তারপর ১৯২১-এ ম্যাডান সাহেবের 'Bengali Theatrical Company'-র রঙ্গালয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকের নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে শিশির-কুমার ভাদুড়ী প্রতিষ্ঠিত হলেন। ১৯২৩-এ ইডেন গার্ডেনের প্রদর্শনীতে দ্বিজেন্দ্রলালের 'সীতা'-তে তাঁর অভিনয় এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩০-এ শিশিরকুমার মার্কিন মুলুকে অভিনয় দেখিয়ে এলেন। ১৯২১ থেকে শিশির-কুমারের যুগ ধরে নিলে সে যুগের অবসান-কাল ধরতে হবে ১৯৪০-এর দশকে। রবীন্দ্রনাথ তখন চোখ বুজেছেন,—দেশে বিশ্বযুদ্ধের বিষফল ফলতে শুরু হয়েছে,—১৯৪৩-এ আমাদের বাংলা হিসেবে পঞ্চাশের মন্বন্তর ঘট্‌লো—তারপর সাম্প্রদায়িক কলহ, যুদ্ধোত্তর বেকারসমস্যা,—স্বাধীনতা-লাভ, দেশবিভাগ,—সময়ের মেঘ, ঝড়, বিদ্যুৎ! তারই মধ্যে শম্ভু মিত্রের 'বহুরূপী'-র উদ্ভব। 'বহুরূপী' নামটি গিরিশচন্দ্রের লেখা একটি প্রবন্ধ থেকে নেওয়া! বাংলা নাটকের ঐতিহ্যের ওপরেই এঁদের এই নবনাট্য আন্দোলনের আস্থা,—আর, দেশের সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তা-অর্থনীতির সমকালীন উদ্বেগই এঁদের নাট্যপ্রসঙ্গ। যাই হোক্, অতীতের ধারাটি এবার লক্ষ্য করা যাক্।

১৭৯৫-এর পরে ১৮২১ সালে অভিনীত 'কলিরাজার যাত্রা' নামে এক-খানি নাটকের খবর পাওয়া গেছে। ঐ সময়ে সংস্কৃত নাটকের বেশ কিছু-কিছু বঙ্গানুবাদের প্রচলন ছিল। তারপর ১৮৩১-এ শ্যামবাজার অঞ্চলে নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। বাংলা যাত্রার তখন খুবই চল্ ছিলো। লেবেডেফের মতো নবীনচন্দ্র বসুও ভাড়া-করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর সাহায্যে অভিনয় সম্পন্ন করিয়েছিলেন। তিরিশের

দশকেই প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর বাগানবাড়িতে 'হিন্দু-থিয়েটার' নামে একটি রঙ্গালয় স্থাপন করেছিলেন। এখানে কেবল ইংরেজি নাটকেরই অভিনয় হতো। 'সাঁসুসি থিয়েটার' [Sans Souci] নামে এই সময়ের আর এক নাট্যশালার কথা শোনা যায়। সে ছিল ইংরেজি নাট্যাভিনয়ের মঞ্চ।

গ্রামে যাত্রার মধ্যে,—সহরে শখের থিয়েটারে,—অস্থায়ী যুবসঙ্ঘ বা বিলাসী বিদ্যোৎসাহীদের হাতে লালিত হয়ে এইভাবে, মধুসূদনের আগেকার আমলের বাংলা নাটকের শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে পৌঁছে তার স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনা দেখা গেল।

১৮৪০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের বিস্তারের দিনে উমেশচন্দ্র মিত্র লিখেছিলেন 'বিধবা বিবাহ নাটক'। সে হলো পঞ্চাশের দশকের ঘটনা। ১৮৫৬-তে বিধবা-বিবাহ আইন বলবৎ হয়। বহুবিবাহ, সপত্নী-সমস্যা ইত্যাদি বিষয় নিয়েও সে যুগে অনেক নাটক-নাটিকা লেখা হয়েছে। বিবাহ-প্রসঙ্গের বাইরেও সমাজের আরো সব কুপ্রথা ছিল। সেসব প্রসঙ্গেরও ছায়া পড়েছে নাটক-রচনার মধ্যে। মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা', এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসন দুখানির মধ্যে তার পরিচয় আছে। এঁদের আগে এই ধারার ইতিহাস-খ্যাত প্রথম প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। ১৮৫৪-তে তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রকাশিত হয়।

কিন্তু বাংলার প্রথম ইতিহাস-খ্যাত নাটকের কথা বল্‌তে হলে রাম-নারায়ণের সমকালীন আর দু'জনের নাম করা দরকার। একজন যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত,—অন্যজন তারাচরণ শিকদার। প্রথম জনের 'কীর্তিবিলাস' এবং দ্বিতীয় জনের 'ভদ্রার্জুন' দুখানি বই-ই প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বাংলায় প্রথম বিষাদান্ত নাটক লেখার চেষ্টা করেছিলেন,— কীর্তিবিলাস' তারই নমুনা। ডক্টর সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, এতে ঈশ্বর গুপ্ত এবং শেক্‌স্‌পীয়র উভয়েরই প্রভাব আছে। তারাচরণের 'ভদ্রার্জুন' সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"ইহাই ইংরেজি আদর্শে রচিত প্রথম মৌলিক মধুরান্তিক বাঙ্গালা নাটক।...সংস্কৃত নাট্যরচনারীতির কোন উৎকট উল্লঙ্ঘন নাই।...ইংরেজি রীতি অনুসারে অঙ্ক বিভক্ত হইয়াছে "সংযোগ-স্থল-এ' অর্থাৎ দৃশ্যে।" সেন মহাশয়ের অনুমান অনুসারে শেক্‌স্‌পীয়রের

নাটকের প্রথম পূর্ণ বঙ্গানুবাদ লেখা হয়েছিল এই একই সময়ে। হরচন্দ্র ঘোষ [১৮১৭-১৮৮৪] Merchant of Venice-এর বঙ্গানুবাদ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' লিখেছিলেন ১৮৫২ সালের কাছাকাছি সময়ে। তিনি পরে আরো অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর 'চারুমুখচিত্তহরা নাটক' হলো Romeo and Juliet-এর দেশীয় সংস্করণ।

দেশের সমাজচিন্তা এবং বিদেশের সাহিত্যের প্রভাব—এই দুই সত্যের তাড়নাতেই আমাদের আধুনিক নাটকের প্রথম পরিচর্যার কাল এইভাবে অতিবাহিত হয়েছে। মধুসূদনের মধ্যে এই দুই লক্ষণেরই চিহ্ন দেখা গেছে। পুরোনো কালের সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ এবং অনুবাদের মর্জি দূর হয়নি তখনো। কালিদাসের নাটক অবলম্বনে প্রথম বাংলা নাটক লিখেছিলেন নন্দকুমার রায়। ১৮৫৫-তে তাঁর 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা' ছাপা হয়। এই ধারাতেই কালীপ্রসন্ন সিংহের নাম স্মরণীয়। ১৮৫৭-তে তাঁর 'বিক্রমোর্বশী নাটক' প্রকাশিত হয়,—১৮৫৯-এ তাঁর 'মালতীমাধব'। কালীপ্রসন্ন মৌলিক নাটকও লিখেছিলেন। ১৮৫৯-এ প্রকাশিত 'সাবিত্রী সত্যবান' তার দৃষ্টান্ত। তিনি শুধু সাহিত্যামোদীই ছিলেন না,—নাটকেও তাঁর ছিল বিশেষ উৎসাহ। তাঁর নিজের বাড়িতেই ছিল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ।

মধুসূদনের মধ্যে এই বিচিত্র ভাবনার সমাবেশ ঘটেছিল। তাঁর 'শর্মিষ্ঠা'-র কাহিনী মহাভারতের আদিপর্ব থেকে নেওয়া। ডক্টর সুকুমার সেন বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, সে নাটকে কালিদাসের প্রভাবের মাত্রা অল্প নয়। 'কৃষ্ণকুমারী'র কাহিনীর মূলে আছে গ্রীক আখ্যান—বিভেদকারী আপেলের গল্প। তাতেও সংস্কৃতের প্রভাব দেখা যায়। সেকালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' [১৭৭৯ শকাব্দ] প্রকাশিত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কৃষ্ণকুমারীর ইতিহাস' থেকেই মধুসূদন বোধ হয় তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের প্রেরণা পেয়েছিলেন। মধুসূদন মৌলিক নাটক এবং প্রহসন তো লিখেই ছিলেন। তাছাড়া রামনারায়ণের 'রত্নাবলী', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' এবং নিজের লেখা 'শর্মিষ্ঠা'-র বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তিনি।

মধুসূদনের পরে বাংলা নাটকের স্মরণীয়তম দ্বিতীয় নামটি হলো দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' [১৮৬০]। সমাজচিন্তার মধ্যেই রাষ্ট্রচিন্তার আশ্রয় আছে। 'নীলদর্পণে' সেই সমাজ-রাষ্ট্রের সংযুক্ত বোধের প্রকাশ দেখা গেল।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে দেশে তখন কৃষকসমাজ বিপন্ন,—নারীর মর্যাদা বিপন্ন। ডক্টর সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, নীলদর্পণের আগেই ১৮৫৬-তে 'বাপ রে বাপ! নিলকরের কি অত্যাচার' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। দীনবন্ধুর [১৮২৯-৭৩] 'নীলদর্পণ'-এর মধুসূদন-রচিত অনুবাদের প্রকাশক হিসেবে নাম ছাপা হয়েছিলো পাদ্রী লঙ্ সাহেবের। বিচারে তাঁর একমাস কারাদণ্ড আর হাজার টাকা জরিমানা হয়। সেই জরিমানার টাকা দিয়েছিলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সময়ে মারা যান। সেই দুর্যোগের দিনে বাংলার আকাশে বাতাসে, লোকের মুখে-মুখে একটি কবিতা শোনা যেতো—

নীল বানরে সোনার বাংলা করলে এবার ছারেখার
অসময়ে হরিশ মল, লঙের হল কারাগার।

দীনবন্ধুর ছিলো দুটি দিক। 'নীলদর্পণ'-এ তাঁর বাস্তব জীবনরস-স্বীকৃতির করুণ-কঠোর দিকটির প্রকাশ দেখা গেল। আর, 'নবীন তপস্বিনী,' 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'লীলাবতী', 'জামাই-বারিক' ইত্যাদির মধ্যে দেখা গেছে তাঁর কৌতুকরস আর ভাঁড়ামির সমাবেশ। তাঁর শেষ মৌলিক রচনার নাম 'কমলে-কামিনী নাটক' [১৮৭৩]। বইটিতে বিশেষ কোনো নাট্যগুণ নেই।

১৮৬০ থেকে ১৮৭৩, এই তের বছরের মধ্যে যথার্থ আধুনিক বাংলা নাটকের সূত্রপাত হয়েছিল। মধুসূদন এবং দীনবন্ধুর পরে এই যুগের তৃতীয় খ্যাতিমানের নাম মনোমোহন বসু [১৮৩১-১৯১২]। পৌরাণিক প্রসঙ্গ, ভক্তির ভাব এবং 'কথকতার বাক্যবয়ন'—মনোমোহনের বিষয়ে ডক্টর সুকুমার সেন এই তিনটি কথা বিশেষ ভাবে বলেছেন। মনোমোহনের এবং দীনবন্ধুর, উভয়েরই গুরু ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব পড়েছিল তাঁদের লেখাতে। মনোমোহনের 'রামাভিষেক নাটক' লেখা হয় ১৮৬৭-তে। সে সময়ে কলকাতা এবং ঢাকা দু'জায়গাতেই নাটকের বিশেষ আদর ছিল। 'রামাভিষেক' প্রথম অভিনীত হয় ঢাকা-তেই। অতঃপর 'প্রণয়পরীক্ষা নাটক', 'সতী নাটক', 'হরিশচন্দ্র নাটক' ইত্যাদি বহু বই লিখেছিলেন তিনি। 'প্রণয় পরীক্ষা' পৌরাণিক নয়, সামাজিক নাটক। মনোমোহনের কলম চলেছিল দুদিকেই।

দীনবন্ধু মৃত্যুর আগের বছরে, ১৮৭২-এর ডিসেম্বর মাসে জোড়াসাঁকোয় মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে প্রথম সাধারণের রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। আগের যুগে নাটকে রাষ্ট্র-চিন্তার যে অঙ্কুর দেখা গিয়েছিল দীনবন্ধুর নীলদর্পণে, সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার পরে সে চিন্তার আরো ব্যাপকতা ঘট্‌লো। নবগোপাল মিত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। তাঁর জাতীয়তাবোধের কথা এই সূত্রে পুনরায় স্মরণীয়। বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'ও ১৮৭২-এ প্রথম ছাপা হয়। ১৮৭২-৭৩ থেকে বাংলা নাটকে সেই জাতীয়তা-আন্দোলনের ঢেউ লাগলো। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের [১৮৪৮-১৯২৫] নামটি এই পর্বের প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের [১৮৪৪-১৯১২] সঙ্গেই বন্ধনীভুক্ত হওয়া উচিত। এই পর্বের তৃতীয় স্মরণীয় ব্যক্তি রাজকৃষ্ণ রায় [১৮৪৯-৯৪]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম'-এর [১৮৭৪] মধ্যে স্বাদেশিকতার কথা শোনালেন। 'পুরুবিক্রম'-এর আগে বেরিয়েছিল তাঁর একাঙ্ক প্রহসন 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' [১৮৭২]। এটি সেকালের ব্রাহ্মসমাজের কিছু-কিছু বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে কটাক্ষ। ইতিহাসের ধারা অনুসারে খুঁটিয়ে দেখলে মধুসূদনের পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথই বাংলা নাটকে প্রথম ব্যাপক পাশ্চাত্ত্য প্রভাব স্বীকার করেছিলেন বলা উচিত। তাঁর সরোজিনী নাটকে [১৮৭৫] ইউরিপিডিসের Iphigenia at Aulis-এর ছায়া পড়েছে,—তাঁর 'হঠাৎ নবাব' প্রহসনে [১৮৮৪] ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের-এর অনুসৃতি দেখা যায়। তাছাড়া অনেক সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করেছিলেন তিনি। দু'একখানি ইংরেজি নাটকেরও অনুবাদ করে গেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। মধুসূদনের মতোই বহুবিচিত্র সাহিত্য পাঠের অভ্যাস ছিল তাঁর। অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' বইখানির মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী'-র লক্ষ্মণ সিংহের সঙ্গে মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'-র ভীমসিংহের সাদৃশ্যের কথা বলেছেন। অজিতকুমার আরো একটি সুন্দর ইশারা করেছেন—

> "মালিয়রের Marriage Force' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ' নাম দিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই প্রহসনের অন্তর্গত ন্যায়রত্ন এবং বেদান্তবাগীশের দৃশ্য দুইটি লেখকের রসজ্ঞ মৌলিকতার পরিচায়ক। এই ধরণের জ্ঞানী পণ্ডিতদিগের

নির্বুদ্ধিতা লইয়া পরবর্তীকাল রবীন্দ্রনাথ অনেক কবিতা ও নাটক প্রহসন রচনা করিয়াছেন।”[১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘পুনর্বসন্ত’ [প্রথমে ‘মানময়ী’ নামে ১৮৮০-তে রচিত পরে ১৮৮৭-তে বর্ধিতায়তন] নাটকে শেক্‌স্‌পীয়রের A Mid-Summer Night’s Dream-এর ছায়া পড়েছিল। ‘মানময়ী’-তে, ‘অশ্রুমতী’-তে [১৮৭৯] জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের গান ব্যবহার করেছিলেন।

১২৮৩ [ইং ১৮৭৬] বঙ্গাব্দের 'বান্ধব' পত্রিকায় 'নাটক' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখেছিলেন—“আধুনিক নাটক প্রধানত তিন শ্রেণীর—[১] দেশ-হিতৈষতা প্রাসঙ্গিক, [২] অনুবাদমূলক, [৩] প্রণয়-জীবন নাটক।” এই শ্রেণীবিভাগের দৃষ্টান্ত হিসেবে যে-সব নাটকের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, আজকের পরিবর্তিত রুচিতে তার মধ্যে বেশির ভাগই অপাঠ্য মনে হবে। সে যুগে বহু নাটক লেখা হয়েছে, কিন্তু বলা বাহুল্য, সেসব রচনার অধিকাংশই আবর্জনা। গবেষকের দৃষ্টিতে কিছুই হয়তো তুচ্ছ নয়। সেই তুচ্ছ স্তূপের মধ্যে রসিকের মন বিচক্ষণ পথ প্রদর্শকের পরামর্শ চেয়ে থাকে। সেইসব বিচক্ষণ ব্যক্তি কালের পরিচয় দিয়ে যান, সেই সঙ্গে ভালো-মন্দ মন্তব্যও উহ্য রাখেন না। কালীপ্রসন্ন সেই বিচক্ষণ দৃষ্টিতে সব দেখে-শুনে সেকালের নাটকের বিষয়গত শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে বলেছিলেন—

> “এখন আমাদের যেরূপ জাতীয় স্বভাব, আর যেরূপ এলায়িত ভাষা, ইহাতে উৎকৃষ্ট কাব্য নাটকের উৎপত্তি হওয়াই অসম্ভব। ভাল প্রহসন হইতে পারে, তাহাই হইয়াছে। মধুসূদন, রাম-নারায়ণ, দীনবন্ধু ইঁহারা সকলেই প্রহসন লেখক। প্রহসনে বাঙ্গালা অদ্বিতীয়। আধুনিক বাঙ্গালা নাটকে কেবল দুই একখানি ব্যতীত সকলই অসার।”

‘গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য’ বইখানির মধ্যে কুমুদবন্ধু সেন গিরিশ-চন্দ্রের নিজের বিশেষ একটি কথা স্মরণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রের নাট্য-রচনার সূত্রপাত হয় নিতান্তই প্রয়োজনের তাড়নায়। বাজারে তখন নাকি

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস [দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬২ ; পৃঃ ১১৮]

অভিনয়যোগ্য বাংলা নাটকের বড়োই ঘাট্‌তি চলছিল। গিরিশচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা নাটকের স্রোত প্রসারিত হয়েছে। ধর্ম, পুরাণ, সমাজ, ইতিহাস—সকল বিষয়েই তিনি ছিলেন অক্লান্ত, অধ্যবসায়ী নাট্যকার।

প্রথম পর্বে 'মুকুটাচরণ মিত্র', 'রামতারণ সান্যাল' এই দুটি ছদ্মনামে গিরিশ চন্দ্র 'অপেরা' জাতীয় রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সময়েই বঙ্কিম মধুসূদন, দীনবন্ধুর বই তিনি নাট্যরূপায়িত করেন। তারপর তাঁর মৌলিক নাটকের কাল। ১৮৮১-তে তাঁর প্রথম পৌরাণিক নাটক 'রাবণবধ' এবং তথাকথিত প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'আনন্দরহো' লেখা হয়। তাঁর শ্রেষ্ঠ বিষাদান্ত গার্হস্থ্য নাটক 'প্রফুল্ল' লেখা হয় ১৮৮৯ সালে। প্রসিদ্ধ পৌরাণিক নাটক 'জনা' দেখা দেয় আরো বছর পাঁচেক পরে—১৮৯৪ সালে।

গিরিশচন্দ্রের প্রধান কীর্তি তাঁর রচনার প্রাচুর্য। একদিকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সান্নিধ্য, অন্যদিকে জন্মগত নাট্যানুরাগ—এই দুই ভাবোচ্ছ্বাসের দোলায় চির-দোদুল্যমান গিরিশচন্দ্র মানুষটি ছিলেন বিভোর অভিনেতা,—প্রগল্‌ভ লেখক। তাঁর সমকালীনদের মধ্যেই অমৃতলাল বসু [১৮৫৩-১৯২৯] ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ [১৮৬৪-১৯২৭] প্রভৃতি নাট্যকারদের নাম স্মরণীয়। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা' ছাপা হয়েছে [১৮৮১]। 'কালমৃগয়া' দেখা দিলো তার পরের বছর। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ', 'নলিনী', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদির পরে তাঁর 'রাজা ও রানি' যখন ছাপা হয়, পাঁজির হিসেবে সে হলো শতাব্দীর শেষ দশকের সূত্রপাত [১৮৮৯]। অমৃতলালের নাটক তখন প্রতিষ্ঠিত। বাংলার নাট্যলোকে ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল উভয়েই তখন সদ্য-সমাগত।

বাংলায় একালের প্রধান সাহিত্য-প্রকারগুলির মোটামুটি একটা ধারা-বিবরণী দেখা গেল। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের পঞ্চাঙ্গ বা পঞ্চ-প্রকার বল্‌লে উপন্যাস, কবিতা, নাটক, ছোটোগল্প এবং প্রবন্ধের কথাই বুঝতে হবে। প্রবন্ধের কথা অন্যত্র আলোচনা করেছি।[২] ছোটোগল্পই বয়সে সর্বকনিষ্ঠ। অনেকক্ষণ বর্তমানের কথা ভাবা গেল। ছোটোগল্পের প্রসঙ্গে যাবার আগে আমাদের অতীতের কথা সংক্ষেপে একবার ভেবে নেওয়া যাক্‌। দেশের অতীতের দিকে চোখ ফেরানো যাক্‌।

২। সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি [প্রথম পর্যায়]

বাংলা দেশের এবং বাংলা ভাষার আদিকথা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

'ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি!'

ভারতবর্ষের মানচিত্রে পূবদিক ঘেঁষে হিমালয়ের কোল থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত এই বাংলা দেশ,—এখানকার মাটি উর্বর, প্রকৃতি স্নেহময়ী, ইতিহাস বহুতরঙ্গসঙ্কুল। বাঙালী জাতের সামগ্রিক মনটি একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখলে মনে হয়, সে যেন বিশাল এক নদী, তাতে কতো ঢেউ-এর ওঠা-পড়া, কতো তীরের ভাঙা-গড়া কতো কাল থেকে ইহকাল পর্যন্ত চলে আসছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য সাহিত্যের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত হলো বেদ। বেদের বিখ্যাত চারটি ভাগের নাম যথাক্রমে, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। বেদের উপসংহার অংশের নাম ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের উপসংহার যে অংশে লেখা আছে, তার নাম আরণ্যক। প্রাচীন ভারতে অরণ্যাশ্রমে গুরুর কাছে শিষ্যেরা যে সব উপদেশ পেয়েছিলেন, আরণ্যক-সাহিত্যে তাই লেখা আছে। ঐতরেয়-আরণ্যক এই প্রসিদ্ধ বৈদিক সাহিত্যেরই অন্তর্ভুক্ত রচনা। তাতে 'বঙ্গ' কথাটির উল্লেখ দেখা যায়। বৈদিক সাহিত্য বহুকালের পুরোনো জিনিস। ঋগ্বেদ সর্বসমেত ১০২৮টি দেবারাধনামূলক সূক্ত বা স্তোত্রের সংকলন। ঠিক্ কোন্ সময়ে যে এগুলি সংকলিত হয়েছিল, তা নিশ্চিত জানা যায়নি বটে, তবে পণ্ডিতরা অনেক রকম অনুমান করেছেন। একদল পণ্ডিত এই সংকলনের তারিখ খ্রীষ্টজন্মের চার পাঁচ হাজার বছর আগে পেছিয়ে দেবার পক্ষপাতী। অন্যদল আবার খ্রীষ্টজন্মের আরো কাছাকাছি সময়ে সেই তারিখটি এগিয়ে আনতে চেয়েছেন। তবে, যতো টানাটানিই করা যাক্ না কেন, খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ হাজার দেড়েক বছর আগে যে ঋগ্বেদ সংকলিত হয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর ঋগ্বেদের সংকলনকাল খ্রীষ্টজন্মের ১৫০০ বছর আগে ধরে নিলে আরণ্যকগুলির রচনাকাল এসে পড়ে আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এ হলো আধুনিকতর পণ্ডিতদের অভিপ্রায়। প্রাচীনরা এই সময়-কল্পনাতে সায় দিতে রাজী নন।

'বঙ্গ', 'রাঢ়', 'সুহ্ম', 'পৌণ্ড্র', 'বরেন্দ্র', 'গৌড়', ইত্যাদি শব্দগুলি বাংলা দেশের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হতো। প্রাচীনকালে 'বঙ্গ' শব্দটি বর্তমান দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ বুঝিয়েছে। 'রাঢ়' এবং 'সুহ্ম' ছিল পশ্চিম বঙ্গের নামান্তর; 'পৌণ্ড্র' [প্রাচীন পুণ্ড্র-জাতির নাম থেকে] এবং 'বরেন্দ্রভূমি' কথাদুটি উত্তর বঙ্গের সম্পর্কে এবং 'গৌড়' শব্দটি কখনো কখনো উত্তর বঙ্গের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হলেও পূর্ববঙ্গবর্জিত সারা বাংলা দেশের অর্থেও ও-কথার ব্যবহার ছিলো। সপ্তম শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের কাছা-কাছি কর্ণসুবর্ণ ছিল গৌড়ের রাজধানী। বাংলার পাল ও সেন রাজারা 'গৌড়েশ্বর' উপাধিতে পরিচিত ছিলেন। আবার 'সমতট' এবং 'হরিকেল' নাম দুটিও কখনো সারা বাংলাদেশের অর্থে, কখনো বা বিশেষ-বিশেষ অঞ্চল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় 'সমতট' সারা বাংলার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। যাই হোক্, হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে [দ্বাদশ শতক পর্যন্ত] বর্তমান পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমগ্রতাবোধক বিশেষ কোনো নাম ছিল না।

বাংলা মায়ের বন্দনায় বাঙালী কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঐ যে লিখেছিলেন, 'গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি' সেকথা সত্যলেশহীন কবিকল্পনা নয়। আমাদের দেশ নদীমাতৃক। গঙ্গা, মেঘনা, পদ্মা, সরস্বতী ইচ্ছামতী, ময়ূরাক্ষী, দামোদর, ব্রহ্মপুত্র—অসংখ্য নদনদীর অজস্র স্নেহধারায় এদেশের মাটি চিরসিক্ত। প্রাচীন আর্যজাতি ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে পাঞ্জাবের সিন্ধুনদের উপকূলে প্রথমে বসতি স্থাপন করেন, তারপরে ক্রমশঃ গঙ্গার ধারা অনুসরণ করে তাঁরা পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েন। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। বাংলার আদিবাসীরা আর্য ছিলেন না। প্রথমে বরেন্দ্রভূমিতে অর্থাৎ উত্তর বঙ্গে,—তারপর, রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগীরথী-দামোদরের তীরে তীরে আর্যদের উপনিবেশ স্থাপিত নয়। রামায়ণে আর্যজাতির গঙ্গা দর্শনের আনন্দের কথা লেখা আছে। অযোধ্যাকাণ্ডে গাঙ্গেয় প্রদেশের সৌন্দর্যের বর্ণনা দেখে সহজেই বোঝা যায় যে সেকালে আর্যজাতি এই নদীর টানে বিশেষ মুগ্ধ হয়েছিলেন। মুগ্ধ হয়ে তাঁরা পূবদিকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছিলেন।

তাঁরা আসবার আগে এদেশে আর্যেতর জাতির বাস ছিলো। সেই প্রাচীন অধিবাসীদের বলা হয় অনার্য; অনার্য মানে সব ক্ষেত্রে অসভ্য

নয়। সে অর্থ পরে দেখা দিয়েছে। প্রাচীন কালে আর্য-অনার্যের মধ্যে ঠিক কতো বছর ধরে যে মিশ্রণ ঘটেছিলো তা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে, সে ঘটনা যে দীর্ঘকালের ব্যাপার, তাতে সন্দেহ নেই। আর্যজাতির যে শাখাগুলি সিন্ধু-উপকূলের আদিম ভারতীয় আর্যবসতি পরিত্যাগ করে পূর্বদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের আচার-ব্যবহার নতুন দেশকালের প্রভাবে বহু পরিমাণে বদলে গিয়েছিল। মূল গোষ্ঠীর সঙ্গে আচারব্যবহারের পার্থক্য ঘটায় তাঁদের বলা হতো 'ব্রাত্য' অর্থাৎ পতিত। বৈদিক যুগে বাংলা দেশে এরকম ব্রাত্য আর্যের সংখ্যা ছিলো নগণ্য। মৌর্যযুগে জৈনধর্মাবলম্বী ব্রাত্য শ্রেণী মগধ বা বিহার থেকে দলে দলে বাংলায় প্রবেশ করলেন। উত্তর বঙ্গে এঁদের বসতি ক্রমশঃ ঘন হয়ে উঠলো। রাঢ় ও সুহ্ম প্রদেশের দুর্গম রাস্তা পেরিয়ে যেতে এঁদের আরো কিছু সময় লেগেছিল। 'বঙ্গ' অর্থাৎ 'পূর্ববঙ্গ' বহুদিন অবধি এঁদের কাছে অনাবিষ্কৃত দুরধিগম্য স্থান ছিলো। এখন যেখানে হুগলী-হাওড়া-চব্বিশ পরগণা এই তিনটি জেলা কলকারখানা, অপিষ-আদালত, ধানক্ষেত-রেলপথ এবং জনবহুল নানা বসতি নিয়ে একালের নগরপ্রতাপাধীন, রাজনীতিবিক্ষত পশ্চিম বাংলার হৃৎপিণ্ডের মতো দিবারাত্র হাঁপাচ্ছে, ভাব্‌তে আশ্চর্য মনে হয় যে, অনেক দিন আগে এখানে ছিলো শুধু নীল সমুদ্রের ঢেউ। তারপর পলি-মাটির স্তূপ জমে জমে সাগরের তট দেখা দিয়েছে। সেই চরে গাছপালা গজিয়ে উঠেছে। এসেছে মানুষ। কোন্ জাতির মানুষ? আজ এতোকাল পরে তার কি নির্ভুল হদিস মিলবে?

শোনা যায়, আমাদের এই দেশে প্রথমে এসেছিল কালো রঙের খর্বাকার, চেপ্টা নাকওলা নিগ্রোবটুর দল। এদের ঠোঁট ছিলো পুরু-পুরু, মাথার চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া। এরা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আফ্রিকা থেকে বেলুচিস্থানের উপকূল হয়ে ভারতে এসেছিলো। পাথরের অস্ত্র বানিয়ে, শিকার করে এরা জীবন যাপন করেছে। উত্তর-পশ্চিমে আর্য সভ্যতার ধাক্কা খেতে-খেতে জলপথে বাংলা-আসাম ঘুরে এরা ছড়িয়ে পড়েছিল আন্দামানে, মালয়ে,—আরো, আরো এগিয়ে দ্বীপময় ভারতের কোণে-কোণে। তারপর, বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মতো চেহারার একদল লোক এখানকার মাটি মাড়িয়ে গেছে। এদেরও গায়ের রঙ ছিলো কালো, নাক চেপ্টা, আর কপাল লম্বা ধরণের। এই দলের নাম

Proto Australoid। তারপর এসেছিলো Austric বা দক্ষিণের মানুষ। বাংলা দেশের কোল বা মুণ্ডা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত সাঁওতালীরা এই দলেরই উত্তরাধিকারী। বাংলা ভাষায় এই Austric জাতির ভাষার অনেক চিহ্ন রয়ে গেছে। অথচ বাংলা আর্যভাষাসম্ভূতা, আর অষ্ট্রিক জাতির ভাষা অনার্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এখন আমাদের ভাষায় কম্বল, ফল, কদলী, তাম্বুল প্রভৃতি শব্দ বেশ চলে গেছে। পণ্ডিত প্‌শিলুস্কি দেখিয়েছেন, যে এগুলি মূলতঃ কোল ভাষার সম্পত্তি। কালে-কালে লোকমুখে চল্‌তে চল্‌তে সংস্কৃত ভাষায় এদের জায়গা হয়ে গেছে। আর্যভাষার সঙ্গে অনার্য ভাষার মিশ্রণের কথাই যখন উঠলো তখন বাংলার ওপর দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের কথাও মনে রাখা দরকার। দ্রাবিড়ভাষীরা ভারতে আর্য-আগমনের অনেক আগে দক্ষিণপূর্ব ইউরোপ, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ইত্যাদি অঞ্চল ঘুরে এসেছিল। ভারতের বৈদিক সভ্যতার বহু পূর্ববর্তী, খ্রীষ্টজন্মের প্রায় হাজার পাঁচেক বছর আগেকার এবং মিশর, আসিরিয়া, ব্যাবিলনের সভ্যতার সমকালীন যেসব নিদর্শন মোহেন-জো-দাড়োতে এবং হরপ্পায় পাওয়া গেছে, সেসব কীর্তি বোধ হয় এই দ্রাবিড় ভাষী প্রাক্-আর্যদলেরই মহিমা প্রচার করছে। ভারতের উত্তর পশ্চিমের গিরিপথ অতিক্রম করে হিন্দু সভ্যতার স্রষ্টা ও প্রবর্তক আর্যদল যখন সিন্ধুনদের উপকূলে পৌঁছেছিলেন তখন সারা উত্তর ভারতে পাশাপাশি দুটি পৃথক গোষ্ঠীর ভাষার প্রচলন ছিলো। একটি অষ্ট্রিক, অন্যটি দ্রাবিড়। আর্যভাষার আবির্ভাবে এই দুই ভাষাই নিজেদের প্রাধান্য হারিয়ে ফেলে। ভারতবর্ষে এখন আর অষ্ট্রিক ভাষার প্রাধান্য নেই, তবে দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় ভাষার প্রতাপ এখনো সর্বময়।

বাংলা দেশের বাইরে বৃহৎ ভারতবর্ষে যাই ঘটুক না কেন, ঐতিহাসিক কালের মধ্যে বাংলা দেশের মধ্যে যথাক্রমে জৈনমতের পরে বৌদ্ধমত,—তারপর, ব্রাহ্মণ্য মত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে উত্তরবঙ্গে জৈন শ্রমণরা বাস করেছেন। বরেন্দ্রভূমির অন্তর্ভুক্ত পাহাড়পুরের ধ্বংসস্তূপে প্রাচীন জৈনবিহারের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সম্রাট অশোকের সময়ে বৌদ্ধধর্ম এদেশে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সে সময়ে ব্রাহ্মণ্য মত যে এদেশে আদৌ ছিল না, এমন নয়। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার হয় গুপ্তযুগে। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য—তিনমতের ত্রিধারা পাশাপাশি

বয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও রাজারাজড়ার প্রাচীন অনুশাসন প্রভৃতি থেকে দেখা গেছে যে, এসময়ে ধর্মবিশ্বাস সম্বন্ধে দেশে বেশ ঔদার্য এবং সহিষ্ণুতা ছিলো।

খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচ-ছশো বছর আগে উত্তরবিহারে বৈশালীর কাছে জৈনধর্মের প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর জন্ম গ্রহণ করেন। প্রায় একই সময়ে কিংবা হয়তো অল্প কিছুদিন পরে কপিলবস্তু নগরে শাক্যবংশে শুদ্ধোদনের পুত্র সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। এঁরা দুজনেই ছিলেন ক্ষত্রিয়কুমার—দুজনেই বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধী। ঐতিহাসিকদের মতে মহাবীরের মৃত্যু হয়েছিলো খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে সম্ভবতঃ ৫২৭-২৮ থেকে ৪৬৮-র মধ্যে; আর, বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ বা লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটেছিলো খ্রীষ্টপূর্ব ৪৮৬ বা ৪৮৩ অব্দে। জৈন ধর্ম বর্তমান ভারতবর্ষেও বহু-লোকের উপাস্য। আর, বৌদ্ধ ধর্ম দেশে তো বটেই, তাছাড়া এখন ভারতের বাইরে চীনে, জাপানে, সিংহলে বেঁচে আছে।

সম্রাট অশোক ছিলেন মৌর্যবংশের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা। খ্রীষ্ট-জন্মের প্রায় শ'তিনেক বছর আগে তিনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার আগে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার সিন্ধুনদের কাছে পুরু-র রাজ্য আক্রমণ করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন সম্রাট বিম্বিসার। বিম্বিসারের পরে তাঁর ছেলে অজাতশত্রু,—তারপর দর্শক,—তারপর উদায়ী রাজা হয়েছিলেন। উদায়ীর পরে ইতিহাসের ধারা অন্ধকার। তারপর সে রাজ্যের সিংহাসনে বসেছিলেন মহাপদ্মনন্দ এবং পর পর তাঁর আট ছেলে। তক্ষশীলার ব্রাহ্মণ চাণক্যের নেতৃত্বে অতঃপর মৌর্য বংশের সূত্রপাত ঘটেছে। সেই বংশের প্রথম সম্রাটের নাম চন্দ্রগুপ্ত। তারপর বিন্দুসার,—বিন্দুসারের পরে অশোক। সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা জয় করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে পাহাড়ের গায়ে পাথরে পাথরে তিনি যেসব অনুশাসন লিখিয়েছিলেন তার মধ্যে অনেকগুলিতেই সেকালের ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হয়েছিল। তার অনেক পরে গুপ্তদের পতনের পরবর্তী পূর্বভারতে 'কুটিল লিপি' প্রবর্তিত হয়। সেই কুটিল লিপি থেকেই বাংলা প্রভৃতি পূর্বী ভাষার লিপি দেখা দিয়েছে। দশম শতকে কিছু কিছু বাংলা হরপের নমুনা চালু হয়েছিল। পালবংশের প্রথম-মহীপাল তখন দেশের শাসক। দিনাজপুরের

বানগড়ে তাঁর তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। সে যাই হোক্,—অশোক যে বংশে জন্মেছিলেন, সেই মৌর্যবংশের শাসন লোপ পায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৭ অব্দে। তারপর পরপর শুঙ্গ-কাণ্ব-সাতবহন ইত্যাদি বংশের ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভারতের উত্তরদিকে রাজত্ব করে গেছেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কিছুদিন গ্রীক শাসনও প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারপর শক, পহ্লব, কুষাণ বংশের শাসন চলেছে। খ্রীষ্টজন্মের ৭৮ বছর পর থেকে শকরাজা শালিবাহনের স্মৃতিবাহী শকাব্দ গণনা করা হয়। তারও প্রায় শ'দুয়েক বছর পরে চতুর্থ শতকের গোড়ায় বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত প্রাচীনতম ঐতিহাসিক রাজবংশ গুপ্তদের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

খ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত পাঁচ-ছশো বছর এ দেশে সংস্কৃতের কন্যাস্থানীয়া প্রাকৃত শ্রেণীর ভাষার চল ছিলো। গুপ্ত-সম্রাট কুমার গুপ্তের সমসাময়িক [পঞ্চম শতকের] একখানি তাম্রশাসন এবং এ রকম আরো কিছু কিছু প্রাচীন দলিল আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব দলিলে 'কণামোটিকা', 'হাড়ীগাঙ', 'নড়জোলী' প্রভৃতি স্থানবাচক যে-সব নাম পাওয়া গেছে, সেই সব নামের মূলে দ্রাবিড় ও কোল ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। সুতরাং বাংলাদেশের জনসাধারণের মুখে সংস্কৃতের প্রদৌহিত্রী বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রচলনের পূর্বে এদেশে আর্যেতর কোল ও দ্রাবিড় ভাষারই যে ব্যবহার ছিলো, সে-বিষয়ে পণ্ডিতদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের প্রদৌহিত্রী কেন? সেকথা পরের অনুচ্ছেদে বলা হচ্ছে।

মগধ দেশ থেকে জৈনধর্মাবলম্বী ব্রাত্য আর্যরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মগধ-দেশে যে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিলো, সেই মাগধী প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখে গেছেন বররুচি। তিনি সম্ভবতঃ কালিদাসের সময়েই চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে বিদ্যমান ছিলেন। বররুচি যে ভাষায় মাগধীর আইন-কানুন লিখে গেছেন, সে ভাষা সাহিত্যের ভাষা, লোকমুখের নয়। তারই বিকৃত, কথিত যে রূপ সে-সময়ে পূর্বভারতে কাশী-বিহার অঞ্চলে বলা হতো, বাংলাদেশের তৎকালীন আর্যভাষা হিসেবে সেই মাগধী প্রাকৃতই বোধ হয় মর্যাদা পেয়েছিলো। মাগধী-প্রাকৃত ভেঙ্গে মাগধী-অপভ্রংশ এবং সেই অপভ্রংশ ভেঙ্গে কালক্রমে আমাদের বাংলা ভাষার উদ্ভব

ঘটেছে। সুতরাং সংস্কৃত থেকে বাংলা চার পুরুষের ব্যবধান। সংস্কৃতের কন্যা-স্থানীয়া হলেন মাগধী প্রাকৃত, দৌহিত্রী মাগধী অপভ্রংশ,—প্রদৌহিত্রী হলেন আমাদের এই বাংলা ভাষা। এ ভাষা যে-দেশের মনের কথা যুগ-যুগান্ত ধরে বয়ে নিয়ে চলেছে সে দেশের রাজলক্ষ্মীর ওঠা-বসার পুরোনো তথ্যগুলো একবার খুঁজে দেখা যাক্।

প্রাচীন ভারতের বিশাল গুপ্ত-সাম্রাজ্যের রাজা চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারত পরিভ্রমণে এসেছিলেন। ৪০৫ থেকে ৪১১ খ্রীষ্টাব্দ—এই ছ'বছর তাঁর পরিভ্রমণ-কাল। ফা-হিয়েনের লেখা ভ্রমণকথা থেকে জানা যায় যে, সে-সময়ে তাম্রলিপ্তি বা তমলুক ছিলো প্রধান সামুদ্রিক বন্দর—এই বন্দর থেকে যবদ্বীপে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা ছিলো। সে সময়ে যবদ্বীপ ছিলো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র। বাংলার তমলুকের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতের এই সুপ্রাচীন লেনদেনের সম্পর্কটি সময়ের নানা ঢেউয়ের ওঠাপড়ায় কতোকাল আগে যে ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেছে, আজ তার অভ্রান্ত হদিস মিলবে কি? তবে আধুনিক বাঙালী কবিদের রচনায় তাম্রলিপ্তি বা তমলুকের সেই বিলুপ্ত মহিমার স্মৃতি এখনো স্পন্দিত হচ্ছে। ঐতিহাসিক সেকথা ভোলেননি।

চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের [৩৮০-৪১৩ খ্রীঃ] আগেকার রাজার নাম সমুদ্র গুপ্ত। তাঁর আগে ছিলেন সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। তাঁরও আগে ঘটোৎকচ গুপ্ত। ঘটোৎকচের পূর্ববর্তী শ্রীগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের শেষে কিংবা চতুর্থ শতকের শুরুতে সম্ভবতঃ বরেন্দ্রে তাঁর রাজধানী ছিল। পরে পাটলিপুত্রে গুপ্তদের রাজধানী ছিলো। খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে গুপ্তাব্দ বা গুপ্ত-সংবৎ-এর প্রবর্তন ঘটেছিলো। চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের পরে তাঁর ছেলে প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসন পেয়েছিলেন। পুষ্যমিত্র নামে এক দুর্দান্ত জাতির আক্রমণে তাঁর সাম্রাজ্য এক সময়ে বিশেষ বিপন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুর পরে পুষ্যমিত্রবিজেতা স্কন্দগুপ্ত যখন সাম্রাজ্য হাতে পেলেন তখন মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ হূণশক্তি গুপ্তসাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আক্রমণ করেছে। শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচ গুপ্ত, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত —এই নামমালার মহিমার দিন গেছে মোটামুটি চতুর্থ ও পঞ্চম খ্রীষ্টীয় শতকে। পঞ্চম শতকে বাংলাদেশ ছিল এই গুপ্ত রাজবংশের প্রভাব অধীনে।

স্কন্দগুপ্তের হাতে হূণশক্তির পরাজয় ঘটলেও পরবর্তী গুপ্তসম্রাটদের রাজত্বকালে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষদিকে হূণ দস্যুর বর্বর পুনরাক্রমণে গুপ্ত-সাম্রাজ্য ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকটি প্রধানতঃ হূণ-আক্রমণের দীর্ঘ বর্বরতার ভয়াবহ কাহিনীর সমারোহে লাঞ্ছিত। গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভাঙনের সুযোগে বাংলা দেশে এই সময়ে গোপচন্দ্র ধর্মাদিত্য, সমাচারদেব প্রভৃতি রাজাদের অভ্যুদয় ঘটে। খ্রীষ্টাব্দের ৫২৫ থেকে ৫৭৫-এর মধ্যে তাঁদের রাজত্বকালের প্রসার কল্পনা করা চলে। বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণ ষষ্ঠ শতব্দীর শেষ দিকে তাঁর অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, মগধ জয়ের অভিযানে এই স্বাধীন রাজাদের স্বাধীনতা হরণ করেন। সপ্তম শতকে পশ্চিমবঙ্গের রাজা শশাঙ্ক কনৌজ-অধিপতি হর্ষবর্ধনের [শীলাদিত্য] বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ [য়ুয়ান্-চুয়াঙ্] ৬৩০ থেকে ৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভারত ভ্রমণে অতিবাহিত করেন। নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন বিশেষ গৌরবের দিন। পরের শতকে কনৌজের অধিপতি যশোবর্মার রাজসভায় ভবভূতি যখন সংস্কৃত ভাষায় তাঁর উত্তররামচরিত কাব্য রচনা করছিলেন, বাংলা দেশে তখন ব্যাপক অরাজকতা শুরু হয়ে গেছে। এই অরাজকতার কথা এক নিঃশ্বাসে শেষ করা যায়না। পঞ্চম শতকের শেষ দিকে হূণ-আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। স্কন্দগুপ্তের পরে গুপ্ত-উপাধিধারী আর এক রাজবংশ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গে রাজত্ব করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন "এই সময়ে বাংলাদেশের এই অঞ্চল গৌড় নামে অভিহিত হয়।" তখন যুক্তপ্রদেশের মৌখরি রাজবংশের রাজা ঈশান বর্মা গৌড়-রাজদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে সমুদ্রতীরে বিতাড়িত করেন। মৌখরি এবং গুপ্তদের সংঘর্ষের অশান্তিও দু'এক বছরে শেষ হয়নি। সেই দুর্যোগের মধ্যেই উত্তর থেকে তিব্বতী এবং দক্ষিণ থেকে চালুক্য শক্তির আক্রমণ ঘটেছে।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করতেন যে, শশাঙ্ক ছিলেন মগধের গুপ্ত-রাজবংশের অন্যতম উত্তরাধিকারী। রমেশচন্দ্র বলেছেন, সে মত "সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন"। শশাঙ্কের উপনাম ছিল নরেন্দ্র গুপ্ত। বাঙালীর ইতিহাসে সেই "প্রথম সার্বভৌম নরপতি" শশাঙ্ক হয়তো প্রথম জীবনে ছিলেন মৌখরি রাজ্যের অধীনস্থ সামন্তরাজা। প্রথম জীবনে তিনি যাই থাকুন,

পরিণত জীবনে তিনি অশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরি রাজাদের তিনি দমন করেছিলেন। বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে' [সপ্তম শতাব্দী] তাঁর কথা আছে। বাণভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ, উভয়েই তাঁর সম্বন্ধে অপ্রিয় মন্তব্য করে গেছেন। কিন্তু সেসব কথা বেদবাক্যের মতো অভ্রান্ত নাও হতে পারে। রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন গৌড়দেশের কোনো ঐতিহাসিক থাকলে আজ শশাঙ্ক সম্বন্ধে হয়তো অন্য কথা জানবার সুযোগ ঘটতো। মহাসামন্ত শশাঙ্ক নামেই ইনি আজ সমধিক পরিচিত। হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায় যে, শশাঙ্ক তৎকালীন স্থাম্বীশ্বরাধিপতি সাধুচরিত্র রাজ্যবর্ধনকে গৌড়দেশে আমন্ত্রণ করে এনে নিরস্ত্র অবস্থায় গোপনে হত্যা করেছিলেন। রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধের অভিপ্রায়ে কামরূপের ভাস্কর বর্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে গৌড় আক্রমণ করলেন। শশাঙ্ক ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন,—৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে বাংলাদেশে গুপ্তরাজবংশের আনুকূল্যে লালিত শিল্পসাহিত্য-সংস্কৃতির মহিমময় যোগ-সূত্রটি ছিঁড়ে গেল। গুপ্তরাজবংশের প্রথম সমৃদ্ধি শেষ হয়েছিলো স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে। তারপর পঞ্চম শতকে পুরুগুপ্ত, বুধগুপ্ত, উত্তরবঙ্গে নরসিংহ গুপ্ত [ভানু-গুপ্ত] রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তী গুপ্তদের মধ্যে বাংলার সমতট-বিজয়ী বৈন্যগুপ্ত ছিলেন ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে। শশাঙ্কের আবির্ভাব তার বহু পরবর্তী ঘটনা। সমৃদ্ধির যুগে গুপ্তরাজবংশের অক্ষয় কীর্তি প্রকাশ পেয়েছিলো অজন্তার চিত্ররচনায়, কালিদাসের কাব্যে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানে! মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণপুরে [বর্তমান রাঙামাটি] শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। ৬০৬-এর আগে থেকে সম্ভবতঃ ৬৩৭ পর্যন্ত তাঁর শাসনকাল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর আনুমানিক ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ্ বাংলা দেশে এসেছিলেন। গৌড়রাষ্ট্রে তখন আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদের মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। হর্ষবর্ধন এই সময়ে মগধ জয় করেন। কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মা গৌড় জয় করে কর্ণসুবর্ণে তাঁর জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করেন। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে হর্ষবর্ধনের মৃত্যু হয়। তিব্বতরাজ সে সময়ে ভাস্কর বর্মার কামরূপরাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করেন। সুতরাং গৌড়ে ভাস্কর বর্মার প্রতাপ বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর

বাংলা দেশের অরাজকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে 'রামচরিতে'র কবি সন্ধ্যাকর নন্দী মৎস্য ন্যায়ের উপমা ব্যবহার করেছেন। বড় মাছ যেমন ছোটো মাছ খেয়ে থাকে, বাংলা দেশে সে সময়ে বড় বড় জমিদাররা তেমনি ছোটো ছোটো জমিদারদের গ্রাস করতেন। বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তারনাথ বলেছেন যে, সে সময়ে সমগ্র বাংলা দেশের কোনো রাজা ছিলেন না। দেশের সেই অরাজক অবস্থা দূর করবার জন্য ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রজারা গোপাল নামে এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসালেন। গোপাল বাংলায় শান্তি স্থাপন করলেন। গোপালের ছেলে ধর্মপাল যখন রাজা হলেন তখন তিনি পাটলিপুত্রে সেনানিবেশ স্থাপন করে পূর্ববর্তী মৌর্য এবং গুপ্ত রাজাদের মতো পূর্বভারতের গরিমা পুনঃস্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। ধর্মপাল ছিলেন পরাক্রান্ত নৃপতি। প্রাক্-মুসলমান যুগের বাংলার দুই স্মরণীয় অধিনায়কের মধ্যে প্রথম শশাঙ্ক,—আর দ্বিতীয় এই ধর্মপাল। শশাঙ্ক ছিলেন গৌড়রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, আর ধর্মপাল ছিলেন গৌড়-বঙ্গের সম্রাট। শশাঙ্কের দুশো বছর পরে ধর্মপালের অভ্যুদয় ঘটেছে। অষ্টম শতকের শেষ থেকে নবম শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত তাঁর শাসনকালের ব্যাপ্তি বলে স্বীকার করা হয়েছে। দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকূট সম্রাট এবং মারবারের গুর্জর প্রতিহাররাজ তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ধর্মপালের পরে তাঁর ছেলে দেবপাল সাম্রাজ্য লাভ করে আসাম ও উড়িষ্যা জয় করে দ্রাবিড় ও গুর্জর দেশের রাজদর্প চূর্ণ করেন। দেবপালের পরে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিগ্রহপাল, তৎপরে বিগ্রহ পালের ছেলে নারায়ণ পাল রাজা হয়েছিলেন। এই সময়ে, অর্থাৎ, নবম শতকের প্রথমে রাজপুত জাতিভুক্ত প্রতিহার-নৃপতি প্রথম-ভোজের নেতৃত্বে বাংলা দেশ আক্রান্ত হয় এবং পরে ভোজের পুত্র মহেন্দ্র পাল সম্ভবতঃ পাল রাজত্বভুক্ত উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন। পার্বত্য কম্বোজিয়াদের বঙ্গবিজয় এই সময়ের ঘটনা। কম্বোজ সম্ভবতঃ তিব্বত দেশ। পাল রাজগরিমা এইভাবে অস্তমিত হলেও মহীপালের আমলে লুপ্ত গরিমার পুনরুদ্ধার ঘটেছিল। মহীপাল পার্বত্য কম্বোজিয়াদের কবলমুক্ত করে উত্তরবঙ্গে নানা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। মহীপাল সেকালের মহাশক্তিশালী রাজা রাজেন্দ্র চোলের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। মহীপালের রাজত্বকালেই সুলতান মামুদ বারবার ভারত আক্রমণ করেন। ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখতে বসে বৃন্দাবন দাস বলে গেছেন—

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত।

ইতিহাসে যোগীপাল-ভোগীপালের পরিচয় পাওয়া যায় না বটে, তবে পাল-বংশের রাজত্ব যে একাদশ খ্রীষ্টীয় শতক অবধি চলে এসেছিল, সে-সম্পর্কে ইতিহাসের নজির আছে। সম্রাট মদন পাল এই সময়ে বিজয় সেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। মহীপালের পরে তাঁর ছেলে নয়পাল বাংলার রাজত্ব পেয়েছিলেন। তারপর যথাক্রমে তৃতীয় বিগ্রহ পাল, দ্বিতীয় মহীপাল, রামপাল ইত্যাদি রাজারা পালরাজবংশের নানা ঝড়ঝাপটা সহ্য করে রাজ্য শাসন করে গেছেন। মদন পালের পরাজয়ের পরেও তৃতীয় গোপাল নামে এক রাজার উল্লেখ দেখা যায়। যাই হোক্, মোটামুটি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতক থেকে একাদশ শতকের প্রথম অবধি প্রায় শ'তিনেক বছর পাল-রাজারা বাংলা দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন। পূর্ববর্তী গুপ্তরাজবংশ যেমন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী ছিলেন, এঁরা তেমনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। পালরাজারা নানা জায়গায় অনেক বৌদ্ধবিহার স্থাপন করেছিলেন। এই বংশের রাজা নয়পালের বীরত্বে চেদীরাজ কর্ণের পরাজয় ঘটেছিলো। কর্ণদেব মগধে বৌদ্ধ বিহার ও মঠ ধ্বংস করেন। নয়পালের সেনাদল কর্ণদেবের সৈন্যসামন্ত হত্যা করে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিয়েছিলো। সে সময়ে গয়াতীর্থে উপস্থিত ছিলেন বাংলার সেই চিরস্মরণীয় মেধাবী, যাঁর সম্পর্কে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন—

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর,
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।

অতীশ দীপঙ্কর দুজনের নাম নয়। যিনি অতীশ, তিনিই দীপঙ্কর। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান [অতীশ] ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পণ্ডিত। তিনি তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। গয়াতীর্থে তাঁরই মধ্যস্থতায় কর্ণদেব এবং নয়পালের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয় এবং নয়পালের মৃত্যুর পরে নয়পালের ছেলে তৃতীয় বিগ্রহ পালের সঙ্গে কর্ণের মেয়ে যৌবনশ্রীর বিয়ে হয়। পালরাজ-বংশের রাজত্বকালে বাংলাদেশে শুধু যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের মতো একটি মাত্র গুণী লোক বর্তমান ছিলেন, তা নয়। দীপঙ্কর ছিলেন বিক্রমশিলার প্রধান অধ্যক্ষ। সে হলো খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম দিকের কথা। তাঁর আগে অষ্টম শতকে শান্ত রক্ষিত ছিলেন নালন্দা বিহারের প্রধান আচার্য; ইনি

পদ্মনাভ নামে আর এক আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। নবম শতকে বাংলাদেশ থেকে আরো অনেক পণ্ডিত তিব্বত-রাজের আমন্ত্রণ পেয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। চীন, জাপান, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে এ সময়ে বাঙ্গালী পণ্ডিতদের ঘন ঘন যাতায়াত ছিলো। শান্ত রক্ষিতের নাম আগেই করা হয়েছে। তাঁর শিষ্য কমলশীল ছিলেন নালন্দায় তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপক। নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুর— মগধদেশে অর্থাৎ বিহার-অঞ্চলে পাশাপাশি তিনটি বিশ্ববিশ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময়ে বাংলাদেশের বহু পণ্ডিতের খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিলো। শুধু যে ধর্ম বিষয়েই বাঙালী সে যুগে পাণ্ডিত্য ও কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তা নয়। স্থপতি, ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্পেও তাঁদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো। আয়ুর্বেদে চক্রপাণি,—এবং রামপালের গুণকীর্তন-মূলক 'রামচরিত' নামে একখানি বিখ্যাত কাব্য প্রণয়ন করে সন্ধ্যাকরনন্দী পালরাজাদের সময়েই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। মহীপালের ভাই রামপালের তিনি ছিলেন সন্ধিবিগ্রহিক —অর্থাৎ যুদ্ধ ও শান্তির মন্ত্রী। রাজবংশে বৌদ্ধ ধর্মের চল থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি দেশে কোনোরকম বিরোধিতা ছিলো না। এদেশে ধর্ম উপলক্ষ্য করে দলাদলি বা রক্তারক্তি করবার তখনো হয়তো রেওয়াজ হয়নি।

খ্রীষ্টজন্মের পরে হাজার বছরে বাংলা দেশের রাজশক্তির ইতিহাস মোটা-মুটি এই ভাবে বদলেছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের গোড়ায় গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়, ষষ্ঠ শতকের চতুর্থ দশকের মধ্যে সে বংশের শেষ খ্যাতিমান রাজা নরসিংহ গুপ্তের মৃত্যু—তারপর, প্রায় শ'দুয়েক বছর নানা দলের উৎপাতে কেটেছে—তার মধ্যে সপ্তম শতকের প্রথম দিকে বছর-কুড়ি মহাসামন্ত শশাঙ্ক রাজত্ব করেছেন,—তারপর হর্ষবর্ধন শীলাদিত্য, তারপর, ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার রাজপদে নির্বাচিত হয়েছিলেন গোপাল। পালবংশের এই সূচনা থেকে একাদশ শতকে মদন পালের পরাজয় পর্যন্ত গেল পালরাজত্বের কাল। তারপর শুরু হলো সেনরাজাদের শাসন। গুপ্তরাজবংশ ছিলেন ব্রাহ্মণ্যপন্থী,—পালেরা বৌদ্ধ—তাঁদের পরে যে সেনরাজারা এলেন তাঁরা আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী। অতঃপর সেনবংশের কথা।

ভারতবর্ষের দক্ষিণে কর্ণাট দেশ। সেই দেশের সামন্ত সেন যখন বাংলা দেশে এসেছিলেন তখনকার অবস্থা সম্পর্কে নির্ভুল খাঁটি খবর কোনো

লিখিত ইতিহাসে পাওয়া যায় না। কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর নাম এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর লেখায় পালরাজাদের অনেক খবর আছে। কিন্তু সেনরাজাদের বিষয়ে এরকম কোনো নির্ভরযোগ্য পুঁথি পাওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা রাজ্যের স্বাধীন রাজাদের কথা যে বইয়ে লেখা আছে, তার নাম, রাজমালা। সেই বইয়ে সেনবংশের লক্ষ্মণ সেনের শাসন-কালের ইতিহাস সম্পর্কে 'লক্ষ্মণ মালিকা' নামে এক রচনার কথা আছে। তা ছাড়া আরো কোনো কোনো পুঁথিপত্রে নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যে খবরটি আমাদের দরকার সে খবর উদ্ধার করা সহজ নয়। ষোড়শ শতকে রচিত 'সেখ শুভোদয়া' নামে যে বইখানি পাওয়া গেছে, ত্রয়োদশ শতকে সংকলিত 'সদুক্তি কর্ণামৃত' নামে যে কবিতাসংগ্রহ উদ্ধার করা হয়েছে, সেইসব বাংলা পুঁথিতে এবং আনন্দভট্টের লেখা সংস্কৃত বই 'বল্লালচরিতে' সম্ভবতঃ সেনবংশের টুকরো টুকরো খবর ছড়িয়ে আছে। সেই সেনরাজ-বংশের আদিপুরুষ সামন্ত সেন যখন দক্ষিণ দেশ থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তখন এ-দেশে পালরাজাদের অবস্থা পড়ে এসেছে। অনেকগুলি করদ ও মিত্র রাজ্যের উৎপাতের মধ্যে দেশের কেন্দ্রীয় শাসন তখন জোড়াতালি দিয়ে টিঁকে আছে মাত্র। বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে শূররাজ্য, পুবদিকে চন্দ্রবংশ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। সামন্ত সেন দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলায় এসে পাকাপোক্ত জায়গা করে নিলেন। সামন্ত সেনের বংশ থেকেই কি বাংলার বৈদ্যবংশের শুরু হয়েছে? অনেকে মনে করেন সেই অনুমানই ঠিক। বাংলা দেশে যাঁরা বিয়ের ঘটকালি করে থাকেন তাঁদের কাছে যে কারিকা বা বংশপরিচয়ের পুঁথি থাকে তাতে সেনবংশের বৈদ্যত্ব মেনে নেওয়া হয়েছে। ডক্টর ডি-আর-ভাণ্ডারকর কিন্তু কতকগুলি প্রাচীন তাম্রশাসন দেখে বলে গেছেন যে, এঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাম্রশাসনে এঁদের বিষয়ে কর্ণাট-ক্ষত্রিয় কথাটির প্রয়োগ দেখা যায়। তা থেকে আর একটা নতুন কথার চল দাঁড়িয়ে গেছে যে এঁরা ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। ব্রহ্মক্ষত্রিয় মানে কি? জাতে ব্রাহ্মণ হয়ে কাজে ক্ষত্রিয় হলে হয় ব্রহ্মক্ষত্রিয়। সেনরাজারা বোধ হয় তাই ছিলেন। যে শূর বংশের উল্লেখ একটু আগেই করা হয়েছে সেই বংশের আদিশূর দক্ষিণের কর্ণাটদেশ [কনৌজ] থেকে পাঁচ জন সৎ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। শূরবংশের এক মেয়ের সঙ্গে সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেনের বিয়ে হয়েছিলো। এই ভাবে শূররাজবংশের আত্মীয়তায় এবং নিজেদের নৈপুণ্যের জোরে বিজয়সেন

গৌড়ের পালরাজবংশের শেষ মহিমাটুকু মদন পালের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন। তখন উত্তরবিহারের নাম ছিলো তীরভুক্তি, আসামের নাম কামরূপ, —আর উড়িষ্যার নাম ছিলো কলিঙ্গ। বিজয় সেন এইসব দেশে তাঁর শাসন বিস্তারিত করে নিজের নামানুসারে 'বিজয়নগর' রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করলেন। বিজয় সেনের ছেলের নাম বল্লাল সেন। বাংলা দেশে কৌলীন্য প্রথার তিনি প্রবর্তক। আনন্দভট্ট যে 'বল্লালচরিত' লিখে গেছেন, সে হলো তাঁরই জীবনকথা। তাঁর পরে তাঁর ছেলে লক্ষণ সেন রাজা হলেন। খ্রীষ্ট-জন্মের ১১১৮ বছর পরে ১১১৯ থেকে বাংলা দেশে যে নতুন সংবৎ বা বর্ষকালের হিসেব প্রবর্তিত হয় তার নাম 'লক্ষ্মণ সংবৎ'। এই লক্ষ্মণ সেনের নামেই সে হিসেব চলে এসেছে। প্রায় সাতাশ বছর রাজত্ব করে ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণ সেন মারা যান। পালরাজাদের আমলে ধর্মপাল যেমন বিক্রম-শিলার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, সেন-বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন তেমনি তাঁর সভায় বিদ্যাচর্চায় বিশেষ উৎসাহ দিয়ে গেছেন। তাঁর সভায় জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, শরণ, আচার্য গোবর্ধন প্রভৃতি কবি বিশেষ সম্মান পেয়েছেন। উমাপতি বোধ হয় লক্ষ্মণ সেনের পিতামহ বিজয় সেনেরও সভাকবি ছিলেন। কারণ, দেওপাড়ায় বিজয় সেনদেবের যে অনুশাসন পাওয়া গেছে, তাতে উমাপতি ধরের রচনা দেখা গেছে। সেই রচনা থেকে বোঝা যায় যে সেন রাজাদের কুলদেবতা ছিলেন শিব।

জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী—এঁরা সকলেই প্রধানতঃ সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখে গেছেন। খ্রীষ্ট-জন্মের পরে ৪০০ থেকে ১০০০ বছর পর্যন্ত বাংলাদেশে খুব সম্ভবতঃ সংস্কৃতের কন্যাস্থানীয়া মাগধী প্রাকৃত ভাষারই যে ব্যবহার ছিলো, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। এই প্রাকৃত ভাষা ছিলো আটপৌরে ভাষা, আর সাহিত্যের পোষাকী ভাষা হিসেবে এ সময়ে সংস্কৃতেরই আদর ছিলো। জয়দেব উমাপতি প্রভৃতি কবিরা দ্বাদশ শতকে যখন তাঁদের কাব্য লিখেছেন, তখনো তাঁরা সংস্কৃতের সভ্যভব্য পোষাকী ভাষার প্রতিই আদর দেখিয়েছেন। কিন্তু জয়দেবের সংস্কৃত অতি সহজ জিনিস। জয়দেব সংস্কৃতের ভারি পোষাকটা গায়ে চাপিয়েছেন বটে, কিন্তু তিলমাত্র আড়ষ্ট হয়ে বসতে হয়নি তাঁকে। তাঁর সংস্কৃত যেন বাংলা-দেশের ঘরোয়া খুশির, আটপৌরে সুখ-দুঃখের টানাপোড়েনে বোনা অতি সহজ সজ্জা হয়ে উঠেছে। অবিশ্যি সে ভাষায় তিনি ঠিক বাংলাদেশের ঘরোয়া

সুখদুঃখের কথাই পরিবেষণ করেন নি, তাঁর 'গীতগোবিন্দ' হলো রাধাকৃষ্ণের লীলার কাব্য।

তবে কি প্রাকৃত ভাষায় সে সময়ে কোনো কাব্যই লেখা হতো না? এ প্রশ্নের জবাব এই যে, প্রাকৃত ছিলো সেকালের সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহারের ভাষা। কালিদাসের আমলেও প্রাকৃত ছিলো আটপৌরে ভাষা। কালিদাসের নাটকে যেখানে মেয়েরা কিংবা সাধারণ মানুষরা কথা বলেছেন, সেখানে সংস্কৃতের বদলে প্রাকৃত ভাষাই ব্যবহৃত হয়েছে। সাহিত্য রচনায় সেকালে ভাষার ব্যাপারে এই মাত্রাজ্ঞান বা সংস্কারটি ব্যাপক ভাবে স্বীকৃত হয়ে গিয়েছিলো। 'প্রাকৃত' কথাটির মানের মধ্যেই এর সহজত্ব বা সাধারণত্বের ইঙ্গিত আছে। প্রকৃতি থেকেই যা জাত বা উৎপন্ন তারই নাম 'প্রাকৃত'। আর, যে জিনিস কষ্ট করে সংস্কার করা হয়েছে তার নাম, সংস্কৃত। 'প্রাকৃত' শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হওয়ার ফলে সংস্কৃত ভাষার অস্তিত্ব স্মরণ করে অনেকে বাংলাভাষাকেও 'প্রাকৃত' বলে গেছেন। লোচনদাস বাংলায় চৈতন্যের যে জীবনী লিখেছিলেন তাতে তিনি বলে গেছেন—

ইহা বলি গীতার পড়িল এক শ্লোক।
প্রাকৃত প্রবন্ধে কহি শুন সর্বলোক।

ভারতীয় আর্য ভাষার সকল স্তরেই শিক্ষিত লোকের পোষাকী ভাষার পাশে পাশে এমনি এক-একটি প্রাকৃত ভাষার অস্তিত্ব ছিলো। স্যর জর্জ গ্রীয়ার্সন সাহেব তাই তিন স্তরের প্রাকৃত ভাষার নাম করেছেন,—প্রথমতঃ আদি প্রাকৃত, যাকে সংস্কার করে বেদের রচনা সম্ভব হয়েছিলো, দ্বিতীয়তঃ পালি এবং অন্যান্য মধ্যস্তরের প্রাকৃত। পালি ভাষা খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্বে বৌদ্ধ সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রীয়ার্সন সাহেব প্রাকৃত শ্রেণীর তৃতীয় স্তরে নব্য ভারতীয় আর্যভাষাগুলির উল্লেখ করেছেন। সুতরাং প্রাকৃতভাষা সংস্কৃতের কন্যা, না কি সংস্কৃত প্রাকৃতেরই সংস্কার-ফলে লব্ধ ভাষা—এ নিয়ে একটা খটকা থেকে যায়। এ সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। তবে, প্রাকৃত ভাষাতেই যে জৈনধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থগুলি লেখা হয়েছিলো সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারপর, 'সপ্তসতী', 'সেতুবন্ধ', 'গৌড়বধ' ইত্যাদি কাব্য, 'বৃহৎ কথা' নামে ঐতিহাসিক আখ্যানসংগ্রহ, কর্পূরমঞ্জরী নামে নাটক প্রাকৃত ভাষাতেই লেখা হয়। এ ছাড়া আরো অনেক বই আছে। আচার্য দণ্ডী

সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বই 'কাব্যাদর্শে' প্রাকৃতের কথা বলে গেছেন। তার আগে ভামহ বররুচি-র প্রাকৃত-প্রকাশের টীকা লিখে গেছেন। কিন্তু এতো বই থাকা সত্বেও বাংলার আদিতে যে মাগধী প্রাকৃত ছিলো সে-প্রাকৃতের ভালো নমুনা কোনো পুঁথিপত্তরে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় নি। সম্রাট অশোকের পূর্বভারতের অনুশাসনের ভাষার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের যে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিলো, সে-কথা সুনীতিকুমার স্বীকার করেছেন।

মাগধী অপভ্রংশ থেকে দেখা দিয়েছে ভোজপুরী, মগহী, মৈথিলী, উড়িয়া, অসমীয়া, বাংলা। খ্রীষ্টাব্দের নবম-দশম শতকেই বাংলা ভাষার প্রথম উদ্ভব, —পঞ্চদশ খ্রীষ্টাব্দে ছিল তার মধ্যযুগ,—কালক্রমে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিমার্জিত হতে-হতে, নানা ভাষার প্রভাব আত্মসাৎ করতে-করতে সেই বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছে বিচিত্র্য সাহিত্যকীর্তির বাহন। লক্ষ্মণ সেন যখন গৌড় থোক অপসারিত হয়েছিলেন তখন বাংলা ভাষা তার স্বতন্ত্র রূপে এবং পৃথক স্বকীয়তায় স্বীকৃত হয়েছে। বাংলা দেশ এবং বাংলা ভাষার আদিকথার আলোচনায় এইখানেই ছেদ টানা যেতে পারে। অতঃপর দেশে মুসলমান শাসনের ক্রম বিস্তার এবং ভাষায় বিদেশী প্রভাবের ক্রমবৃদ্ধি ঘটেছে।

ছোটোগল্পের স্বরূপ

ছোটোগল্প বিদেশের আমদানী। মার্কিন, রুশ, ফরাসী ইংরেজি, নানান্ গল্পের নানান্ কৌশল। আমাদের বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে তার আভাসও ছিলোনা। বৌদ্ধ জাতক,—গুণাঢ্যের বৃহৎকথা ইত্যাদি পুরাকালের বিচিত্র গল্পসংগ্রহের কথা পণ্ডিতরা বলে থাকেন বটে, কিন্তু সে সব ছিল গল্প মাত্র—নীতির কথা, সুন্দর গল্প,—তাতে নিখুঁৎ বিন্যাস,—অশেষ তাদের মূল্য! যথার্থ ছোটোগল্পের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্যের কথা ভাবা যেতে পারে,—মানুষের সঙ্গে মানুষের যেমন সাদৃশ্য আছে। আবার জাতির সঙ্গে জাতির ব্যবধানও মিথ্যে নয়!

উনিশের শতকের শেষ দিকে বাংলা ছোটোগল্পের প্রথম সূত্রপাত হয়। আগেকার দিনে, আমাদের সাহিত্যে কবিতা ছিল, গান ছিল, প্রবন্ধ ছিল, নাটকও ছিল। উনিশের শতকের প্রথম পাদের মধ্যেই উপন্যাসেরও বীজ বোনা হয়েছিল। কিন্তু ছোটোগল্প এসেছে আরো পরে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, এঁরা দুজনেই বাংলা ছোটোগল্পের আদি স্রষ্টা।

অনেক কিছু থাকলেও প্রাচীন এবং মধ্যযুগ ছিল আমাদের সাহিত্যের শৈশব। বড়ো বড়ো ঘটনা অবশ্য তখনো কিছু কম ঘটেনি। দেশে নানা ধর্ম-সম্প্রদায়ের ওঠা-পড়া, নানা রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটেছে। মোগল পাঠানের বর্শা-তলোয়ারের অনেক ঝলক দেখা গেছে। তবু, সে আলোড়ন থেকে সাহিত্যিক আলোড়ন ঘট্‌তে দেরি হয়েছে।

নিজের জীবনের কথা বল্‌তে-বল্‌তে রবীন্দ্রনাথ একবার বাল্যকালের সঙ্গে যৌবনের তুলনাসূত্রে যথাক্রমে বর্ষা এবং শরতের কথা ভেবেছিলেন। তাঁর সেই তুলনাটি দিয়েই বাংলা ছোটোগল্পের স্বরূপ-চিন্তার ভূমিকা করা যাক্। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন—

> "সেই বাল্যকালের বর্ষা এবং এই যৌবনকালের শরতের মধ্যে একটা প্রভেদ এই দেখিতেছি যে সেই বর্ষার দিনে বাহিরের প্রকৃতিই অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে,

তাহার সমস্ত দলবল সাজসজ্জা এবং বাজনাবাস্থ লইয়া মহাসমারোহে আমাকে সঙ্গদান করিয়াছে। আর এই শরৎকালের মধুর উজ্জ্বল আলোকটির মধ্যে যে উৎসব, তাহা মানুষের। মেঘরৌদ্রের লীলাকে পশ্চাতে রাখিয়া সুখদুঃখের আন্দোলন মর্মরিত হইয়া উঠিতেছে, নীল আকাশের উপরে মানুষের অনিমেষ দৃষ্টির আবেশটুকু একটা রং মাখাইয়াছে, এবং বাতাসের সঙ্গে মানুষের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষাবেগ নিশ্বসিত হইয়া বহিতেছে।"

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এবং সাহিত্যে বর্ষার পরেই বোধ হয় শরতের গৌরব। শরৎকে তিনি যৌবনের প্রতীক হিসেবে দেখেছিলেন,—বলেছিলেন—"সে যেমন চাষিদের ধানপাকানো শরৎ!" বাংলা ছোটোগল্প বাংলার সাহিত্যিক মনের সেই শরৎ-ঋতুর ফসল। তার আগে কবিতার দীর্ঘমেয়াদী বর্ষা অতিবাহিত হয়েছে। রূপকথা, পদাবলী, মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ-মহাভারত,—আঠারোর শতকের কথকতা, পাঁচালী,—উনিশের শতকের প্রথম-গদ্যের শ্রম, কৃত্রিম মহাকাব্যের পাণ্ডিত্য, নাটকের অ-আ-ক-খ, ইত্যাদি স্বপ্নদশা অথবা প্রথম-জাগরণ-দশা যাপন করে,—বিহারীলালের সঙ্গে জগদ্ব্যাপী সৌন্দর্যকে হৃদয়ব্যাপী রহস্যের রসে জারিত করে নিয়ে,—বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে স্বভাবের অনুকরণ সত্ত্বেও স্বভাবাতিশায়ী হবার অঙ্গীকার মস্তিষ্কে রেখে,—রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই বাংলা সাহিত্য তার প্রথম শরতের সৌন্দর্যে এসে পৌঁছেছিলো। বাংলা ছোটোগল্প সেই শরতের ফসল। প্রকৃতি সেখানে সর্বব্যাপী, কিন্তু মানুষ তার কেন্দ্রে। রবীন্দ্রনাথ সেই মানবকেন্দ্রিক শারদোৎসবের কথা বলেছিলেন।

ইংরেজিতে যাকে বলা হয় Impressionism in fiction, বাংলায় তাকে বলা যায়, 'গল্প-উপন্যাসে ধারণাবাদ'। ছোটোগল্পের আসল কীর্তি হলো গ্রবাহিত গল্পে ধারণার একক অভিব্যক্তি ঘটানো। উপন্যাসে বিচিত্র ধারণার মালা গাঁথা হয়,—নাটকে ঘটনার মধ্য দিয়ে ভাবনার সংঘাত দেখানো হয়,—কবিতায় কবিরা ধারণাকে পল্লবিত হতেও বাধা দেন না। কিন্তু ছোটোগল্প একক, একাত্মক, একবাদী!

প্রথম যে-দেশে এ শিল্পের জন্ম হয়েছিল সেই মার্কিন মুলুকের আদি ছোটোগল্পকার এডগার অ্যালান পো [১৮০৯-৪৯] সব্যসাচীর মতো সৃষ্টির

কলম আর পর্যালোচনার কলম একই সঙ্গে চালিয়েছেন। তাঁর আলোচনা এবং অন্যান্য ছোটোগল্পকারদের নানা উক্তি মনে রেখে, বলা যেতে পারে যে, **ছোটোগল্প হলো ক্ষুদ্রায়তন গদ্যের আকারে সাহিত্যিক-মনের দু'কথা নয়, দশ কথা নয়, কেবল এক কথা। তার চলনটা গদ্যের কিন্তু চালটা কবিতার।** এই শেষ মন্তব্যের কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা দরকার।

বাংলা ছন্দের আলোচনায় সাধারণতঃ আমরা যাকে বলি 'পর্ব', রবীন্দ্রনাথ তাকেই বলেছেন 'চলন'। ছোটোগল্প মানুষের বস্তু-সম্পর্ক, বস্তু-পীড়ন ইত্যাদি বাস্তব কথা সর্বজনবোধ্য সরল গদ্যের বাহনেই প্রকাশ করে থাকে। এই লক্ষণটি মনে রেখে,—অর্থাৎ তার গদ্য-লক্ষণ আর বস্তু-ধর্মিতার দিকে নজর রেখে 'চলন' কথাটা এখানে প্রয়োগ করা গেল। কিন্তু কবিতার ছন্দ বিচার করতে হলে শুধু পর্ব বা চলনের দিকে চোখ-কান সমর্পণ করলেই যেমন চলে না, ছোটোগল্পের মধ্যেও তেমনি পর্বের পরে পর্ব-সমাবেশের মধ্য দিয়ে সমস্ত রচনাটি যে বিশেষ স্বাদে সমন্বিত হয়ে ওঠে, সেই স্বাদটিতে পৌঁছোতে হয়। তবেই তার চূড়ান্ত প্রকৃতির কথা বলা যায়,—অর্থাৎ তার 'চাল' বোঝা যায়। প্রতিদিনের বিচিত্র বস্তু-সংসারের দিকে ছোটোগল্পের সজাগ দৃষ্টি, আর ভাবের ইশারাতেই তার শেষ চরিতার্থতা। ভাবের রাজ্যে ছেদ-যতির সংখ্যা এক নয়। বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা,—দুটি চিহ্নের কথাই হয়তো কোনো কোনো গল্পকার এবং অধিক সংখ্যক পাঠকের অভিপ্রায় অথবা অভিজ্ঞতার সমর্থন পেয়ে থাকে। কিন্তু আরো চিহ্ন আছে।

বিচিত্র এই পৃথিবীতে মানুষের মনের ভাবনা কি কেবলই প্রশ্নমূলক?—তুমি কোথায় যাবে? এই জীবনের আগে কোথায় ছিলাম? ছিলাম কি? তিন কোটি-কে তিন বৃন্দ দিয়ে গুণ করলে গুণফল কতো হয়?—এইসব উক্তির নাম প্রশ্ন। কিন্তু 'কে বলে রে ভোলে নাই? কে বলে রে খোলে নাই স্মৃতির পিঞ্জর-দ্বার?" এ উক্তি প্রশ্ন নয়। এর সঙ্গে যে যতিচিহ্ন জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেটির চেহারা জিজ্ঞাসার বটে, কিন্তু আসলে সংকেতটি একটি মিশ্র মানসিকতার [mood] সূচক! ছোটোগল্পের সম্ভাবনা শুধু প্রশ্ন-মানসিকতাতেই অভিনিবদ্ধ নয়। রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময়—বহুশ্রুত এই অষ্টমনোভাবের যে-কোনো একটিকে আশ্রয় করে গল্পকার ছোটোগল্প লিখতে পারেন।

'বোষ্টমী' নামে রবীন্দ্রনাথের একটি গল্প আছে। সংক্ষেপে তার গল্পাংশ এই রকম—

দিব্যকান্তি, অ-লোকরঞ্জক এক সাহিত্যিক লোকনিন্দায় আদৌ বিচলিত নন। শহর থেকে দূরে, গ্রামের নিরালায় তাঁর অজ্ঞাতবাসের আশ্রয়। সেই অল্পখ্যাত গ্রামে, এক আষাঢ় মাসের বর্ষণশেষ দিবালোকে পুকুরের উঁচু পাড়িতে এক বোষ্টমী এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাতে একটি ফুল দিয়ে বল্‌লে, 'আমার ঠাকুরকে দিলাম'।

সাহিত্যিক বড়োই আশ্চর্য হলেন। তিনি মনোভাবটি এইভাবে ব্যক্ত করেছেন—'ব্যাপারটা নিতান্ত সাদা অথচ আমার কাছে তাহা এমন করিয়া প্রকাশ হইল যে সেই যে গাভীটি বিকালবেলাকার ধূসর রৌদ্রে লেজ দিয়া পিঠের মাছি তাড়াইতে তাড়াইতে নববর্ষার রসকোমল ঘাসগুলি বড়ো বড়ো নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে শান্ত আনন্দে খাইয়া বেড়াইতেছে তাহার জীবলীলাটি আমার কাছে বড়ো অপরূপ হইয়া দেখা দিল। এ কথা বলিলে লোকে হাসিবে কিন্তু আমার মন ভক্তিতে ভরিয়া উঠিল। আমি সহজ আনন্দময় জীবনেশ্বরকে প্রণাম করিলাম।'

বোষ্টমীর সঙ্গে আরো দুএকবার দেখা হলো। লেখককে প্রণাম করতে গয়ে তাঁর পায়ের মোজাটা বোষ্টমীর কাছে অবাঞ্ছিত বাধা মনে হতো। বোষ্টমী তাঁকে 'গৌর' 'গৌর' বলে ডাকতো,—প্রসাদ খেতো তাঁর অজ্ঞাতসারে এবং প্রসাদের অন্নে আমিষ-নিরামিষের ভেদ বিচার করে দেখতো না। শহরে থাক্‌লে ভিক্ষাজীবিতার বিরুদ্ধে অ-লোকরঞ্জক লেখকের লেখনী উদ্যত হোতো নিশ্চয়। কিন্তু গ্রামের ঘাস-মাটি-ফুল-জলের মধ্যে বোষ্টমীর ভক্তিরসটি বড়োই চমৎকার লেগেছিল। তিনি বলেছেন, 'এ জায়গায় আসিলে আমার পুঁথিপড়া বিদ্যার সমস্ত ঝাঁজ একেবারে মরিয়া যায়।'

অবশেষে একদিন বোষ্টমী তার ঘরের কথা বল্‌লো। ভগবান যে সর্বব্যাপী এ কথা সে জানে। গ্রামে উচ্চবর্ণের অনাচারীদের মধ্যেও তিনি আছেন। 'কিন্তু যেখানে আমি তাঁহাকে দেখি সেইখানেই তিনি আমার সত্য।' বোষ্টমীর স্বামী ছিলেন বড়ো সাদা মানুষ। তিনি তাঁর প্রায়-সমবয়সী গুরুঠাকুরকে বড়ো ভালোবাসতেন। কাশী থেকে অধ্যয়ন শেষ করে গুরুঠাকুর যখন ফিরলেন তখন বোষ্টমীর বয়স মাত্র পনেরো। একটি ছেলে

হয়েছিল তার। ছেলেটি ছিল তার বাপের নয়নের মণি। মায়ের অসতর্কতার ফলে জলে ডুবে ছেলেটির মৃত্যু হয়। স্বামীর খুবই কষ্ট হলো, কিন্তু—'তিনি তো কেবল সহিতেই জানেন কহিতে জানেন না।' এমন সময়ে গুরুঠাকুর দেশে ফিরে তাদের অতিথি হলেন। ভারী রূপবান তিনি! স্বামী ভক্তিরসে ডুবেই ছিলেন। গুরুদেবের সেবায় স্ত্রীও রইলেন নিত্যমনোযোগী। চার পাঁচ বছর কোথা দিয়ে যে কেটে গেল। সেইভাবেই বাকি জীবনটা কেটে যেতে পারতো! বোষ্টমী বলেছে—'কিন্তু গোপনে কোথায় একটা চুরি চলিতেছিল, সেটা আমার কাছে ধরা পড়ে নাই, অন্তর্যামীর কাছে ধরা পড়িল। তারপর একদিনে একটি মুহূর্তে সমস্ত উলট পালট হইয়া গেল।'

ফাল্গুনের এক সকালে স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে ঘরে ফিরছিল সে। গুরুঠাকুর তার মুখের পরে দৃষ্টি রেখে বললেন, 'তোমার দেহখানি সুন্দর।'

গুরুঠাকুরের সঙ্গে আর দেখা করেনি বোষ্টমী। স্বামীকে সে বললে—'আমি আর সংসার করিব না'। সহিষ্ণু, মমতাময় স্বামী অনেক বোঝালেন। কিন্তু নিয়তিকে বাধা দেবার উপায় নেই।

আত্মকথার শেষে বোষ্টমী আবার সেই লোকচিত্তরসিক অ-লোকরঞ্জক সাহিত্যিককে প্রণাম করেছে। সেই ভূমিষ্ঠ প্রণামের মধ্যেই এ গল্পের পরিসমাপ্তি! তার আগের কথাগুলিতে একই সঙ্গে জিজ্ঞাসা এবং বিস্ময়ের সমাবেশচিহ্ন অনুভব করা যায়। কথাগুলি এখানে তুলে দেওয়া হলো—

> 'পৃথিবীতে দুটি মানুষ আমাকে সব চেয়ে ভালোবাসিয়াছিল আমার ছেলে আর আমার স্বামী। সে ভালোবাসা আমার নারায়ণ, তাই সে মিথ্যা সহিতে পারিল না। একটি আমাকে ছাড়িয়া গেল, একটিকে আমি ছাড়িলাম। এখন সত্যকে খুঁজিতেছি আর ফাঁকি নয়।'

ছোটোগল্পে যাঁরা প্রশ্নচিহ্ন ছাড়া অন্য কোনো চিহ্নের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না তাঁরা বলতে পারেন—এই তো প্রশ্নের প্রকাশ! পনেরো বছর বয়সের স্বভাব-চঞ্চলতা এবং পনেরো থেকে কুড়ি বছর বয়সের রূপযৌবনের স্বভাব-উচ্ছলতা তো ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক যুবতীধর্ম। অন্য পক্ষে অপরিণামদর্শী যে শিশুটি জলে ডুবলো,—সেও তো স্বভাবেরই দাস!

যে অনুত্তীর্ণযৌবন গুরুঠাকুর সুন্দরী নারীর রূপে মুগ্ধ হয়ে মনোভাবটা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, তিনিও তো একই আইনে বাঁধা! দেহ থেকেই রূপ-দ্যুতি,—এবং রূপ থেকেই মনশ্চাঞ্চল্যের জন্ম। যিনি দেহ দিয়েছেন, তিনি দেহের অছিলা ধরে মনকে এতো কষ্ট দেন কেন? রবীন্দ্রনাথের এ গল্পে ঐ তো দেখা যায় প্রশ্নের বক্রচিহ্ন!

কিন্তু একে প্রশ্নচিহ্ন বল্‌লে জগতে সাহিত্যের সকল কথাই যেন প্রশ্ন হয়ে ওঠে। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে'—এ কথাও প্রশ্ন মনে হতে পারে! কিন্তু একে প্রশ্ন বলা সঙ্গত নয়। জীবনের গভীর বিস্ময়বোধের মধ্যে কিছু-না-কিছু প্রশ্নের ভাব নিহিত থাকে বটে,—কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে বিস্ময়-ভাবটিই মুখ্য। মানুষের মনের বিচিত্র ভাবের বা বিভিন্ন ধারণার যে-কোনো একটির প্রতি পক্ষপাতী হয়ে বিশেষ ছোটোগল্প বিশেষ সংঘট বা situation-এর মধ্য দিয়ে কতকটা **নাটকীয়** ভঙ্গিতে জীবনের বিশেষ ধারণার রূপ ফুটিয়ে থাকে।

বড়ো আয়তনের গল্পে বা উপন্যাসে চরিত্রের পূর্ণতর অভিব্যক্তি দেখা যায়। দীর্ঘস্থায়ী যোগাযোগের ফলে বিশেষ পাত্র-পাত্রীকে সেসব ক্ষেত্রে নানান্ অবস্থার মধ্যে,—নানান্ সম্পর্কের সূত্রে জড়িত দেখবার বা দেখাবার অবকাশ থাকে। অপর পক্ষে, আলোচ্য বাহনের আয়তনের স্বল্পতার জন্যই ছোটো-গল্পের লেখককে কম জায়গায় বেশি কাজ দেখাতে হয়। একটি বিশেষ প্রসঙ্গ বা আবহ, চরিত্র বা ধারণা রূপায়ণের জন্য কখনো কখনো সময়ের দীর্ঘ বিস্তারও তাঁকে চিত্রিত করতে হয়। 'বোষ্টমী' গল্পে ঘটনার সেইরকম কালগত প্রসার আছে,—এবং মনে হয়, পরস্পর-বিন্যস্ত কতকগুলি নাটকীয় দৃশ্যের মধ্য দিয়েই লেখক যেন সেই প্রসারকে উপযুক্ত আশ্রয় দিয়েছেন,—অর্থাৎ স্থান-কালের সংহতি ঘটিয়েছেন। ফলে, কোথাও কোনো অবাঞ্ছিত সংকোচের চিহ্ন নেই,—সময়ের ধারা যেন গল্পের রসে আশ্রয় পেয়েছে! নাটকীয় রীতির আশ্রয় ব্যতিরেকে এই ধরনের সংহতি-সাধন অসম্ভব! ছোটোগল্পের একদিকে যেমন কাব্যমাধুর্য, অন্যদিকে তেমনি এই নাট্যগুণ। একে বলা যেতে পারে—ছোটোগল্পের **নাটকীয় সংহতি**। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তমসা' একটি প্রসিদ্ধ ছোটোগল্প। সময়ের দীর্ঘ বিস্তার সে গল্পে এইভাবেই সংহত হয়েছে। সংক্ষেপে গল্পটি এইরকম—ব্রাঞ্চ লাইনের ছোটো একটি ষ্টেশনে চৈত্র

মাসের এক সকালে এসে পৌঁছেচে এক খেমটা নাচের দল—'দুটি তরুণী, একটি বুড়ি ঝি,—পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়ম-বাজিয়ে, একজন বেহালদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেন বেলা দুটোয়। মেয়ে দুটির একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী। সে সেইখানে বসে চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানা বেঞ্চে ঘুমুচ্ছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশান-দুরস্ত ছোকরা। সিগারেট মুখে প্লাটফর্মের এ-ধার থেকে ও-ধার পায়চারি করে ফিরছে। একটা অন্ধ ছেলে বসে আপন মনেই ঢুলছিল। কুৎসিত চেহারা—চোখ দুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট, অশক্ত...একটা ডুবকি হাতে নিয়ে আপন মনে দুলছে, মধ্যে মধ্যে হাসছে, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নাড়ছে, আপন মনেই কথা বলছে...। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছু শোনাবার চেষ্টা করছে। কখনো জোরে নিশ্বাস নিয়ে কিছু শুকতে চাচ্ছে'। গল্পের নাম থেকেই বোঝা যায় যে, গল্পকারের মনোযোগ প্রধানতঃ অন্ধ, কুৎসিৎ ছেলেটার দিকেই। রূপ-জগৎ তার কাছে তমসা! তবু তার মনে সেই প্রাচীন আর্তি—রূপ লাগি আঁখি ঝুরে! প্লাটফর্মে বসে-বসে সে কোকিল, পাপিয়া, ভেড়ার ডাকের নিখুঁৎ অনুকরণ করে। অন্ধের তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তিতে ধরা পড়ে সিগারেটের ঘ্রাণ, মেয়েদের প্রসাধনের সুবাস। তার বিস্ময়কর শ্রুতিতে অভ্রান্ত ভাবে ভাবে ধরা পড়ে কাঁচের চুড়ি আর সোনার চুড়ির শব্দের প্রভেদ। ছেলেটার চোখে আলো নেই, কিন্তু মনটা কৌতুকে, রসিকতায়, রস-পিপাসায় আলোকিত। হারমোনিয়ম-বাজিয়ের কাছ থেকে একটি সিগারেট আদায় করে সে সবিনয়ে বলে—'পেনাম বাবুমশায়। ঘোড়া দিলেন চাবুক দ্যান। দেশলাই জ্বেলে দ্যান।' প্লাটফর্মের উপস্থিত লোকজনকে সে আকর্ষণ করেছে তার গানের মাধুর্যে। সে গানের প্রথম কলি হলো—'চোখে ছটা লাগিল, তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।' ছোকরার গানের কণ্ঠ তার রূপের অভাব পুষিয়ে দিয়েছে। ছেলেটা বলে ফেলেছিল 'পানমন সমপ্পন করে গাইলে মোহিত করে দিতে পারি।' খেমটা-দলের সুন্দরী মেয়েটিও তার কৌতুকময় কথা শুনে হাসে বটে,—'কিন্তু সে হাসির চেহারা যেন ভিন্ন রকমের।' দলের পরিচয় পেয়ে ওস্তাদের সামনে আনাড়ির যেন লজ্জা হলো। তবু সুন্দরী মেয়েটি যখন বললে 'তোমার সেই মোহিত-করা গান যদি গাও, তবে

তোমাকে এই সোবানখানা দিয়ে যাব'—তখন সমঝদারের তারিফ পেয়ে শিল্পীর প্রাণ যেন ভরে উঠ্‌লো। গল্পকার বলেছেন 'পঙ্কীর অভ্যস্ত নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভরে গেল।'

'তমসা' গল্পের প্রথম দৃশ্য যেন এইখানেই শেষ হয়েছে। বেলা তখন সাড়ে দশটা পার হয়ে গেছে। অন্ধ পঙ্কীর আশ্রয়-দাতা দোকানী দোকান বন্ধ করছে তখন। কুলীদের মধ্যে নেতাই আর মলিন্দ এতক্ষণ বসেছিল। তারাও উঠে গেছে। কালো মেয়েটি গেছে অনতিদূর পুকুরে স্নান করতে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে তার সঙ্গে গেছে। পঙ্কীকে দোকানী বলেছিল—'জল খাবি তো আয়, আমি যাচ্ছি বাড়ি।' পঙ্কী বলেছে—'উঁহু। ক্ষিদে নেই আজ।' সুন্দরী মেয়েটি সেই নিরালায় বেশ পরখ করে দেখেছে যে পঙ্কী সত্যিই অন্ধ আর, অনেকক্ষণ ইতস্তত: করে গল্পের এই দ্বিতীয় দৃশ্যে 'মাটিতে হাত বুলিয়ে অনুভব করে পঙ্কী মেয়েটির পায়ের আঙুলের প্রান্ত স্পর্শ করে বললে, আপনাদের চরণ কোথা পাব বলেন। গানই বা শুনব কি করে?... আপুনি একটি গান যদি গাইতেন?' পঙ্কীর অনুরোধেই শুধু গলায় ধীরে গান গেয়েছে মেয়েটি—'কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।' গান শুনে শ্রোতার শরীর যেন নিস্পন্দ হয়ে গেছে। সে বলেছে 'জেবন ধন্য হল আমার ঠাকরুণ।' কৃত্তিবাস বাগ্দীর ছেলে অন্ধ পঙ্কীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝরে পড়েছে সুন্দরী মেয়েটির পায়ের ওপর।

অতঃপর গল্পের তৃতীয় দৃশ্য শুরু হয়েছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ের সঙ্গে কালো মেয়েটি স্নান সেরে ফিরে এসেছে। পঙ্কী তখনো প্রণামে নিবিষ্ট। এইবার সুন্দরী মেয়েটির স্নান করতে যাবার পালা। পঙ্কী তার সঙ্গে দাঁড়াতে গেছে। সেখানে আর এক দফা গান। মেয়েটির গাওয়া গান অবিকল নির্ভুল সুরে গেয়ে শুনিয়েছে পঙ্কী।

এই ক্ষণস্বর্গ বিলুপ্ত করে দিয়ে খেমটার দলের অভীষ্ট ট্রেন চলে গিয়েছে যাত্রীদের নিয়ে। সে যেন নাটকের পরবর্তী অঙ্ক। পঙ্কীও ট্রেনে উঠে পড়েছিল লুকিয়ে-লুকিয়ে। পরের জংশন ষ্টেশনে নেমে ভিড়ের মধ্যে সে তাদের হারিয়ে ফেল্‌লে। সেই ষ্টেশনেই রয়ে গেল পঙ্কী। খেমটার দল বর্ধমানে গেছে,—এ খবর তার মনে ছিল বহুদিন। বর্ধমান নামটি রইলো স্বপ্নের মাধুর্যে মণ্ডিত হয়ে। নতুন ষ্টেশনেও পঙ্কীর গানের তারিফ হলো।

সেই সঙ্গে তার বর্ধমান যাবার বাতিকটাও পরিচিতদের অগোচর রইলো না। 'ওদিকে টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজে ঠিন-ঠিন, বাবুরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পঙ্কী উঠে আসে। ভাবতে-ভাবতে প্লাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কাছেই টেলিগ্রাফের পোষ্টে বাতাসের প্রবাহে শব্দ ওঠে, গায়ে লাগানো মাইল-লেখা লোহার প্লেটটা অত্যন্ত দ্রুত শব্দ করে কাঁপে। পঙ্কী ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ-পোষ্টে কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোষ্টের গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে, টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টক্ক-টক্কা টরে। তারপর বলে, হ্যালো! হ্যালো! ঠাকরুন, বর্ধমানের ঠাকরুন? আমি পঙ্কী। গান গাইছি আমি। 'ও তোর কদম-তলায় চেয়ে থাকি।'

দিন যায়, দিন যায়! একদিন গ্রামোফোনে বেজে উঠলো বর্ধমানের সেই ঠাকরুনের সেই গান আর তারই সঙ্গে পঙ্কীর নিজের গানটিও,—নিতাই কবিয়ালের কাছে সে যেটি শিখেছিল,—তার কাছ থেকে ঠাকরুন যেটি শিখেছিলেন। অন্ধ বুঝতে পারে নি যন্ত্রের ছলনা,—ভেবেছিল ঠাকরুন সশরীরে জংশনে পৌঁছেছেন বুঝি! অবশেষে নিজের বিভ্রম ধরা পড়লো। 'গাড়ি এল। চলে গেল। ষ্টেশন-ষ্টাফ-ষ্টলওয়ালা বিস্মিত হল। পঙ্কী নাই।' পরের অঙ্কে স্থান কাল বদলে গেছে পুনরায়। 'আরও অনেক কাল পর।' অনেকগুলি বৎসর চলে গিয়েছে। পঙ্কীর চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। দন্তুর মুখে দাঁত পড়েছে কয়েকটা। কানের শোনার শক্তি কমে এসেছে। এক তীর্থক্ষেত্রের ভিক্ষুক সে। 'মা-জননীরা যখন যায়, তখন পঙ্কী বেশি আকুলতা প্রকাশ করে।'

এই তীর্থস্থানেই তাঁর স্পর্শ পাওয়া গেল পুনরায়। শেষের গানটি সেই 'কালা তোর তরে—।' সে দিন পঙ্কী সেই গান গাইছিল। গানটি শুনলেন একজন পুরুষ আর একটি নারী। পুরুষটি সঙ্গিনীকে বললেন—'খুব গেয়েছিলে গানখানা রেকর্ডে। ঘাটে মাঠে হাটে ছড়িয়ে গেল।'

মেয়েটি বললেন—'গাইলাম, কিন্তু কালা শুনলে কই?'

পুরুষের উক্তি—'ওই তোমার এক ঢঙ! আর তীর্থে কাজ নেই। চল ফিরে চল।'

সাধিকার উত্তর—'নাঃ। বয়স অনেক হল। অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। আর—'

'অসহিষ্ণু পক্ষী বলে উঠল কিছু দয়া হবে মা? অন্ধ—'

মেয়েটি একটি আধুলি ভিক্ষা দিলেন। পুরুষ শুনিয়ে দিলেন 'আধুলি; পয়সা নয় রে বেটা।'

নির্মম কার্য-কারণের জগতে আবদ্ধ বৃদ্ধ ভিক্ষুক পক্ষীর মনে বৈষয়িক অভিজ্ঞতা-লব্ধ সংশয়-সন্দেহের প্রশ্ন জাগলো—"আধুলি? মেকী নয় তো? হাত বুলিয়ে, মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ করে নিলে পক্ষী। তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করলে।

'তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল।'

'পাখিরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হল। পক্ষীও উঠল।'

ছোটোগল্পের নাটকীয় সংহতি, নাটকীয় গতি,—পক্ষপাতহীন নাটকীয় নৈরাত্মতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তারাশঙ্করের এই 'তমসা' গল্পটি স্মরণীয়।

ইংরেজিতে এই ধরনের সংহতি বোঝাবার জন্যে concentration শব্দটি ব্যবহার করা হয়। নাটকীয় দৃশ্য-পারম্পর্যের মধ্য দিয়ে সময়ের দীর্ঘ ধারাও সংহত হয়ে এক বিস্ময়কর একমুখিতার ভাব ফুটিয়ে তোলে। সাহিত্যতত্ত্বের ছাত্রপাঠ্য একখানি ইংরেজি বইয়ে ছোটোগল্পের আলোচনাসূত্রে তাই বলা হয়েছে—'Singleness of aim and singleness of effect are therefore the two great canons by which we have to try the value of a short story as a piece of art.।' ছোটোগল্পে কোনোরকম বাহুল্যের জায়গা আদৌ নেই। প্রসঙ্গের দিক থেকে এই সাহিত্য-প্রকারের পক্ষে অবশ্যগ্রাহ্য তেমন কোনো বিশেষ শ্রেণী বা আদর্শের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়। যে কোনো প্রসঙ্গই ছোটোগল্পের প্রসঙ্গ হতে পারে। বিশেষ চরিত্র, বিশেষ আবহ [atmosphere] বিশেষ সংঘট [situation], বিশেষ মনঃসংঘাত বা মনোভাবনা, বিশেষ ঘটনা [incident] ইত্যাদির যে-কোনো একটির ওপর ছোটোগল্পের বিশেষ ঝোঁক ঘটতে পারে। উপন্যাসের মতন বিশদ 'প্লট'-এর দিকে ছোটোগল্পের ঝোঁকও নেই, ফুরসৎও নেই। বেগের জগতে বিস্তারের আদর কমতে বাধ্য। আর বিস্তারের সংকোচ পুষিয়ে নিতে হলে চাই রসের নিবিড়তা।

∴

প্লটের প্রসঙ্গে

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার তাঁর একটি প্রবন্ধে 'প্লটে'র বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'গল্পের কর্মচক্র', এই অভিধা প্রয়োগ করেছেন।[১] কথাটি প্রচলিত শব্দ 'গল্প' এবং 'আখ্যানে'র চেয়ে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ, গল্পরস পরিবেষণের বিশেষ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত আছে ঐ 'কর্মচক্র' শব্দটির মধ্যে।

একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক এ-বিষয়ে চমৎকার কথা বলেছেন। তাঁর মন্তব্য এই—রাজা মারা গেলেন, তারপর রানি মারা গেলেন—একে বলা যাবে 'গল্প' [story]। কিন্তু, রাজা মারা গেলেন, তারপর সেই দুঃখে রানিরও মৃত্যু হলো—এরই নাম 'প্লট'। এই প্রভেদের ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন—

> "The time-sequence is preserved, but the sense of causality overshadows it."[২]

—অর্থাৎ কালপারম্পর্য বজায় রাখা হয়েছে বটে, কিন্তু এই শেষের বৃত্তান্তে তাকে ছাপিয়ে উঠেছে কার্যকারণবোধ।

যদি বলা হতো—রানি মারা গেলেন, কেউ জানতো না তাঁর মৃত্যুর কারণ;—অবশেষে জানা গেল যে, রাজার মৃত্যুশোক লেগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে;—তাহলে,

> "This is a plot with a mystery in it. a form capable of high development. It suspends the time-sequence, it moves as far away from the story as its limitations will allow. Consider the death of the queen. If it is in a story we say 'and then?' If it is in a plot we ask 'why?' That is the fundamental difference between these two aspects of the novel."

১। 'পরিচয়' আশ্বিন কার্তিক, ১৩৬২ দ্রষ্টব্য

২। Aspects of the Novel—E. M. Forster.

—অর্থাৎ, এইবার এই প্লটের মধ্যে এলো রহস্যের ছায়া। একে এখন অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া যাবে। কালপারম্পর্যের প্রাধান্য-বোধ এখানে গৌণ হয়ে গেল,—সীমা লঙ্ঘন না করে যতোদূর যাওয়া যেতো, ততোদূর যাওয়া হয়েছে। রানির মৃত্যুর বৃত্তান্তটাই দেখা যাক্। সে ব্যাপার 'গল্পের' মধ্যে ঘট্‌লে আমরা জিগেস করি—'তারপর?' 'প্লটের' মধ্যে ঘট্‌লে বলে থাকি—'কেন মারা গেলেন?' এই দুইয়ের মধ্যে এইটেই প্রধান পার্থক্য, প্রধান ভেদ।

এইভাবে 'প্লটের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মন্তব্য জানিয়ে আলোচক আরো বলেছেন—

> "A plot cannot be told to a gaping audience of cave men or to a tyrannical sultan or to their modern descendant the movie-public. They can only be kept awake by 'and then—and then—'. They can only supply curiosity. But a plot demands intelligence and memory also."

আদিম গুহামানব কিংবা মধ্যযুগের অত্যাচারী কোনো সুলতান কিংবা তাদের বর্তমান উত্তরপুরুষ চলচ্চিত্রামোদী জনসাধারণ বুঝবে না 'প্লটে'র গূঢ় মর্মকথা! গল্পের কালানুক্রমে সাজানো ঘটনাস্রোতের কৌতূহলটুকুই তাদের জাগিয়ে রাখে। কিন্তু প্লটের দাবী হলো শ্রোতার বুদ্ধির দিকে, এবং ঘটনার সঙ্গে ঘটনার কার্যকারণগত যোগটি মনে রাখবার সামর্থ্যের ওপর।

শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার তাঁর নিজের লেখার মধ্যে ব্যবহৃত 'কর্মচক্র' শব্দটি ব্যাখ্যা করেননি। কিন্তু 'চক্র' শব্দাংশটির মধ্যে বৃত্তাকার যে পূর্ণতার অর্থ নিহিত আছে,—'কর্ম' শব্দের প্রাকৃচিন্তা হিসেবে আমাদের মনে যে কারণ-বোধ জেগে ওঠে, সেই দুটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত নিহিত থাকার ফলে ঐ অভিধাটি বিনা-ব্যাখ্যানেও বিশেষ অর্থসূচনার অধিকারী হয়ে উঠেছে। যাই হোক্, যে ইংরেজ ঔপন্যাসিকের ব্যাখ্যান এতক্ষণ দেখা গেল, তিনি একালের মানুষ। একালের ইংরেজ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় একব্যক্তি 'প্লট' বল্‌তে এই অর্থ যে বুঝে থাকেন, সেকথা ঐতিহাসিক কারণেই উল্লেখযোগ্য এবং স্মরণীয়। এই ধারণার সঙ্গে প্রাচীনপন্থীদেরও মতভেদ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলার Scott বলা হতো সে যুগে। উপন্যাসের আখ্যান সম্বন্ধে স্কটও সেই কার্যকারণ-সম্পর্কবোধের আবশ্যিকতার কথা তুলেছিলেন। তাঁর নিজের কথা—

> "Though an unconnected course of adventure is what most frequently occurs in nature, yet the province of the romance-writer being artificial, there is more required from him than a mere compliance with the simplicity of reality."[৩]

—অর্থাৎ চারিদিকের প্রকৃতির মধ্যে যদিও প্রায়ই দেখা যায় যে, পরস্পর অসংলগ্ন বা অ-যুক্ত ব্যাপারের প্রবাহ চলেছে, তবু, রোম্যান্স-লেখককে যেহেতু কৃত্রিম—অর্থাৎ কল্পনারঞ্জিত প্রদেশেই আবদ্ধ থাকতে হয়, সেই কারণে স্বভাবসারল্যের আনুগত্যের অতিরিক্ত তাঁর ওপর আরো কিছু দাবী আছে।

এই দুটি দৃষ্টান্ত থেকে বঙ্কিমের 'স্বভাব-অনুকরণবাদে'র যথার্থ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য শুধু স্বভাবের অনুকরণ মাত্র করতে বলেননি। "যাহা স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত"—তাঁর এই উক্তির শেষ বিশেষণটি সে যুগের লেখকসমাজকে সমাজের ব্যবহারিক নীতি সম্পর্কেই বেশি মনোযোগী করে তুলেছিল। 'প্লটের' প্রসঙ্গে সেকথার পুনর্ব্যাখ্যান অবান্তর। 'প্লটের' যে স্বভাবাতিরিক্ত গতিবিধির কথা স্কটের পূর্বোক্ত মন্তব্যের মধ্যে পাওয়া গেল, সে বিষয়ে স্পষ্টতর ব্যাখ্যা আছে আর একজন ঔপন্যাসিকের মন্তব্যে। বর্তমান আলোচনায় স্কটের আগে যাঁর কথা বলা হয়েছে সেই তৃতীয় ব্যক্তি তাঁর পূর্বগামী এবং স্কটের পরবর্তী। এখন সেই তৃতীয় ব্যক্তির কথা দেখা যাক্—

> "The whole secret of fiction and the drama in the constructional part—lies in the adjustment of things unusual to things eternal and universal. The writer who knows exactly how exceptional, and how non-exceptional his events should be made, possesses the key to the art."[৪]

৩। Lives of the Novelists : Sir Walter Scott

৪। Thomas Hardy.

—অর্থাৎ, উপন্যাস এবং নাটকের গঠন-প্রসঙ্গের গূঢ় রহস্য হলো অ-সাধারণ বা অনতিপরিচিতের সঙ্গে চিরন্তন এবং সর্বজনীনের সমন্বয়সাধনের সামর্থ্যে আশ্রিত। যে লেখক অভ্রান্তভাবে জানেন যে, তাঁকে কতোটা সাধারণ কথা, সাধারণ বিশ্বাস মেনে চলতে হবে, আর, তাঁর পক্ষে কতোটাই বা অস্বাভাবিক হতে বাধা নেই, সেই লেখকই তাঁর শিল্পরহস্যের প্রকৃত তত্ত্বের অধিকারী। 'প্লট'-এর ব্যাপারে এইভাবে কার্যকারণ-বোধ যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ রেখে ঔপন্যাসিককে প্রত্যাশিতের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতের মিল ঘটাতে হয়। প্লটের 'কর্মচক্র' তাই কার্যকারণের বিশ্বাস, সম্ভাব্যতার বোধ, অপ্রত্যাশিতের স্বীকৃতি এবং জীবনের ব্যাখ্যানের সঙ্গে জড়িত।